বঙ্কিমচন্দ্রের

কপালকুণ্ডলা

[ভূমিকা ও টীকা-সম্বলিত]

Kapal Kundala

অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
১০ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

ক্ষ

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার পর বৎসর (১৮৬৬) 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাঁহার এই দ্বিতীয় গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়া যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, উপন্যাসের ভাষা সৃষ্টি করিয়া, কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টি করিয়া যে শিল্প তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রথমব্রতীর দ্বিধা-সংশয়, নূতন পথে প্রথম পাদক্ষেপের বিহ্বলতা-জড়তা কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই কথাই বিদগ্ধ সমালোচক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় বলিয়াছেন—" 'কপালকুণ্ডলা'তে বঙ্কিম-প্রতিভা ভাষার সমস্ত ধূম্রাবরণ ত্যাগ করিয়া একটি প্রদীপ্ত অনলশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে।" 'দুর্গেশনন্দিনী-'তে দেখিতে পাওয়া গেল একটি গল্প কাহিনীর মধ্যে নরনারীর প্রবল হৃদয়াবেগকে বঙ্কিমচন্দ্র রূপ দিয়াছেন। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিম-প্রতিভার পূর্ণ জাগরণ ঘটিয়াছে। বাস্তবিকই কপালকুণ্ডলা শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক সৃষ্টি।

'কপালকুণ্ডলা' কি খাটি উপন্যাস ?

রোমান্স ও রোমান্টিক উপন্যাস কাহাকে বলে ?

'কপালকুণ্ডলা'য় রোমান্স ও রোমান্টিক গুণ অত্যন্ত অধিক বলিয়া কপালকুণ্ডলাকে অনেকে নভেল বা উপন্যাস এই নামে অভিহিত করিতে ইচ্ছুক নহেন। নামে যদিও কিছু যায় আসে না, 'কপালকুণ্ডলা'কে কোন বিশেষ নামে অভিহিত না করিলেও 'কপালকুণ্ডলা'র কোন ক্ষতি হয় না। রোমান্স এই নাম দিলেই 'কপালকুণ্ডলা' উপকথার পর্যায়ে গিয়া পড়িবে না।

দিদিমা-ঠাকুরমার কোলের কাছটি ঘেঁসিয়া শুইয়া গল্প শুনিতে শুনিতে শিশু যে বাস্তব-সম্পর্কহীন আশ্চর্যসুন্দর বর্ণচ্ছটাময় মায়ালোকে গিয়া পৌছায়, তাহাকে আমরা Fairy Tales বা রূপকথার রাজ্য বলিয়া থাকি আর আমাদের সহধর্মী আমাদেরই সমাজ ও পরিবারের পরিচিত পরিবেশের মধ্যে যাহারা বাস করে, তাহাদের জীবনে যে বিচিত্র সংঘাত দেখা দেয়, বিচিত্রতর হৃদয়াবেগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা যে দ্বন্দ্ব ও জটিলতার সৃষ্টি করে, সংক্ষেপে তাহার কাহিনীকে বলি আমরা

উপন্যাস। রূপকথা ও উপন্যাস—দুইটি জগতের মাঝামাঝি আর একটি সাহিত্যের জগৎ আছে—যাহা রূপকথার মত বাস্তবের সহিত একেবারে সম্পর্কশূন্য নয়, আবার উপন্যাসের মত পদে পদে, বাস্তবের সহিত দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধও নয়। এই মধ্যপথের নামই রোমান্স। উপন্যাসের কঠিন বাস্তবময়তার জগৎ ছাড়াইয়া রোমান্স আমাদের বিস্ময়বিমূঢ় মনে একটা অজানা, অচেনা, কুহেলিকাচ্ছন্ন, আনন্দময় কল্পলোকের সৃষ্টি করে। আমাদের প্রত্যহের অভিজ্ঞতার বাহিরে যে জগৎ, সেখানকার নর-নারীর জীবন কী অপ্রত্যাশিত আকস্মিক দ্বন্দ্বসংঘর্ষে উদ্বেল হইয়া উঠে তাহার বিবরণ আমাদের বর্ণচ্ছটাহীন পরিচিত সাধারণ জীবনের কাহিনী অপেক্ষা কম উপভোগ্য হয় না। মানুষ বড় হইলেও তাহার মধ্যে অনাদিকালের শিশু চিরকালই বাস করে, তাই সকল বয়সের মানুষের নিকটই রূপকথা উপভোগ্য। সেইরূপ অজানা ও অচেনাকে জানিবার ও চিনিবার আকাঙ্ক্ষা সর্বকালের সর্বদেশের। রোমান্সের প্রভাবও তাই কোন যুগের পাঠক ও লেখক একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই।

কপালকুণ্ডলা অতি-বাস্তব মাটিঘেঁষা আধুনিক উপন্যাস নয়, কিন্তু কপালকুণ্ডলার রোমান্স বাস্তববিরোধী বা অবাস্তবও নয়। কাপালিক, নবকুমার, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি প্রত্যেকেই পৃথিবীর মানুষ, যদিও তাঁহাদের পরিবেশের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। যে আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁহারা প্রতিপালিত ও বর্ধিত, ভাগ্যের যে জটিল জালে তাঁহারা জড়িত, সেখানে তাঁহারা প্রত্যেকেই সত্য ও জীবন্ত। পরিবেশ-রচনার কৌশলে গ্রন্থে বর্ণিত অনেক অলৌকিক ঘটনাও সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করে না। জগৎ ও জীবনকে মানুষ ও তাহার ভাগ্যকে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়াছেন, কখনও বিশ্লেষণে, কখনও ইঙ্গিতে মানবজীবনের রহস্যমণ্ডিত সুখ-দুঃখকে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলায় কাহিনী আছে, চরিত্র আছে, একটা বিশিষ্ট জীবনদর্শন আছে ; অসাধারণ, অলৌকিক ও অপ্রাকৃতের মধ্যেও কার্যকারণের যোগসূত্র আছে। সুতরাং কপালকুণ্ডলাকে উপন্যাস বলিলে কোনও ভুল হয় না, এবং কাব্যসম্পদে সমৃদ্ধ রোমান্টিক উপন্যাস নাম দিলেই ইহার যথার্থ স্বরূপ স্পষ্টভাবে আভাসিত হয়।

কিন্তু সংসারে আমাদের প্রত্যহের বিচরণের যে পরিচিত পথ, সে পথ দিয়া কপালকুণ্ডলার কাহিনী অগ্রসর হয় নাই। সাধারণত্ব-বর্জিত হইয়াই কপালকুণ্ডলা উপন্যাসখানি অপূর্ব কাব্যসমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিশাল সমুদ্র ও জনহীন মহারণ্য,

প্রকৃতিপালিতা কপালকুণ্ডলার রহস্যময়ী মূর্তি, নির্মম কাপালিকের ধর্মসাধনা, সর্বোপরি মানুষের জীবন ও ভাগ্যকে লইয়া এক অদৃশ্য শক্তির লীলা—আমাদের বুদ্ধি ও চেতনায়, আমাদের নয়নে ও মনে বাস্তব-অতিরিক্ত স্বপ্নসুষমাময় একটা আবেশ সৃষ্টি করে, বাস্তবের পথ বাহিয়াই আমরা একটা মনোহর 'অবাস্তব' কাব্যলোকে প্রবেশ করি। নিজের কল্পনাবলে বাস্তব জগতের পাশাপাশি আর একটি সুন্দর রহস্যময় জগৎ গড়িয়া তুলিয়া সেই জগতের কেন্দ্রস্থলে অপূর্ব রহস্যময়ী একটি মানসী প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার জীবনের কাহিনী রচনা করা যদি কাব্য হয়, তবে কপালকুণ্ডলা নিঃসন্দেহে কাব্য। নায়িকার চরিত্রে যে মূল পরিকল্পনা, কপালকুণ্ডলার চরিত্রে প্রকৃতির প্রভাবের যে চিত্র আমরা পাই, তাহা আগাগোড়াই কাব্যাত্মক। কথাসাহিত্যের অংশবিশেষ কাব্যধর্মী হইয়া পড়ে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কিন্তু একখানি উপন্যাস সমগ্রভাবে দিব্য কল্পনায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, কপালকুণ্ডলা ব্যতীত এ দৃষ্টান্ত অন্ততঃ অমাদের দেশে আর নাই।

প্রকৃতির রুদ্র ও সুন্দর রূপ, অপরিচিত স্থান-কালের বিস্ময় অনৈসর্গিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার সঙ্গে মিলিত হইয়া একটা ঘনীভূত রহস্যের ভাব আমাদের মনে সঞ্চার করিতেছে।

উপন্যাসের গঠন-কৌশল

উপন্যাস ও নাটকে কোন্‌টি মুখ্য—প্লট না চরিত্র-সৃষ্টি এই বিষয়ে অনেক কাল হইতেই বিতর্ক চলিতেছে। আধুনিক সমালোচক চরিত্র-সৃষ্টিকেই উপরে স্থান দিয়াছেন কিন্তু সুসংবদ্ধ একটি প্লট না হইলে চরিত্র-সৃষ্টিরও সুযোগ পাওয়া যায় না।

মোহিতলাল মজুমদার লিখিয়াছেন—"উপন্যাসকার তথা মনুষ্যজীবনের আলেখ্য-রচয়িতার একটি বড় কৃতিত্ব—প্লট বা আখ্যাত বস্তুর একটা সুসম্বদ্ধ ও সুসম্পূর্ণ রূপ। এই গল্প-নির্মাণশক্তিই প্রকৃত সৃষ্টিশক্তির লক্ষণ—কারণ সৃষ্টিমাত্রই একটা অখণ্ড সুডৌল রূপ বুঝায়। ঐ আদ্যন্তযুক্ত, সুমণ্ডলায়িত যে একটি প্লট—উহার মূলে আছে সেই 'unity of inspiration' বা কবিদৃষ্টির সমগ্রতা। এখনও বলা যাইতে যে, যে-উপন্যাসে এইরূপ গল্প-সম্পূর্ণতা নাই তাহার কল্পনাও বিক্ষিপ্ত কল্পনা; তাহাতে জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি ভাবনা, কতকগুলি খণ্ডচিত্রের যোজনা, কতকগুলি প্রশ্ন বা আমীমাংসিত সমস্যার উত্থাপন মাত্র থাকে, কবিচিত্তে তাহাদের কোন সুসম্পূর্ণ রূপ প্রতিফলিত হয় নাই। সেই রূপটি দার্শনিক সত্যমিথ্যা বিচার

বা একটি শেষ সিদ্ধান্তের মত হইবার প্রয়োজন নাই, যদি তাহা হয়—তবে সেই রচনা কাব্য বা একটি সাহিত্যিক সৃষ্টিকর্ম হইবে না, রং ও রেখার কারুকর্ম হইতে পারে—জীবনেরই একটা আলেখ্য বা প্রতিকৃতি হইবে না। কিন্তু ঐরূপ সুডৌল, সুসম্বদ্ধ, সুসম্পূর্ণ আকারের মধ্যেই কবিপ্রেরণার একাগ্রতা, বলিষ্ঠতা ও সমগ্র দৃষ্টির পরিচয় থাকে ; একটা গঠিত মূর্তির মতই উহার ঐ সর্বাঙ্গসুষমা বা সর্ব-অঙ্গব্যাপী ভাবৈকসঙ্গতিই খাঁটি সৃষ্টিকর্মের লক্ষণ।"

এই দিক দিয়া 'কপালকুণ্ডলা'র গঠন ও কাহিনী-সমাবেশের নিপুণতা সকলেরই শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রেক করে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসখানির অনবদ্য গঠনকৌশলের প্রশংসা সকলেই করিয়াছেন। ইহার কাহিনীরচনা, ঘটনাসমাবেশ, স্থান-কাল ও ঘটনার ঐক্য, চরিত্রের ঘটনার সামঞ্জস্য, অলৌকিক ও অনৈসর্গিকের অবতারণা —সমস্ত কিছু একসঙ্গে মিলিয়া শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে দুই গল্প। প্রধান বা মূল আখ্যানভাগের কেন্দ্রগত চরিত্র কপালকুণ্ডলা। কপালকুণ্ডলার চরিত্রের বিকাশ ও তাঁহার জীবনের পরিণতি-প্রদর্শন মূল গল্পটির উপজীব্য। অরণ্যবাসিনী কপালকুণ্ডলার সহিত পথহারা নবকুমারের সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের শ্মশানভূমিতে গঙ্গাগর্ভে কপালকুণ্ডলার নিমজ্জন পর্যন্ত প্রধান গল্পের বিষয়। এই প্রধান আখ্যায়িকার পাশা-পাশি আর একটি গল্প গড়িয়া উঠিয়াছে—পদ্মাবতী বা মতিবিবির কাহিনী। দুইটি গল্পের নায়কই নবকুমার। দুইটি গল্পই শেষের দিকে (চতুর্থ খণ্ডে) গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া একটি গল্পে পরিণত হইয়াছে। নবকুমারের প্রতি প্রবল অনুরাগসঞ্চারের ফলে আগ্রার ঐশ্বর্যবিলাস ত্যাগ করিয়া মতিবিবি সপ্তগ্রামে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে এবং কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া কপালকুণ্ডলার বিষাদময় পরিণতি দ্রুততর করিয়াছে। এক দৈবদুর্যোগে, দিগন্তব্যাপী ঘন কুজ্ঝটিকায় গ্রন্থের আরম্ভ, আর এক দুর্যোগে চৈত্রবায়ুতাড়িত তরঙ্গের আঘাতে ক্ষয়িতমূল নদীতটভাগের পতনে ও কপালকুণ্ডলার নিমজ্জনে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। এই তো মানুষের জীবন, এই তাহার মর্ত্যলীলা ; ফুটিয়া উঠিয়া অকালে ঝরিয়া পড়া ; এক অন্ধ অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলিসংকেতে নিয়ন্ত্রিত তাহার জীবন, অথচ ইহার জন্য তাহার কত না আকুলি-বিকুলি !

'কপালকুণ্ডলা'র আখ্যান-নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার একটি নিদর্শন সমালোচক মোহিতলাল উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজীতে যাহাকে

'chance' বলে সেই দৈব সংঘটনাকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়াছেন। Chance আর কিছুই নহে—দুইটি ভিন্নমুখী কার্যকরণ-ধারা যখন কোন এক লগ্নে পরস্পর মিলিত হয় তখন যাহা ঘটে তাহাই chance বা সংঘটন। কপালকুণ্ডলা'র প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই এইরূপ একটি সংঘটনা—সেই অকস্মাৎ নদীতে জোয়ার আসাই সমস্ত কাহিনীর ভিতপত্তন করিয়াছে। এই ঘটনাটি না ঘটিলে, কপালকুণ্ডলার ও নবকুমার উভয়ের জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিণতি লাভ করিত, এবং হয়ত তাহাতে কিছুমাত্র রোমান্সের অবকাশ থাকিত না। ইহা চিন্তা করিলে বিস্ময় বোধ হয়। কিন্তু ঐ ঘটনাটি যে আদৌ অস্বাভাবিক বা অবাস্তব নয়, এবং এইরূপ একটি মাত্র ঘটনাই যে মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ শাসিত করিয়া তাহার সুখ-দুঃখের নিয়ামক হইতে পারে—কবি বঙ্কিমের এই দৃষ্টি যে সেই সমগ্র দৃষ্টির বা জীবনরহস্যবোধের অন্তর্ভূত, এই কাহিনীর সমগ্র ঘটনা-ধারা তাহাই প্রমাণ করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অপরাপর উপন্যাসেও এই chance, ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানারূপে মানবভাগ্যের তথা জীবনকাহিনীর একটা বড় দিক অধিকার করিয়া আছে। অথচ ইহা অদৃষ্টবাদ নয়, ইহা যেন সৃষ্টির মূল নিয়মের সঙ্গেই মানবজীবনের একটা স্বাভাবিক গ্রন্থি; ইহার কোনও ব্যাখ্যা নাই, কোন কারণ নির্দেশ নাই; এই জন্যই ইহা জীবনকে এমন রহস্যময় করিয়া তোলে। মানব-জীবনের যিনি শ্রেষ্ঠ কাব্যকার সেই সেক্সপীয়রের মত বঙ্কিমচন্দ্রও কেবল ইহাকে দেখিয়াছেন মাত্র; তাহার রহস্য-রসে তিনিও যেমন অভিভূত হইয়াছেন, তাঁহার অপূর্ব কবিপ্রতিভার বলে তেমনই আমাদিগকে তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন। জীবনের কেবল বাস্তব-প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্য-মান রূপই নয়, তাহার উর্ধ্বতম শিখর ও নিম্নতম তলদেশ—লক্ষ্য, অলক্ষ্য, বস্তুগত ও ভাবগত, যুক্তিগ্রাহ্য ও যুক্তির অগ্রাহ্য—সর্বাঙ্গীণ রূপটি, যে কবি আমাদের যতখানি অনুভূতিগোচর করিতে পারেন তিনিই সেই হিসাবে তত বড় কবি, সেই কবির কাব্যই সুগভীর সৃষ্টি সত্যে অনুপ্রাণিত।"

প্রথম খণ্ডে কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমারের সাক্ষাৎ, কপালকুণ্ডলার সাহায্যে কাপালিকের কবল হইতে নবকুমারের পরিত্রাণ, কপালকুণ্ডলার বিবাহ ও স্বামিগৃহ-যাত্রা বর্ণিত হইয়াছে। অরণ্যজীবন শেষ করিয়া কপালকুণ্ডলা সমাজজীবনে প্রবেশ করিল। দ্বিতীয় খণ্ডে দেখিলাম, সমাজের অপরিচিত প্রতিবেশ কিছুতেই এই অরণ্য-পালিতাকে আপন করিয়া লইতে পারিতেছে না। তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণই মতিবিবির পরিচয় ও চরিত্রচিত্র। মতিবিবি কপালকুণ্ডলার প্রতিদ্বন্দ্বিনী, নবকুমারের প্রতি

তাহার অনুরাগের প্রবলতা ও নবকুমারের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রত্যাখ্যান তাহাকে কপালকুণ্ডলার সর্বনাশসাধনে উত্তেজিত করিয়াছিল। সেইজন্য মতিবিবির হৃদয়ের পরিবর্তন উপন্যাসকারকে নিপুণভাবে দেখাইতে হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডে ঘটনার গতি অতি দ্রুত ; কাপালিকের সঙ্গে মতিবিবির সাক্ষাৎ, উভয়ের সংযোগে কপালকুণ্ডলার ভাগ্যবিপর্যয়ে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

স্থান-কাল ও ঘটনার ঐক্য, বিশেষ করিয়া ঘটনার ঐক্য শ্রেষ্ঠ নাটক ও উপন্যাসে প্রায়ই রক্ষিত হয়। স্থান ও কালের ঐক্য আধুনিক যুগে কেহ অপরিহার্য মনে করেন না। কিন্তু ঘটনার ঐক্য না থাকিলে উপন্যাসের রসমূর্তি প্রকাশিত হইতে পারে না। কপালকুণ্ডলার উপন্যাসে যে ঘটনা-সমাবেশ করা হইয়াছে তাহার একটিও নিরর্থক নয়, ঘটনা হিসাবে তাহাদের বিশেষ কোনও মূল্য নাই কিন্তু কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপর, নায়িকার জীবনের পরিণতির উপর তাহাদের প্রভাব অপরিসীম। চরিত্র-সৃষ্টিতে সহায়তা করে নাই এমন একটি ঘটনাও এই উপন্যাসে স্থান পায় নাই। কোথায় আগ্রা, কোথায় বর্ধমান, কোথায় সপ্তগ্রাম, ভারতের সিংহাসনে কে বসিবে তাহার ষড়যন্ত্রের সহিত বাংলার একটি পল্লীগৃহের সুখদুঃখের যোগ কোথায়! কিন্তু আশ্চর্য শিল্পকৌশলের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত কিছুকেই অতি সহজে এক লক্ষ্যের অভিমুখী করিয়া তুলিয়াছেন। অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশে বা বাহুল্য-বর্ণনায় এক মুহূর্তের জন্যও বঙ্কিমের কল্পনা কেন্দ্রচ্যুত হয় নাই। বনবাসিনী কপালকুণ্ডলা স্বাভাবিক করুণার বশে নবকুমারকে বাঁচাইতে গিয়া কাপালিকের কোপে পড়িল। এই সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া হইল উভয়ের বিবাহ। কিন্তু তারপর সৃষ্টি হইল নূতন সমস্যা—কপালকুণ্ডলার সংসারে অনাসক্তি ও মতিবিবির অত্যাসক্তি সমস্যাকে তীব্রতর করিয়া তুলিল। কাপালিকের প্রতিহিংসা, মতিবিবির নবজাগ্রত প্রবল প্রেম, নবকুমারের রূপমোহ ও কপালকুণ্ডলার ধর্মসংস্কার কপালকুণ্ডলার ভাগ্যকে এক গভীর রহস্যের গহ্বরে নিমজ্জিত করিল।

অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত উপন্যাসখানির গঠন-কৌশলের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—"সেক্সপীয়রের কোনও নাটকও এত নিখুঁত নহে।" চরিত্রের পরিবর্তনের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে সময়ের গতির যে চিত্র দিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। অধ্যাপক সেনগুপ্ত আরও একটি দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য আমরা একটু বিস্তৃতভাবেই উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই উপন্যাসে দুই একটি আকস্মিক ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে এবং তাহারা

মূল কাহিনীতে অতি সুন্দরভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বড় আখ্যায়িকায় কখনও কখনও আকস্মিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখাইতে হয়। মনুষ্য জীবন যে জ্যামিতির রেখার মত সরল নহে, তাহার মধ্যে যে বহু দুর্জ্ঞেয় শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে, তাহা এই সকল আকস্মিক ঘটনার অভ্যাগমে সূচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই জাতীয় ঘটনাকে প্রাধান্য দিলে জীবন ও আর্টের তাৎপর্য নষ্ট হইয়া যায়। সেক্সপীয়র এই বিষয়ে পরিণাম-বোধের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। একটি উদাহরণের সাহায্যে তাঁহার কৌশলের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ডেস্‌ডিমোনা খুব সঙ্কট মুহূর্তে তাহার রুমাল হারাইল আর সেই রুমাল পড়িল গিয়া ইয়াগোর হাতে। ইহার সাহায্যে ইয়াগো ওথেলোর মনে পূর্ব সন্দেহ দৃঢ় করিয়া দিল। ঐ রুমাল-হারান ডেস্‌ডিমোনার দুর্ভাগ্যের অন্যতম কারণ কিন্তু ইহা মুখ্য কারণ নহে। ইয়াগো পূর্বেই ওথেলোর মনে সন্দেহের বিষ ঢুকাইয়া দিয়াছিল ঃ ইহা সেই সন্দেহকে আরও পাকা করিয়া দিল মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রও এইরূপ রীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা এক জাতীয় না হইলে তাঁহাদের বিবাহ হইতে পারিত না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই আকস্মিক ঐক্যকে খুব গৌণ করিয়া দেখিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা বাস্তবিক পক্ষে ব্রাহ্মণ-কন্যা কি না এবং নবকুমারের সঙ্গে তাহার বিবাহ সর্বতোভাবে শাস্ত্রসঙ্গত কিনা সেই বিষয়ে নবকুমার বা তাঁহার মা কোনও অনুসন্ধান করেন নাই। অধিকারীও তেমন ব্যস্ত হয়েন নাই ; এবং যদিও সেইদিন বৈবাহিক যোগ ছিল না তবুও গোধূলি লগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কাপালিক বালিয়াড়ির শিখর হইতে পড়িয়া যাইয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং ইহার সঙ্গে আখ্যায়িকার যোগ আছে। কিন্তু তাঁহার হাত ভাঙ্গিবার পূর্বেই কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন এবং অধিকারীর নিকট তাঁহারা একদিনের বেশী থাকেন নাই। এইরূপ আকস্মিক ব্যাপারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও তাৎপর্যময় হইতেছে কপালকুণ্ডলা কর্তৃক ব্রাহ্মণবেশীর চিঠি হারান। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে পাইয়াও পান নাই, চিনিয়াও চিনিতে পারেন নাই। অব্যবহিত পূর্ব রাত্রে তাঁহার নিষেধ অবহেলা করিয়া কপালকুণ্ডলা গভীর রাত্রিতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন এবং সেইখানে অপর কাহার সঙ্গে কি কথা হইয়াছে তাহা তিনি স্বামীকে বলেন নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণবেশীর পত্র পড়িয়া নবকুমার 'প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না ; পরে সংশয়, পরে নিশ্চয়তা, পরে জ্বালা।' ঘটনা যত ক্ষুদ্রই হউক, কখনও আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইতে পারে না ; তাহার আত্মপ্রকাশ থাকিবেই। এই চিঠি-হারান কেবল যে সন্দেহ জাগাইয়া তুলিল

তাহাই নহে। চিঠি খুঁজিতে যাইয়া কপালকুণ্ডলা কবরী খুলিয়া সমস্ত চুল আলুলায়িত করিলেন এবং তাঁহার যাইবার সময় অনূঢ়াকালের মত কেশমণ্ডলমধ্যবর্তিনী হইয়া চলিলেন। ইহার ফল হইল এই যে, যখন তিনি ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে কথা বলিতে আসিলেন তখন তাঁহার অবিন্যস্ত কেশের রাশি ব্রাহ্মণবেশীকে স্পর্শ করিয়াছে। দূর হইতে নবকুমার ইঁহাদের কথা শুনিতে পান নাই, কিন্তু একজনের চুল অপরের দেহে প্রসারিত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহমাত্র ছিল না যে কপালকুণ্ডলা অসতী। এমনি করিয়া একটি তুচ্ছ ব্যাপার ইঁহাদের জীবনে চরম অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এইখানে সেক্সপীয়ারের রীতির (বিশেষ করিয়া ডেস্‌ডিমোনার রুমাল-হারান ব্যাপারের) প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে এই ক্ষুদ্র ঘটনাকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং ইহার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছেন তাহার তুলনা সেক্সপীয়ারের নাটকেও বিরল।"

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নাটকীয় লক্ষণ

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের সমালোচনা করিতে গিয়া বিগত যুগের একজন বিদগ্ধ সমালোচক লিখিয়াছেন—"কপালকুণ্ডলা tale নহে, উপন্যাস নহে, উহা গন্ধরীতির কাব্যনাটক, গ্রীক নাটক।"

উপন্যাসের চারিটি খণ্ড যেন নাটকের চারিটি অঙ্কের মত—প্রথমে যে বীজ বপন করা হইয়াছে, তাহাকে অনুকূল ও প্রতিকূল নানা অবস্থার সংঘর্ষের মধ্য দিয়া বর্ধিত করা হইয়াছে, অবশেষে নিদারুণ বজ্রপাতে তাহা দগ্ধ হইয়াছে। এ বজ্রপাত অবশ্য আকস্মিক নয়, ইহার মেঘ ও অগ্নি ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল, উপন্যাসকার তাহার আভাস দিয়েছেন প্রতিটি ব্যাপারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সবগুলি উপন্যাসই অল্পবিস্তর নাট্যলক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের পরিচ্ছেদ-বিভাগগুলি পর্যন্ত নাটকের দ্রুত পটপরিবর্তনের ইঙ্গিত করিতেছে। 'সাগরসৈকতে', 'স্তূপশিখরে', 'পান্থনিবাসে', 'পথান্তরে,' 'প্রতিযোগিনী-গৃহে' এইগুলি যেন এককেটি দৃশ্যের নাম—ঘটনা কোন্ স্থানে ঘটিতেছে তাহারই ইঙ্গিত। এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি প্রথম হইতে যেভাবে গাঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে এবং নায়ক-নায়িকার ভাগ্য নানা ঘটনাসংঘাতের মধ্য দিয়া যেভাবে দ্রুত অনিবার্য পরিণতির দিকে ধাবিত হইয়াছে তাহা নাটকের গঠনের কথাই মনে

করাইয়া দেয়। নবকুমারের জীবনে একটা বিশেষ সঙ্কট-মুহূর্ত বা crisis প্রথমেই দেখা দিয়াছে। সারা রাত্রি বিনিদ্রভাবে যাপন করিয়া এই একটি বিষয়েই চিন্তা করিতেছিলেন যে, কপালকুণ্ডলাকে তিনি বিবাহ করিবেন কিনা। এই বিবাহের পর হইতে নায়কের ভাগ্য catastrophe বা চরম পতনের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। নাটকের falling actionকে একটু বিলম্বিত করিয়া আশা-নিরাশা, সংশয়-সন্দেহের দোলায় দোলায়িত করিয়া অবশেষে দুর্বার বেগে চরম সর্বনাশের দিকে নায়কের ভাগ্যকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া একটি চমৎকার নাট্যকলাকৌশল। ঘটনাসংস্থান ও সংলাপে চরিত্রের মূল সত্তাকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করা সংযতবাক্ নাট্যকারের পক্ষেই সম্ভব। "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ", "আমি পদ্মাবতী", "কবরের মাটিতে এ মুখের আদর্শ থাকিবে" প্রভৃতি সংলাপ প্রথম শ্রেণীর নাটকীয় প্রতিভার পরিচায়ক।

সমুন্নতচরিত্র ব্যক্তির একটি দুর্ভাগ্যের কাহিনীকেই ট্রাজেডি বলে। ইহাই গ্রীক নাটকের প্রকৃতি। নায়কের নিজ কর্মফলেই হউক অথবা একেবারে অকারণে হউক তাহার মৃত্যু ঘটে। শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডিতে কার্যকারণের যেমন একটা যোগসূত্র আছে, তেমনি আকস্মিক দৈবঘটনার বা দুর্বার দুর্জ্ঞেয় নিয়তির একটা হস্তক্ষেপও থাকে। নায়ক-চরিত্রের বহু সদ্গুণের মধ্যে এমন একটা ছিদ্র থাকে, বিশেষ মুহূর্তে যাহা প্রবল হইয়া দেখা দেয় এবং সেই ছিদ্রপথেই সর্বনাশ অনিবার্য হইয়া উঠে।

নিতান্ত দৈবতাড়িত হইয়া নবকুমার পড়িলেন কাপালিকের হাতে, এক অপূর্ব সুন্দরী বনদেবী তাঁহাকে নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিল। মুগ্ধ নবকুমার প্রাণরক্ষা-কারিণীকে কাপালিকের নিষ্ঠুর নির্যাতনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তাহাকে বিবাহ করিলেন। প্রকৃতিদুহিতা সমাজে আসিল, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে গৃহধর্মচারিণী হইতে পারিল না। দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি, একটি মতিবিবির, অপরটি কাপালিকের, নবকুমার-মৃন্ময়ীর দাম্পত্য জীবনের প্রতিকূলতা করিতে লাগিল। নিজ নিজ স্বার্থ-তাড়িত দুইটি প্রবল শক্তি কপালকুণ্ডলার সর্বনাশ সাধনের জন্য একসঙ্গে মিলিত হইল। নবকুমারের যে পৌরুষ মতিবিবির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়াছিল, সে পৌরুষ যেন রাহুগ্রস্ত—কাপালিক যাহা দেখাইল, যাহা বুঝাইল নবকুমার তাহাই বুঝিলেন। কপালকুণ্ডলা প্রাণবিসর্জন করিতে আসিয়াছিল, মোহমুক্ত নবকুমারের কাতর অনুনয়ও তাহাকে ফিরাইতে পারিল না। যে সাগরকূল হইতে সে আসিয়াছিল হয়ত সেই সাগরকূলের অভিমুখেই সে ভাসিয়া চলিল। "এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে

এই উপন্যাসে নাটকের আর্টের পরিচয় রহিয়াছে, কিন্তু উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হইয়া যায় নাই। বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়াছে একটি বিরাট লোকাতীত শক্তি, তাহা নিয়তি নহে কিন্তু নিয়তির মত অপ্রমেয়। ইহা হইতেছে নির্জন প্রকৃতির শক্তি, বিশেষ করিয়া সমুদ্রের প্রভাব। কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে প্রতিপালিতা। কাপালিকের ভীষণতা সমুদ্রের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি। কপালকুণ্ডলা কখনও সমুদ্রের প্রভাব হইতে মুক্ত হন নাই, গার্হস্থ্য জীবনে সর্বদাই অনুভব করিয়াছেন যে, সমুদ্রতীরে বনে বনে ঘুরিতে পারিলে তাঁহার সুখ হয়। নবকুমার তাঁহার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইলেও তিনি গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহেন নাই। যে সমুদ্রের আহ্বান তাঁহাকে গৃহকর্মের প্রতি বিমুখ করিয়াছিল তিনি তাহারই কোলে বিলীন হইয়া গেলেন।"

সুলেখক কালিদাস রায় কবিশেখর বঙ্কিম প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—'ট্রাজেডি নানাভাবেই সংঘটিত হয়। মানুষ সমাজের দাস। মানুষের স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহে যখন সমাজ-বিধান বাধা দেয়, তখন ট্রাজেডি হয়। মানুষ প্রকৃতির দাস—প্রকৃতিকে জয় করিতে না পারিলে অসৎ প্রকৃতি পরিণামে ট্রাজেডি ঘটায়। লখীন্দরের লৌহগৃহে একটিমাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল। সেই ছিদ্রই বেহুলার দাম্পত্যজীবনে ট্রাজেডি ঘটাইল। একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সরস চরিত্রেও এমনি কোন একটি অঙ্গহানি থাকিতে পারে, সেই অঙ্গহানিই শেষ পর্যন্ত ট্রাজেডি ঘটায়।'

এই আলোচনার আলোকে নবকুমারের চরিত্র যদি পর্যালোচনা করা যায় তবে তাঁহার চরিত্রের সেই ছিদ্র কোন্‌খানে? কোন্ দুর্বলতার সুযোগে অনর্থ ঘটিল? পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিবেন যে, কাপালিকের হস্তের ক্রীড়নক নবকুমার, চক্ষু থাকিতে অন্ধ নবকুমারের দুর্বলতাই দায়ী। মার্জিতবুদ্ধি,উন্নতমনা,পরোপকারী, নির্লোভ পত্নীবৎসল নবকুমারের কপালকুণ্ডলার প্রতি অত্যাসক্তি, মোহ এই দুর্বলতার মূল।

দুর্বলতাও নবকুমারের আসিয়াছে তাঁহার প্রথমা পত্নীর ব্যাপার হইতে। দাম্পত্য সুখ বুঝি তাঁহার ভাগ্যে নাই এই প্রকার একটা মনোভাব কপালকুণ্ডলার প্রতি আকর্ষণ ও মোহ প্রবলতর করিয়াছে—এই মোহ হইতে বুদ্ধিভ্রষ্ট ঘটিয়াছে। ভারতীয় পাঠক ইহার ভিতরে জীবনের অপচয় যতখানি প্রত্যক্ষ করে, নিয়তির বেদীতে নায়ক-নায়িকার বলিদান যতখানি উপলব্ধি করে তাহার চেয়েও বেশী করিয়া মনে করে নায়কের জীবনে তাহার অর্জিত কর্মফল—এই তাহার বিধিনির্দিষ্ট ভাগ্য—অনতিক্রমণীয় প্রাক্তন—যাহার গতি কেহ রোধ করিতে পারে না।

অলৌকিক ও অতি-প্রাকৃত

কপালকুণ্ডলায় অনেক অলৌকিক ও অতি-প্রাকৃত ব্যাপারের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। অতি-প্রাকৃত সম্বন্ধে আধুনিক মনোভাব যাহাই হউক সাহিত্য চিরকালই অতি-প্রাকৃত ও অলৌকিকের মর্যাদা দিয়াছে, নরনারীর ভাগ্যরহস্যের সঙ্গে অতি-প্রাকৃতের একটা অদৃশ্য যোগ আবিষ্কার করিয়া মানুষ সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-শিল্পিগণের রচনায় অতি-প্রাকৃতের অভাব নাই। কিন্তু মাত্রা রক্ষা করিয়া, অর্থাৎ পাঠকের বাস্তববোধ ও বাস্তব বিশ্বাসকে আঘাত না দিয়া, চরিত্রের মূল প্রাকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অতি-প্রাকৃতকে সাহিত্যের উপাদানরূপে ব্যবহার করায় শিল্পীর যথার্থ কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই কৃতিত্বের পরিচয় আছে। সাধারণ জীবনের উপর একটা অসাধারণের স্পর্শ, বাস্তব জীবনের উপর একটা সম্ভাব্য অবাস্তবের ছায়াপাত, মানুষের সুখদুঃখের উপর এক অদৃশ্য রহস্যময় শক্তির অমোঘ প্রভাব এবং সেই প্রভাবের মধ্য দিয়াই চরিত্রগুলিকে সৃষ্টি করিয়া তোলা—সর্বোপরি এক নির্মম অন্ধ শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মানুষ তাহার আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম ও প্রতিরোধকে ধূলিসাৎ দেখিয়া বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় ও আতঙ্কে যেভাবে স্তব্ধ ও উদাস হইয়া যায় সেই ভাব জাগ্রত করিয়া তোলা—এইগুলিই উপন্যাসের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই কপালকুণ্ডলায় অতি-প্রাকৃতের অবতারণা।

প্রথম খণ্ডে অধিকারী কপালকুণ্ডলার বিবাহের অনুমতি চাহিয়া দেবীর চরণে একটি অভিন্ন বিল্বপত্র অর্পণ করিলেন ও দেবী তাহা গ্রহণ করিলেন। ধর্মপ্রাণ অধিকারী ইহাকে সুলক্ষণ মনে করিয়া কপালকুণ্ডলার বিবাহ দিলেন। কপালকুণ্ডলা বিবাহ-সংস্কার লাভ করিল ও কাপালির দুষ্ট অভিপ্রায় হইতে পরিত্রাণ পাইল। অধিকারী বুঝিলেন, এ বিবাহে কপালকুণ্ডলার মঙ্গল হইবে।

কপালকুণ্ডলা স্বামীর সঙ্গে সপ্তগ্রামে যাত্রার পূর্বে দেবীপ্রতিমাকে প্রণাম করিতে গিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটি বিল্বপত্র দেবীর চরণে স্থাপিত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিল্বপত্রটি পড়িয়া গেল। এই দুর্লক্ষণ ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের সূচনা করিতেছে। এই ঘটনাটি খুবই সামান্য ; কিন্তু কপালকুণ্ডলার সমস্ত জীবনের সংস্কার এই সামান্য ব্যাপারটিকে অতি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছে। এই সামান্য ঘটনাটিকে কপালকুণ্ডলা মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে পারে নাই। সমুদ্র ও অরণ্যের আকর্ষণ তাহাকে নিরন্তন আহ্বান করিতেছিল, ইহার সঙ্গে বিল্বপত্রচ্যুতির

দুর্লক্ষণ তাহাকে সংসারে অনাসক্ত করিয়া রাখিল। শ্যামসুন্দরীও এই ঘটনার কথা শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছে। কপালকুণ্ডলার ধর্মভাবের সহিত, তাহার চরিত্রের মূল প্রকৃতির সহিত ভাবী শুভাশুভের ইঙ্গিতপূর্ণ এই ঘটনাটি চমৎকার সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে।

কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ঔষধ সংগ্রহ করিতে গিয়া ব্রাহ্মণবেশীর সাক্ষাৎ ও নিজ গৃহপ্রাঙ্গণে কাপালিকের দর্শন কপালকুণ্ডলার মনকে এক সমাধানহীন চিন্তার রাজ্যে লইয়া গিয়াছিল। উত্তেজিত মস্তিষ্কের বিকার-প্রসূত স্বপ্নদর্শন তখন খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কপালকুণ্ডলার নিকট এই স্বপ্ন অলীক স্বপ্নমাত্র নয়। ইহার মধ্য দিয়া ভক্তিপরায়ণা বালিকা দেবীর সুস্পষ্ট প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা ইঙ্গিত আবিষ্কার করিয়াছে। একটা স্বপ্নের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া সমাজের নরনারী তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়িয়া তোলে না। কিন্তু কপালকুণ্ডলার ধর্মপ্রবণতার সঙ্গে অলৌকিকের প্রতি এই গভীর বিশ্বাস কত স্বাভাবিক। কাপালিকের স্বপ্নবৃত্তান্ত মতিবিবির মুখে শুনিয়া তাহাও কপালকুণ্ডলা এমনই গভীরভাবেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলার মনে আত্মবিসর্জনের প্রেরণা জোগাইয়া দিবার জন্য এই দুইটি স্বপ্নের অবতারণা অথচ স্বপ্ন দুইটি উভয় (কপালকুণ্ডলা ও কাপালিক) চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে।

কপালকুণ্ডলার ভৈরবীমূর্তি-দর্শন উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অলৌকিক ব্যাপার। ইহা স্বপ্ন নয়, পূর্ণ জাগ্রতাবস্থায় অলৌকিক প্রত্যক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে ভাবাবিষ্ট মনের বিকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ পরিচ্ছেদ-সূচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "No spectre greets—no vain shadow this." নবনীরদ-নিন্দিত মূর্তি নরকপালমালিনী ভৈরবী দীর্ঘ ত্রিশূল করে লইয়া পথের ইঙ্গিত করিতেছেন, তাঁহার স্পষ্ট কণ্ঠস্বরও যেন কপালকুণ্ডলা শুনিতে পাইয়াছেন—'বৎসে! আমি পথ দেখাইতেছি।' কপালকুণ্ডলার ধর্মভাবের সহিত, তাহার আজন্মের সংস্কারের সহিত এই অলৌকিক দর্শনের গভীর যোগ আছে। আত্মবিসর্জনের প্রেরণা এই ব্যাপার হইতে কপালকুণ্ডলা পাইয়াছেন, ভৈরবীর পথ-নির্দেশকে অভ্রান্ত ও সুস্পষ্ট ইঙ্গিতরূপে তাঁহার অন্তরাত্মা গ্রহণ করিয়াছে। এই দৃশ্যটিতে সেক্সপীয়রের প্রভাব আছে, মনে হয়। 'কপালকুণ্ডলা' রচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বলিয়াছেন—সেক্সপীয়র বড় বেশী পড়িতাম। সেক্সপীয়রের,

নাটকের অলৌকিক ও অনৈসর্গিকের বাহুল্য—ম্যাকবেথের পরশুদর্শন, শূন্য আসনে ব্যাঙ্কোর অবস্থিতি, হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মার আবির্ভাব প্রভৃতি ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে অপ্রাকৃত ও অনৈসর্গিক ব্যাপারগুলি কেবল বৈচিত্র্যসাধনের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই, নায়িকার অন্তরপ্রকৃতির সহিত জড়িত মিশ্রিত হইয়া আখ্যানভাগে গতিবেগ সঞ্চারিত করিয়াছে, একটা অমোঘ নিয়ামক শক্তিরূপে সুখদুঃখ ও ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। নিসর্গ ও অনৈসর্গিক এই উপন্যাসের যেন দুইটি প্রধান চরিত্র। মানবচরিত্র ও ভাগ্যের উপর ইহাদের এতখানি প্রাধান্য আমরা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করিয়া লই।

একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, 'কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিমচন্দ্র অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন একটা শিল্পকৌশল হিসাবে, এ বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব মতবাদ তখনও গড়িয়া উঠে নাই। প্রত্যেকটি ব্যাপার সাধারণভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়, ইহাদের মধ্য দিয়া কাপালিক ও কপালকুণ্ডলার প্রবল ধর্মভাব, অন্ধভক্তি প্রভৃতিই সূচিত হয়। ইহাদের সঙ্গে জীবনের সুখ-দুঃখের কোনও কার্যকারণ সূত্র বঙ্কিমচন্দ্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন নাই, যদিও পরবর্তী রচনায় এই বিষয়ে তাঁহার একটা মতবাদ দেখা দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের উক্তিটি উদ্ধরণযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—" 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র নিয়তির কার্যকলাপের অতি সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন। কপালকুণ্ডলায় এই সম্পর্কে তাঁহার কোন স্পষ্ট সুনির্দিষ্ট মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু অদৃশ্যজগৎ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কৌতূহল জাগরিত হইয়াছে এবং তাহার সম্বন্ধে অনির্দেশ্য ইঙ্গিত তাঁহার কাছে পৌঁছিয়াছে। এই ইঙ্গিতের সঙ্গে মানুষের প্রবৃত্তির ও প্রকৃতির লীলার যোগ আছে কিন্তু এই সংযোগকে কোনও সরল সহজ আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ করা যায় না। ইহার মধ্যে মতিবিবির ললাট-লিখন আছে, আবার সমুদ্রতীরের মোহিনী মায়াও আছে, আর সকলকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে এক অদৃশ্য শক্তি যাহার সঙ্কেত কাপালিক, কপালকুণ্ডলা ও অধিকারী খুঁজিতেছেন। কপালকুণ্ডলা যে বিবাহে রাজি হইলেন তাহার একটি কারণ এই যে, অধিকারীর বিল্বপত্র ভবানী গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবকুমারের গৃহে কপালকুণ্ডলা সুখী হন নাই। তিনি সমুদ্রতীরের অনিবার্য আকর্ষণ অনুভব করিতেন; কিন্তু তাঁহার দেওয়া অভিন্ন বিল্বপত্র যে দেবীর পদতল হইতে পড়িয়া গিয়াছিল ইহাই তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক পীড়া দিতে লাগিল। বোধ হয় সমুদ্রতীরের আকর্ষণ ও দেবীর অপ্রসাদ একত্রিত

হইয়া তাঁহাকে গৃহধর্মে উদাসীন করিয়াছিল। তারপর ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কাপালিক দর্শন। এইখানেও নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিকের মধ্যে অপরূপ সম্মিলন। ব্রাহ্মণবেশীর স্বরূপ সম্পর্কে কপালকুণ্ডলার পূর্ব হইতেই সন্দেহ হইয়াছিল এবং রাত্রিতে যে ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণবেশীরও আবির্ভাব হইল। যে অনিবার্য শক্তি তাহাকে পুনরায় বাহিরে লইয়া গেল তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে এই ইঙ্গিতময় স্বপ্ন, 'অরণ্যের জ্যোৎস্নাময়ী শোভা, কাননতলে অন্ধকার, সেই অরণ্য মধ্যে যে সহচর পাইয়াছিলেন তাহার ভীমকান্তগুণময় রূপ।' পরে তিনি যে আত্মবিসর্জন করিতে সঙ্কল্প করিলেন তাহার মধ্যেও নানাশক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে। কপালকুণ্ডলার মন একেবারে নিঃসঙ্গ, পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন তথায়ও নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না; তবে কেন লুৎফউন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন। তারপর নিজের স্বপ্ন ও কাপালিকের স্বপ্ন তাঁহার কাছে ভবানীর সুনিশ্চিত প্রত্যাদেশ বলিয়া প্রতীত হইল; পঞ্চভূতের যে বন্ধন ছিল তাহাও শিথিল হইল; কপালকুণ্ডলা নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক ও অন্তরস্থ আহ্বানে জীবনবিসর্জনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।"

স্বর্গত মোহিতলাল মজুমদার 'কপালকুণ্ডলা'র কয়েকটি বিশিষ্ট কাব্যলক্ষণ বা কলাকৌশলের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—'রোমান্টিক কল্পনার কতকগুলি উপাদান এই উপন্যাসের কাব্যগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। যথা, নির্জন অরণ্য ও সমুদ্রতীর; অপরিচিত দেশ, দুর্গম পথ, দস্যুভয়; আভিজাত্যের ঐশ্বর্য, অতীতের মায়া; অতিশয় সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। কিন্তু ইহার প্রধান রোমান্টিক কাব্যরস হইয়াছে সেই বস্তু ইংরাজীতে যাহাকে বলে grotesque ও bizarre, একটা দুর্জ্ঞেয় ভীষণ অনৈসর্গিক ভাবের ঘটনা ও চরিত্রসৃষ্টিতে; ঐ তান্ত্রিক কাপালিক ও তাহার ক্রিয়া-কলাপে, সেই রস সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহাও লক্ষণীয় যে, এই কাহিনীর আরম্ভ হইয়াছে যেরূপ ভীষণ গম্ভীর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে—শেষও হইয়াছে প্রায় অনুরূপ প্রতিবেশে।

'ইহার রোমান্টিক ভাবমণ্ডল, তথা নাটকীয় অবস্থাসঙ্কটকে ঘনীভূত করিয়াছে আর একটি কল্পনাকৌশল—একটা দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি বা ভবিতব্যের অবতারণা; ইহাও ট্রাজেডি-রসকে পুষ্ট করিবার একটি প্রকৃষ্ট কৌশল, ইহাও একপ্রকার দুর্জ্ঞেয়তার রহস্য-রসে পাঠকের চিত্ত অভিভূত করে। সেক্সপীয়র তাঁহার বড় নাটকগুলিতে প্রায়

সর্বত্র এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন—কোথাও দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্‌বাণী, কোথাও নায়ক বা নায়িকার চিত্তে অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কা, কোথাও স্বপ্নদর্শন, কোথাও বা প্রেতমূর্তি বা ডাইনী প্রভৃতির আবির্ভাব। 'কপালকুণ্ডলা'র কবিও সেইরূপ কলা-কৌশলের সুযোগ লইয়াছেন। উহার মূলে কোন বিশ্বাস বা মতবাদের প্রতিষ্ঠা নাই।'

কপালকুণ্ডলার চরিত্র

উপন্যাসের নায়িকা কপালকুণ্ডলার চরিত্রই এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এবং সমগ্র গ্রন্থখানির প্রধান আকর্ষণ। ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া মূল আখ্যানভাগ রচিত হইয়াছে। ইহাকে ঘিরিয়াই অন্যান্য চরিত্র দেখা দিয়াছে, বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি সমস্যা লইয়া উপন্যাসকার পরীক্ষা করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার চরিত্রের পরিকল্পনার মূলে যে সমস্যাটি গ্রন্থকারের মনে উদিত হইয়াছিল তাহা এই যে, আদিম নারীপ্রকৃতির উপর বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব কতখানি ? সমাজের প্রভাবই বা কতখানি ? কোন একটি নারী যদি সংসার, সমাজ হইতে দূরে প্রকৃতির কোলে শৈশব হইতেই যৌবন পর্যন্ত কাটাইয়া পরে সংসারে, সমাজে আসিয়া বাস করে, তবে তাহার জীবন প্রকৃতি ও সমাজের যুগপৎ বিপরীত আকর্ষণে কোন্ পরিণতি লাভ করিবে ? এই জাতীয় প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রের মনে উদিত হইয়াছিল, বঙ্কিম-সহোদর পূর্ণবাবুর লেখা হইতে ইহা আমরা জানিতে পারি। কপালকুণ্ডলার চরিত্রের মূল পরিকল্পনা যাহাই হউক না কেন, শিল্পী বঙ্কিমের হাতে এই চরিত্রটি যেভাবে রূপলাভ করিয়াছে তাহাতে আমরা ইহাকে সাহিত্যিক পরীক্ষা বা কোনও তত্ত্বঘটিত আলোচনা বা আদিম নারীপ্রকৃতির মূল রহস্যানুসন্ধান কিছুই বলিব না। অরণ্য হইতে তুলিয়া আনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলাকে পূর্ণ সামাজিক প্রতিবেশে স্থাপন করেন নাই। হয়তো ভয়ে ভয়েই করেন নাই। কপালকুণ্ডলাকে গ্রন্থকার যেভাবে গড়িয়াছেন, যে বিরোধী শক্তি তাহার জীবনকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতেছে দেখাইয়াছেন, তাহাতে কপালকুণ্ডলার প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি কথা, অলৌকিক ঘটনায় তাহার অন্তরের প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়া আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে, সব কিছুর মধ্যেই একটা সঙ্গতি সামঞ্জস্য অনুভূত হয়—সাহিত্যের পাঠকের এইটুকু জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

কপালকুণ্ডলা প্রকৃতিদুহিতা। সমাজের কোনও সংস্কার বা লোকালয়ের কোন

অভিজ্ঞতা তাহার নাই। তাহার জন্মের কথা ও শৈশবের কাহিনীসম্বন্ধে কোনও স্মৃতি বহন করিয়া কপালকুণ্ডলা সাগরসৈকতে আসে নাই। বুদ্ধি ও জ্ঞান উন্মেষের পূর্ব হইতেই সে অরণ্যে প্রতিপালিতা। শৈশবের সরলতা যৌবনেও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কপালকুণ্ডলার রূপ অসামান্য। মাথায় রাশীকৃত কুঞ্চিত কেশভার, স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী হরিণীর মত সর্বদা চঞ্চল চরণে সে বনপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। কিন্তু তাহার প্রকৃতির মধ্যে একটা গাম্ভীর্য আছে, নিবিড় অরণ্য ও বিশাল সমুদ্র তাহার স্বভাবকে করিয়া তুলিয়াছে গম্ভীর ; হাস্য-পরিহাস-চপলতা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অরণ্যপ্রকৃতি ব্যতীত কপালকুণ্ডলার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে আর দুইজন মানুষ, একজন তান্ত্রিক সাধক কাপালিক আর একজন ভবানীর পূজারী অধিকারী। কাপালিকের সাধনার নির্মমতা কপালকুণ্ডলা হৃদয় দিয়া হয়তো গ্রহণ করে নাই, কিন্তু কাপালিক যে শক্তির সন্তুষ্টির জন্য নরবলি দেয় ও শবসাধনা করে তাহার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল কপালকুণ্ডলার অসাধারণ। কাপালিকের নিকট নরবলি দেখিয়া নশ্বর নরদেহের পরিণাম সম্বন্ধে তাহার ধারণা হইয়াছে এবং অনাসক্তির মূল দৃঢ় হইয়াছে। নিজের জীবন সম্বন্ধেও এই ঔদাসীন্যের মূলে কাপালিকের প্রভাব। স্নেহপরায়ণ অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে মা বলিয়া ডাকিত, কিন্তু একটা গভীর ধর্মভাব ও একটা অদৃষ্টবাদ ছাড়া অধিকারীর নিকট হইতে আর কোনও শিক্ষাই কপালকুণ্ডলা লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। আদিম নারীর কতকগুলি গুণ—স্বাধীনতা-স্পৃহা, কৌতূহল, করুণা, সাহস, বুদ্ধি ও সরলতা তাহার চরিত্রের সহজাত বৈশিষ্ট্য—ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে একটা দুরপনেয় ধর্মসংস্কার, দৈব বা ভবিতব্যের উপর একটা অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ।

অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে গম্ভীরনাদী সাগরকূলে এই রহস্যময়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল নবকুমারের। অপরিচিত যুবককে দেখিয়া কপালকুণ্ডলা মনে কোনও চাঞ্চল্য অনুভব করিল না, তাহার দৃষ্টিতে ও কথায় কোনও রমণীসুলভ সঙ্কোচ নাই। পথহারা পথিকের জন্য মনে সমবেদনা ছাড়া, নির্জন বনদেশে অপরিচিত যুবককে দেখিয়া একটু কৌতূহল ও বিস্ময় ছাড়া আর কোনও ভাবান্তর তাহার মনে হয় নাই। অপরিসীম সারল্যের বশবর্তী হইয়াই সে কাপালিকের অনুগমনকারী নবকুমারের গাত্র স্পর্শ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই। খড়্গ লুকাইয়া রাখিয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে নবকুমারকে রক্ষা করা, কাপালিকের ক্ষণিক অনুপস্থিতির সুযোগে নবকুমারের লতাবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাওয়া—

কপালকুণ্ডলার নিতান্ত বালিকাবুদ্ধি এ সমস্ত কাজ করে নাই। কপালকুণ্ডলা নির্বোধ নয়। কাপালিকের রোষোৎপাদন করিয়া আবার তাহারই নিকট ফিরিয়া গেলে যে গুরুতর অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে তাহা জানিয়াও সে কাপালিকের নিকটেই ফিরিতে চাহিয়াছিল। আত্মজীবনসম্পর্কে সে উদাসীন, নিজের সুখদুঃখের কোনও দায়িত্ব সে নিজে বহন করিতে চায় না ; অদৃষ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার শিক্ষা সে গ্রহণ করিয়াছে।

নবকুমারকে সে রক্ষা করিয়াছে পরদুঃখকাতর হইয়া, অন্য কোন প্রেরণাই এজন্য সে অনুভব করে নাই। বিবাহে সে সম্মতি দিয়াছে অনুরাগের বশবর্তী হইয়া নয়। 'বিবাহই হউক' এ সম্মতি উদাসীনের আত্মসমর্পণ—ইহার পশ্চাতে হৃদয়ের কোনও স্পন্দন অনুভূত হয় না। তাহার মনের ধর্মসংস্কার, বিবাহের আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা করিয়া লইয়াছে মাত্র। সমুদ্র ও অরণ্য তাহার নিকট সমাজ ও নবকুমারের অপেক্ষা প্রিয়তর। অধিকারীর নিকট বিদায় লইতে তাহার চোখে জল আসে, কাপালিককে ছাড়িয়া আসিতেও সে ব্যথা বোধ করে। সামাজিক জীবনসম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা নাই বলিলে কিছুই বলা হয় না। এ বিষয়ে তাহার কোনও সংস্কার জন্মে নাই। অপরিচিতা নারী দেহ হইতে মূল্যবান্ অলঙ্কাররাশি খুলিয়া তাহার দেহে পরাইয়া দিলেও সে আপত্তি করে না, বাধা দেয় না, শুধু চাহিয়া থাকে! সমস্ত অলঙ্কার ভিক্ষুককে দান করিতেও তাহার বাধিল না, বরং ভিক্ষুককে দৌড়াইতে দেখিয়াই সে বিস্ময় বোধ করিল।

এই নিসর্গপ্রীতি ও সমাজজ্ঞানের অভাবের সহিত মিশিয়াছে কপালকুণ্ডলার অদ্ভুত ধর্মমোহ। সামাজিক জীবনেও অনেক নারীর ধর্মসংস্কার অত্যন্ত প্রবল থাকে। একটা অন্ধসংস্কার বা একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা মাঝে মাঝে জীবনে একটা অশান্তির ছায়া ফেলে। কিন্তু কপালকুণ্ডলার তীব্র ও গভীর ধর্মসংস্কারের তুলনা নাই। পতিগৃহে যাত্রার পূর্বে দেবীর চরণে যে বিল্বপত্র সে অর্পণ করিয়াছিল সে পত্রটি পড়িয়া যায়। এই ঘটনাটির স্মৃতি আর সে ভুলিতে পারিল না। তাহার অনাসক্তি গভীরতর হইল, সংসার-সমাজ তাহার আপন হইল না।

এক বৎসর কপালকুণ্ডলা স্বামিগৃহে বাস করিয়া খানিকটা সামাজিক জ্ঞানলাভ করিয়াছে, খানিকটা গৃহিণীভাবাপন্না হইয়াছে। যে বিবাহ কাহাকে বলে জানিত না, সে এখন 'কুচরিত্রা', 'অবিশ্বাসিনী' কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারে। কিন্তু আরণ্য জীবনের স্মৃতি এখনও তাহাকে উতলা করিয়া দেয়। প্রণয়প্রবৃত্তির অভাবের জন্য

বিবাহ তাহার কাছে দাসীত্ব বলিয়া মনে হয়। নবকুমার তাহার কাছে 'ব্রাহ্মণ-সন্তান'। কৃতজ্ঞতা ও সমবেদনা ব্যতীত অন্য কোনও মনোভাব পোষণ করিবার শক্তিই যেন তাহার নাই। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের ঘরণী হইয়াও আসলে তখনও অরণ্য ও সাগরতীরের প্রবাসিনী।

কপালকুণ্ডলার অসামান্য সরলতা মতিবিবিকে স্বকার্যসাধনে উৎসাহিত করিয়াছিল, কিন্তু কপালকুণ্ডলা যখন মতিবিবির প্রকৃত পরিচয় পাইল, স্বামী ত্যাগ করিবার জন্য যখন মতিবিবি অনুরোধ করিল তখন কপালকুণ্ডলার মনে কোনও দ্বিধা আসিল না, সপত্নীর প্রতি কোনও বিদ্বেষ দেখা দিল না। যে সংসারের নয় তাহাকে সংসারে বাঁধিয়া রাখে কে? দেবতা যাহাকে অনাসক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সে বন্ধন স্বীকার করিবে কেন? স্বপ্নে সে দেবীর প্রত্যাদেশ লাভ করে, আকাশে রণ-রঙ্গিণী মূর্তি তাহার অন্তিম পথ নির্দেশ করে।

দয়া, সমবেদনা, সাহস, বুদ্ধি প্রভৃতি আদিম নারীর চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সহিত যুক্ত হইয়াছে অরণ্য বাসিনীর প্রণয়প্রবৃত্তি ও যৌন-আকাঙ্ক্ষার অভাব। একটা প্রবল ধর্মসংস্কার তাহার চরিত্রে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। সারল্যের সঙ্গে এতখানি গাম্ভীর্য, কোমলতার সঙ্গে এতখানি দৃঢ়তা, প্রকৃতির সহিত জীবনের অন্তরতর সত্তার এতটা নিবিড় যোগ, এরূপ চরিত্র সাহিত্যে আর একটিও নাই। আত্মবিসর্জনের সংকল্পের মধ্যে যখন জীবনের সমস্ত সংঘাতকে সে বিলীন করিয়া দিল, তখন কপালকুণ্ডলা শান্তিলাভ করিল। সংসারের দিকে একবার যখন পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল, তখন কিছুতেই তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত করা গেল না। এই অনাসক্তি বা ঔদাসীন্যের 'কঠিন বেষ্টনী অতিশয় দুর্ভেদ্য বলিয়াই তাহার সহিত কোন মানুষের কোনরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারিল না, সেই পাষাণ প্রাচীরে প্রহত হইয়া নবকুমারও চূর্ণ হইয়া গেল।' কপালকুণ্ডলা শিল্পী বঙ্কিমের অপূর্ব সৃষ্টি।

মতিবিবির চরিত্র

মতিবিবির চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি সার্থক সৃষ্টি। উপন্যাসের আখ্যায়িকার দিক্ দিয়া মতিবিবির চরিত্রের প্রয়োজন আছে, মতিবিবি অপ্রধান গল্পটির নায়িকা, মতিবিবির আবির্ভাব উপন্যাসের আখ্যায়িকাকে জটিল করিয়াছে; যে আবর্তের মধ্যে পড়িয়া নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা তলাইয়া গেল সে আবর্ত একান্তভাবে মতিবিবিরই সৃষ্টি। কপালকুণ্ডলার পাশে এই অত্যন্ত আত্মসচেতন চরিত্রটির সৃষ্টি করিয়া

গ্রন্থকার একটা বৈপরীত্য সমাবেশ করিয়াছেন, এই সুস্পষ্ট অত্যুজ্জ্বল চরিত্রের আলোকচ্ছটায় কপালকুণ্ডলার চরিত্রের অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট রূপটি পাঠকের পক্ষে অনেকটা সহজবোধ্য হইয়াছে।

নিষ্ঠুর নিয়তি যখন পদ্মাবতীকে তাহার ধর্ম ও সমাজ হইতে সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল, তখন অদৃষ্টের এই পরিহাসকে সে মানিয়া লইল না। তাহার বুদ্ধি ছিল, রূপ ছিল, পূর্বস্বামী জীবিত থাকিতে কেহ যে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে না, ইহার জন্য সে দুঃখবোধ করে নাই। রাজধানীর ঐশ্বর্যবিলাসের মধ্যে সে নানা ভাষায় সুশিক্ষিতা হইয়াছে, নৃত্যগীত শিখিয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও নীতিশিক্ষা সে লাভ করে নাই। তাহার চরিত্রের অসংযম অনুকূল অবস্থা পাইয়া দিন দিন বাড়িয়াছে। তাহার সরস বাক্‌পটুতা ও পরিহাসনিপুণতা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাহার নয়নের কটাক্ষ ও আবেশ, তাহার সমাজ ও লোকচরিত্রের জ্ঞান, তাহাকে অতি সহজেই পুরুষের ভোগসহচরী করিয়া তুলিয়াছে। নিজের রূপগুণ-সম্বন্ধে সে সর্বদা সজাগ সচেতন, পুরুষের চিত্তে কামনার আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়া তাহার পৌরুষকে ধূলায় লুটাইয়া সে আনন্দ পায়। এই শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই সে ভারতের সম্রাজ্ঞী হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, সেলিমের চিত্তও জয় করিয়াছিল। কিন্তু নিয়তি আবার পরিহাস করিল।

যুবরাজ সেলিমের প্রতি মতিবিবি অন্তরের কোনও আকর্ষণ অনুভব করে নাই। সেলিমকে রূপের ফাঁদে ফেলিয়া তাঁহার চিত্তে প্রতিদ্বন্দ্বিহীন প্রভুত্ব বিস্তার করিবার মূলে তাহার ভালবাসা নয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আধিপত্য-বিস্তারের দুরাকাঙ্ক্ষা। ঐশ্বর্যভোগ-বিলাস তাহার নয়ন-মন ধাঁধিয়া দিয়াছিল—উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষাতাড়িত হইয়া সে যাহা করিয়াছে তাহা নারীসুলভ তো নয়ই, বহু পুরুষের পক্ষেও তাহা সম্ভব নয়। স্বপ্ন যখন ভাঙ্গিয়া গেল, সেলিমের বিরুদ্ধেই সে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে একটুও ভয় পাইল না। সেলিমের ও আগ্রার আকর্ষণ শিথিল হয় নাই, কিন্তু মতিবিবির আসন টলিতেছে এই অবস্থায় পান্থশালায় নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। নবকুমারকে দেখিয়া ও তাহার পরিচয় জানিতে পারিয়া পূর্বস্মৃতি তাহার চিত্তে জাগিয়াছিল, মতিবিবির মধ্য হইতে চকিতে পদ্মাবতী আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছিল। মতিবিবি নিজ হৃদয়ের দুর্বলতা বুঝিয়াছিল, কিন্তু নবকুমারের নিকট দুর্বলতা যাহাতে ধরা না পড়ে, সেদিকেও প্রখর দৃষ্টি ছিল। প্রদীপ নিভাইয়া সে আত্মরক্ষা করিয়াছিল।

মতিবিবির প্রতি পদক্ষেপ সতর্ক। পান্থশালায় নবকুমারকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু আগ্রার আকর্ষণ তখনও তাহাকে প্রলুব্ধ করিতেছিল। সে পথের শেষ না দেখিয়া তাহার অন্যপথে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব নয়। মতিবিবির মত প্রখরবুদ্ধিশালিনীর পক্ষে হঠাৎ একটা হৃদয়াবেগের বশবর্তী হইয়া, একদিনের একটা সুখকর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া আগ্রার মোহ ত্যাগ করা স্বাভাবিক হইত না। নিজের মনের উপরই বা বিশ্বাস কি? নিজের হৃদয়কেও তো একবার যাচাই করিয়া লওয়া দরকার। তারপর নবকুমার তো আছেই। যুবরাজ সেলিম যাহার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ, নবকুমারের সাধ্য কি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে! মতিবিবি শের আফগানের অন্তঃপুরে ছুটিয়া গেল মেহের-উন্নিসার মন জানিতে, সেখানে বুঝিতে পারিল আগ্রার সকল আশাই তাহার ফুরাইয়াছে। মেহের-উন্নিসার নিকট পরাজিত হইবার পর মতিবিবির আগ্রার মোহ একেবারে কাটিয়া গেল। সেলিমের নিকট বিদায় লইয়া সৌজন্যের সঙ্গে অথচ দৃঢ়ভাবে সেলিমের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া মতিবিবি আগ্রা ত্যাগ করিল। পেষমন বাদশাহের আশ্রয় ত্যাগ করাকে কুপ্রবৃত্তি বলিয়াছে, কিন্তু পেষমন তো জানে না যে, পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছে। রূপগর্বিতা বিলাসিনীর স্নেহহীন হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে, চিত্তের এ দুর্দমনীয় বেগ মতিবিবি দমন করিতে পারিল না। ঐশ্বর্য ও রূপের মোহেই নবকুমার ধরা দিবে এই বিশ্বাস লইয়াই সে সপ্তগ্রামে বাসা বাঁধিয়াছিল, কিন্তু আগ্রার ঐশ্বর্য-আড়ম্বর সে সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিল। নবকুমার যে মতিবিবিকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে এ কল্পনা সে কখনও করে নাই, কিন্তু তাহার আকুল আত্মনিবেদন যখন রূঢ়-ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইল তখন ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত সে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল। দংশনের পাত্র এবার কপালকুণ্ডলা। কপালকুণ্ডলার রূপের মোহেই নবকুমার তাহার হইতেছে না। কিন্তু কপালকুণ্ডলার সঙ্গে পরিচয় হইবার পরই মতিবিবি বুঝিয়াছে কপালকুণ্ডলা প্রতিদ্বন্দ্বিনী নয়। কপালকুণ্ডলার প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া সে এই সন্ন্যাসিনী বালিকার উপর যে প্রতিহিংসা সাধন করিতে চাহিয়াছিল এই কথা মনে করিয়া অন্তরে ব্যথা বোধ করিয়াছে, অর্থ-ঐশ্বর্য দান করিয়া তাহাকে কাপালিকের ক্রূর চক্রান্তজাল হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছে।

তীক্ষ্ণ ও বহুমুখী বুদ্ধি, বিপদে নির্ভীকতা, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও পরিহাসনিপুণতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাহার ইন্দ্রিয়লোলুপতা ও ভোগাকাঙ্ক্ষা, অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা

ও আত্মগরিমা মতিবিবির চরিত্রে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। নবকুমারের প্রতি প্রেমের সঞ্চার তাহার প্রকৃতির সাময়িক পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল, কিন্তু আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতেই যে কেবল শিখিয়াছে সে আত্মবিসর্জন করিবে কি করিয়া? তাহার উদ্গীর্ণ বিষে সমস্তই দগ্ধ হইয়া গেল, তাহার দৈবাহত জীবন অভিশপ্ত হইয়াই রহিয়া গেল।

মোহিতলাল আরও গম্ভীরভাবে মতিবিবির চরিত্রের রহস্য আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"মতিবিবি চিরন্তনী নারী, পুরুষের ভোগ-সহচরী, তাহার সুখদুঃখবিধায়িনী, বাসনা-কামনাময়ী, মোহিনীনায়িকারূপিণী নারী। নারীর এই মূর্তিই শ্রেষ্ঠ কবিগণের কল্পনাকে যেমন উদ্বুদ্ধ, তেমনি মূর্ছিত করিয়াছে। এই নারী প্রকৃতির নিয়মে সর্বদেশে ও সর্বসমাজে মুকুলিত হয়; কিন্তু সর্বদা প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। কবিগণ কাব্যে নাটকে সেই অস্ফুট বা অর্ধস্ফুট মুকুলের পূর্ণস্ফুট রূপটিকে কল্পনাচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আমাদেরও চক্ষের অতি সম্মুখে স্থাপন করেন। যে কয়টি গুণ এইরূপ নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাহার প্রায় সবই মতিবিবির চরিত্রে আছে—কামনা-উদ্রেককারী রূপ, প্রখর বুদ্ধি সাহস বা প্রগল্ভতা এবং সুনিপুণ রসিকতা-শক্তি। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও মতিবিবির চরিত্র বড় অর্থাৎ মহনীয় নয়; কবি নিজেই বলিয়াছেন, তাহার সকলই আছে, নাই কেবল নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই হৃদয় বা প্রেম; তৎপরিবর্তে আছে এক দুর্দমনীয় ভোগ-লালসা। কিন্তু তাই বলিয়া মতিবিবি একজন সাধারণ নারীও নয়। সত্য বটে ঐ সকল গুণ একজন উচ্চ শ্রেণীর গণিকারও থাকিতে পারে। তথাপি মতিবিবি সেইরূপ সাধারণ নারীও নয়, নয় বলিয়াই সে এই উপন্যাসের খণ্ড আকাশে সচন্দ্র-তারকা বিভাবরীর মত উদয় হইয়াছে; শেষে অগ্নিময়ী উল্কার মত নিজে দগ্ধ হইয়া অতি তীব্র ও অশুভ আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়াছে। তাহার সেই প্রবল ভোগাসক্তির মধ্যেও দুইটি বিরোধী চরিত্রলক্ষণ ছিল—একটি তাহার অত্যুগ্র আত্মা-ভিমান, আর একটি তাহার স্বাভাবিক ঔদার্য। এই দুইটিই তাহার ভোগজীবনের বাধা হইয়া শেষে তাহার সর্বনাশ ঘটাইয়াছে। প্রথমটির জন্য সে আগ্রার বিলাস-জীবন ত্যাগ করিয়াছিল, অথচ নবকুমারকে বশ করিবার মত নম্রতা, বিনয় ও সহিষ্ণুতা তাহার ছিল না। দ্বিতীয়টির জন্য সে কাপালিকের সহিত ষড়যন্ত্রে সম্যক্ সম্মত হইতে পারে নাই; সেই দ্বিধা তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির কতখানি অন্তরায় হইয়াছিল তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। সে কপালকুণ্ডলার প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া

এমন কাজ করিল যাহাতে অবস্থা আরও দারুণ হইয়া উঠিল—শেষে সব গেল। এইজন্য মতিবিবির চরিত্রসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে নারীচরিত্রের জটিলতার গ্রন্থিমোচন করিতে হইয়াছে; কপালকুণ্ডলায় যেমন প্রকৃতিধ্যানমূলক ভাবকল্পনার কবিত্বই অধিক, এই চরিত্রে তেমনই নারীচরিত্রের রহস্যগভীর তলদেশে কবিকল্পনার স্বচ্ছন্দ প্রবেশ আছে।"

কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবি

তুলনামূলক আলোচনা

কপালকুণ্ডলার সঙ্গে মতিবিবির চরিত্রের তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। দুইজনেই নারী, কিন্তু যেন দুই বিপরীত দিগন্তে দুইজনের জন্ম। রূপবর্ণনায়, দুই একটি কথায় বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ের পার্থক্য স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। কপালকুণ্ডলার দৃষ্টি স্নিগ্ধ ও স্থির, বনদুহিতা ভ্রূবিলাস শিখে নাই, মতিবিবির আয়ত নয়নে সুখাবেশ, তাহার কটাক্ষ মর্মভেদী। কপালকুণ্ডলা গম্ভীর, এ গাম্ভীর্য সে পাইয়াছে অরণ্য ও সমুদ্রের নিকট হইতে আর রাজধানীর মুখরতা ও কর্মচাঞ্চল্য মতিবিবিকে করিয়া তুলিয়াছে চপল ও চঞ্চল। একজন নিরাভরণ দেহে ঘুরিয়া বেড়ায়, আর একজন সর্বাঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কার ধারণ করিয়াও তৃপ্তি পায় না। কপালকুণ্ডলা আত্মবিস্মৃতা, তাহার রূপ আছে কিনা, কাহাকেও আকর্ষণ করিবার মত ক্ষমতা আছে কিনা, সে জানে না; মতিবিবি পূর্ণমাত্রায় আত্মসচেতন, তাহার রূপ আছে, রূপের গর্ব আছে, রূপের ফাঁদে ফেলিয়া পুরুষকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা আছে ইহা সে জানে। কপালকুণ্ডলা ভাল করিয়া কথা বলিতে জানে না, মতিবিবির বাগ্‌বৈদগ্ধ্য অসাধারণ। মতিবিবি ষড়যন্ত্র করিতে জানে, কিন্তু নিজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র দেখিয়াও কপালকুণ্ডলা কিছুই বুঝিতে পারে না। কপালকুণ্ডলার সামাজিক অভিজ্ঞতা নাই, লোকচরিত্রের জ্ঞান নাই, মতিবিবির এ বিষয়ে অজানা কিছুই নাই। কপালকুণ্ডলার ধর্মসংস্কার অসাধারণ, মতিবিবি ধর্মাধর্মবিচারশূন্য। কপালকুণ্ডলা নিজের অনিষ্ট হইবে জানিয়াও কাপালিকের হাত হইতে নবকুমারকে রক্ষা করিতে দ্বিধা করে না, শ্যামাসুন্দরীর উপকারের জন্য ঔষধসংগ্রহে পশ্চাদ্‌পদ হয় না, আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়াও ব্যথিতকণ্ঠে নবকুমারকে সান্ত্বনা দেয়। মতিবিবি সেলিমের আশ্রয়ে থাকিয়া সেলিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে দ্বিধা করে না, নিজের সুখের জন্য নিরপরাধা বালিকাকে নির্বাসন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। মতিবিবির হৃদয় প্রেমশূন্য,

কপালকুণ্ডলার চরিত্রেও প্রণয়বৃত্তির অভাব। কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে আসক্তির অভাব তাহাকে সংসারে থাকিতে দিল না, আর মতিবিবির প্রেমহীন হৃদয়ে প্রেমের আকস্মিক আবির্ভাব এমন একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিল যে, সমস্ত দগ্ধ করিয়া সে নিজেও পুড়িয়া মরিল। কপালকুণ্ডলা বিজয়িনী, মরণেও নবকুমার কপালকুণ্ডলাকেই অনুসরণ করিলেন। মতিবিবি পরাজিত, অপরিসীম ব্যর্থতার বোঝা বহন করিয়াই সে বাঁচিয়া রহিল। ইহা কেবল নিয়তির পরিহাস নয়, বিষবৃক্ষে বিষফলই ফলিয়াছে।

মেহের-উন্নিসার চরিত্র

মাত্র একটি দৃশ্যে মেহের-উন্নিসার আবির্ভাব হইয়াছে এবং মতিবিবির প্রতিযোগিনীরূপে মেহের-উন্নিসাকে আঁকা হইয়াছে। কিন্তু স্বল্প পরিসরের মধ্যে মূল আখ্যায়িকার ঘটনাজাল হইতে বিচ্ছিন্ন এই চরিত্রটিকে দুই চারিটি রেখার টানে যেভাবে আঁকা হইয়াছে তাহাতে গ্রন্থকারের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মেহের-উন্নিসা ইতিহাসের প্রখ্যাত চরিত্র। ভারত-ইতিহাসের পাঠকগণের মধ্যে নূরজাহানের রূপগুণের কথা কে না জানে? সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র মেহের-উন্নিসার সৌন্দর্যের ও নানা গুণের বিস্তৃত বর্ণনা না করিয়া তাঁহার সংঘাতপীড়িত হৃদয়ের একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মেহের-উন্নিসা সেলিমকে ভুলিতে পারেন নাই, শের আফগানের পত্নী হইয়াও সেই প্রীতি তিনি সঙ্গোপনে অন্তরের মণিকোঠায় সমুজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মতিবিবির মত তিনি ধর্মাধর্মবোধশূন্য ছিলেন না; তাঁহার বিবেক ছিল, সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধ ছিল, দিল্লীর সিংহাসনের জন্য এমন কি যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার সলজ্জ মুগ্ধ দৃষ্টি ও বিকাশোন্মুখ হৃদয় যে শাহাজাদা সেলিমকে লইয়া ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা করিয়াছিল সেই সেলিমের জন্যও তিনি শের আফগানের পত্নীত্বের গর্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই আভিজাত্যবোধই মেহের-উন্নিসা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। রূপের প্রশংসা শুনিয়া 'কবরের মাটিতে এ মুখের আদর্শ থাকিবে' এই কথাটির মধ্য দিয়া তাঁহার মনের সম্পূর্ণ চিত্রই প্রকাশিত হইয়াছে। একটা গভীর দুঃখ বহন করিয়াই যে তিনি কাল কাটাইতেছেন, শের আফগানের পত্নী হইয়াও তিনি যে নিজেকে সার্থক মনে করিতেছেন না, এই উক্তি সেই কথাই, মনের সেই ক্ষোভের কথাই প্রমাণ করে। হৃদয়ের সঙ্গে বিবেকের এই যুদ্ধ তাঁহার মনে নিরন্তরই চলিতেছিল, মতিবিবির সহিত কথাবার্তায় সেলিমের প্রসঙ্গ উঠায় সমস্ত মন-প্রাণ তাঁহার দুলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সেলিমের সিংহাসন-

প্রাপ্তির সংবাদ অতর্কিত আঘাত দিয়া তাঁহার মনের কপাট খুলিয়া দিল, যে সংযম ও শালীনতাবোধ হৃদয়াবেগকে মাথা তুলিতে দেয় নাই, মুহূর্তের জন্য তাহা দূরে গেল, ব্যথিতকণ্ঠের একটি অস্ফুট আর্তনাদের মধ্য দিয়া হৃদয়ের সম্পূর্ণ ছবি প্রকাশ পাইল। মুহূর্তের দুর্বলতায় এই আত্মবিস্মৃতি মেহের-উন্নিসাকে বাল্যসখীর নিকট লজ্জিত ও বিড়ম্বিত করিয়াছিল; পরে অবশ্য তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিলেন। উপন্যাসকার কিন্তু এই মুহূর্তটির উপর আলো ফেলিয়া মেহের-উন্নিসার সমগ্র চরিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইতিহাসের পাঠকগণ জানেন, শের আফগানের হত্যার পর মেহের-উন্নিসা আগ্রার রাজপ্রাসাদে দীর্ঘকাল কঠোর বৈধব্যপালন করিয়া বাস করিতেছিলেন। হৃদয় ও বিবেক, মমতা ও কাঠিন্য, বুদ্ধি ও আভিজাত্যবোধ এই ঐতিহাসিক চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য—বঙ্কিমচন্দ্র একটিমাত্র দৃশ্যে তাহার চমৎকার আভাস দিয়াছেন।

'মেহের-উন্নিসা-চরিত্রের সহিত এই উপন্যাসের ঘটনাগত সম্পর্ক নাই, গ্রন্থকার একটি সুযোগ সৃষ্টিদ্বারা উপন্যাসের মধ্যে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধা নারীর একটু স্থান করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে এ কাহিনীর শোভাবৃদ্ধি পাইয়াছে।'

নবকুমারের চরিত্র

নবকুমার এই আখ্যায়িকার প্রধান পুরুষ, নায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম হইতেই নবকুমারকে নায়কোচিত গুণে বিভূষিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নবকুমার বিপদে নির্ভীক, উদার ও পরোপকারপরায়ণ। নবকুমার ভাবুক ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও কাব্যরসিক। নবকুমারের বিপদে নির্ভীকতা ও স্থৈর্য, তাঁহার নিসর্গপ্রীতি, পরোপকার-প্রবৃত্তি, তাঁহার চরিত্রবল যথার্থই নায়কোচিত। যে বালিকা তাঁহাকে কাপালিকের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল তাহার মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন দিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। নবকুমারের প্রকৃতির মধ্যেও একটা গাম্ভীর্য ছিল, দৃঢ়তা ছিল। কাপালিকের কবলে তিনি দুইবার পড়িয়াছিলেন, দুইবারই কপালকুণ্ডলা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, নবকুমার মরণেও তাই কপালকুণ্ডলাকেই অনুসরণ করিলেন, যে প্রাণ তিনি কপালকুণ্ডলার জন্য দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা একদিন সত্যই বিসর্জন দিলেন তাহার জন্য। কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ ছিলেন, কপালকুণ্ডলাকে সম্পূর্ণভাবে পাইবার জন্য তাঁহার চেষ্টা ও ধৈর্যেরও অন্ত ছিল না। পূর্ণ একবৎসর কাল তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করিয়াছেন, একটা মানসিক অপরিতৃপ্তি

সঙ্গোপনে তাঁহার হৃদয়ে একটা অশান্তি, একটা বিষ, কপালকুণ্ডলার চরিত্রসম্বন্ধে একটা সংশয়ের সৃষ্টি করিতেছিল। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় এই সংশয় এক অশুভ মুহূর্তে নিশ্চয়তায় পরিণত হইল। অন্তরের এই বিষে ও কাপালিকের সুরার প্রভাবে তাঁহার দেহ-মন জর্জরিত। কপালকুণ্ডলার শেষ দৃশ্যের ব্যবহারে তিনি সম্বিত ফিরিয়া পাইয়াছেন, কিন্তু তখন বিসর্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে। মতিবিবির সহিত ব্যবহারে আমরা নবকুমারের যে দৃঢ়তা ও আত্মপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করি, শেষ দৃশ্যে সুরাগরল-প্রজ্বলিত-হৃদয় পৌরুষহারা নবকুমারের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিকই দুঃখ হয়। "তুমি কি জানিবে, মৃন্ময়ি, তুমি ত কখনও রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই।" নবকুমারের এই স্পষ্ট উক্তি তাঁহার দুর্বলচিত্ততার রহস্য প্রকাশ করিতেছে। কপালকুণ্ডলার রূপের প্রতি এতটা প্রবল মোহই তাঁহাকে বিচারহীন করিয়াছে, ইহার জন্যই তিনি আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। ট্রাজেডির মূলে অদৃষ্টের খেলা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু চরিত্রের দুর্বলতা ও অপূর্ণতার প্রভাবও অনস্বীকার্য।

এইখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে নবকুমারের মত এত উদারহৃদয়, এত পরোপকারী ও এত পত্নীবৎসল চরিত্রবান যুবকের এতখানি অধঃপতন ঘটিল কেমন করিয়া? তাঁহার চরিত্রের কোন্ ছিদ্রপথে সর্বনাশ ঘনাইয়া আসিল? কোন্ রন্ধ্রে শনি প্রবেশ করিয়া তাঁহার জীবন নিষ্ফল করিয়া দিল? চরিত্রের যে দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার পরিচয় আমরা পদ্মাবতীপ্রসঙ্গ পর্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহার এমন অভাব ঘটিল কেন? যে মুহূর্তে নবকুমারের স্থির বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল, সেই মুহূর্তে তিনি এতখানি অপ্রকৃতিস্থ হইলেন কেমন করিয়া? মোহিতলাল চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"পুরুষ যতই মহৎ হউক, তাহার মনুষ্যসুলভ দুর্বলতা থাকিবেই—কোন না কোন রন্ধ্রে শনি প্রবেশ করিয়া তাহার সেই মহত্ত্বকে নিষ্ফল করিয়া দেয়। কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করার পর তাহার জীবনে যে নূতন একটি অবস্থার সূত্রপাত হইল—কপাল-কুণ্ডলার প্রতি তাহার সেই আকস্মিক ও অতি প্রবল অনুরাগই তাহার চরিত্রের মূলভিত্তি শিথিল করিয়া দিল। লেখক তাহার হৃদয়কে এই প্রেমের দ্বারা বিস্ফারিত করিতে চাহিয়াছেন—এ চরিত্রের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক বটে; প্রেম এমন পুরুষকে আরও নিঃস্বার্থ, আরও শক্তিমান করিবে—কিন্তু নবকুমারের প্রেম স্বাস্থ্য না হইয়া একটা ব্যাধিতে পরিণত হইল—একটা অস্বাভাবিক ক্ষুধার মত, রিপুর মত, তাহাকে

আত্মভ্রষ্ট করিল। সর্বশেষে সে নিজেও তাহা বুঝিয়াছে। প্রেমের পরিবর্তে রূপ-মোহকেই তাহার দুরবস্থার কারণ বলিয়া আত্মগ্লানি প্রকাশ করিয়াছে। এইরূপ হইবার কারণ কি? লেখক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরুত্তর। এ চরিত্রের এরূপ পরিবর্তন সহসা অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার কারণ অতিশয় স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিদৃষ্টি অভ্রান্তই আছে; তাঁহার সৃষ্টি-কল্পনা সৃষ্টিই করে এবং সে কল্পনা অব্যর্থ বলিয়া তিনি নিজে এই সকল গভীরতর কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। নবকুমারের এই অস্বাভাবিক চরিত্রভ্রংশ একটি অস্বাভাবিক কারণেই ঘটিয়াছে—সে কারণ কপালকুণ্ডলা, সে-ই সকল অস্বাভাবিকতার নিদান। কিন্তু ইহার একটা স্বাভাবিক কারণও নির্দেশ করা যায়। নবকুমারের সেই প্রথম বিবাহের পরিণাম এমনই লজ্জাজনক ও দুঃখকর হইয়াছিল—তাহার মত পুরুষের হৃদয়ে তাহাতে আত্মসম্মানে এমন আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাহার ফলে সে আর বিবাহ করে নাই; ইহা সেকালের পক্ষে একটু অসাধারণ। সম্ভবতঃ নারীর সহিত ঐ সম্পর্ক সে অতঃপর ভয় ও সন্দেহের চক্ষে দেখিত। কপালকুণ্ডলার প্রতি তাহার যে আকর্ষণ তাহার মধ্যেই এই সংস্কার জাগ্রত ছিল; তাহার অন্তরের অন্তরে যেন একটা ভয় ছিল যে, নারীসংস্পর্শ তাহার পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। পরে বিবাহবিমুখ নবকুমার কপালকুণ্ডলার অসাধারণ রূপ ও অদ্ভুত চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া এবং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার বশেও বিবাহ করিল। তখন এতদিনের নিরুদ্ধ অথচ সুস্থ ও স্বাভাবিক যৌন পিপাসা যেন প্রকৃতির প্রতিশোধের মত তাহাকে আক্রমণ ও অভিভূত করিল। তথাপি তাহার প্রথমা পত্নীর সেই স্মৃতি, সেই দাহচিহ্ন সে ভুলিতে পারে নাই। ফলে, সে এই স্ত্রীর সম্বন্ধেও সন্দেহকাতর হইয়া ওঠে, বাহিরেও যেমন সেই পদ্মাবতী তাহাকে এখনও অনুসরণ করিতেছে ভিতরেও সেই পত্নীর স্মৃতি তাহার প্রেমকে পঙ্গু করিয়া তাহার চরিত্রের এমন অবনতি ঘটাইয়াছে।"

কাপালিকের চরিত্র

কেবল কাহিনীর দিক্ দিয়া নয়, কপালকুণ্ডলার চরিত্রসৃষ্টির দিক্ দিয়াও কাপালিক চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে। 'কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ-সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান'। কপালকুণ্ডলার অনাসক্তি, প্রবল ভৈরবীভক্তি, অদ্ভুত ধর্মমোহ, অতি-সামান্য সাধারণ বিষয়ের মধ্যদিয়া দেবীর প্রত্যাদেশলাভ প্রভৃতি কপালকুণ্ডলার চরিত্রবৈশিষ্ট্য কাপালিক-সান্নিধ্যের ফল। আবার গল্পের দিক্ দিয়াও কাপালিক যেন

নিয়তির মূর্ত প্রকাশ ; গল্পের প্রারম্ভে ও শেষে অতি-প্রয়োজনীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া কাহিনীকে আকার দান করিয়াছে, উহার উপসংহার ত্বরান্বিত করিয়াছে।

কাপালিক তান্ত্রিক সাধক, তাহার সাধনার পদ্ধতি নির্মম ও বীভৎস, কিন্তু এ নির্মমতা তাহার সাধনারই অঙ্গ। নরমাংস ও নরশোণিতে সে দেবতার পূজা করে, কিন্তু ইহার জন্য তান্ত্রিকের প্রথাই দায়ী। এই নিষ্ঠুরতার অন্তরালে তাহার ঐহিক কোনও কামনা নাই, ভৈরবীর পূজা তাহার মোক্ষপ্রাপ্তির পথ, কাপালিক স্বধর্মে নিষ্ঠাবান্, স্বমতে বিশ্বাসী ও নিষ্ঠুর হইলেও ঘৃণার পাত্র নহে। নবকুমারের আকস্মিক উপস্থিতিতে সে ভৈরবীর ইঙ্গিত দেখিতে পায়, দেবীর তৃপ্তির জন্য মাংসপিণ্ড অর্পণ করিলে যে মনুষ্যজন্ম সার্থক হয় মনে-প্রাণে সে ইহা বিশ্বাস করে। অভীষ্টসাধনে সে নিঃসঙ্কোচ, কোনও ছলনা-প্রতারণা-নীচতা তাহার নাই। তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তি অসাধারণ সন্দেহ নাই। ভগ্নবাহু হইয়াও সে কপালকুণ্ডলার অনুসন্ধানে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত আসিয়াছে, নবকুমারকে উত্তেজিত করিয়া স্বকার্যসাধনে নিয়োজিত করিয়াছে। ইহার মূলে তাহার কোনও নীচতা নাই। তাহার ভৈরবীভক্তি, যে দেবীর সে আরাধনা করে সেই দেবীর প্রত্যাদেশই তাহাকে এ পথে অগ্রসর করিয়াছে। কাপালিকের স্বপ্ন যদি অন্যরূপ হইত, তবে কাপালিক সেই নির্দেশই মানিয়া লইত। কপালকুণ্ডলা যে অবিশ্বাসিনী নয়, মতিবিবি যে পুরুষ নয়, তাহা কাপালিক জানে না। সুতরাং কাপালিক যাহা করিয়াছে, তাহা সরল বিশ্বাসেই করিয়াছে, চক্রান্তকারীর হীনতা তাহার চরিত্রে নাই। কাপালিকের একমাত্র দুর্বলতা ইন্দ্রিয়লালসায় কপালকুণ্ডলার শোণিতে ভৈরবীর পূজা না করা—তাহার এই দুর্বলতার কথা সে অকপটে নবকুমারের নিকট ব্যক্ত করিয়াছে। শ্মশানভূমিতেও সে কপালকুণ্ডলাকে করুণার্দ্র মধুময় স্বরে 'বৎসে' বলিয়া আহ্বান করিয়াছে। তাহার হৃদয় ছিল কিন্তু তাহার নির্মম সাধনার ক্ষেত্রে হৃদয়ের কোন স্থান ছিল না। এই ভীষণ, বলিষ্ঠ নিষ্ঠুর কাপালিক আমাদের শ্রদ্ধাই আকর্ষণ করে, আমাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে না।

বঙ্কিমচন্দ্র কাপালিকের চরিত্রটি অতি সন্তর্পণে আঁকিয়াছেন। এই শ্রেণীর সর্বসংস্কার-মুক্তির তান্ত্রিক সাধনাকে বঙ্কিমের যুগে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন না—বঙ্কিমও দেখিতেন না। লোকালয়ের বাহিরে থাকিয়া শক্তিসঞ্চয়ের জন্য যাহারা নিভৃতে নানাউপায়ে শক্তি সাধনা করে তাহাদের আচার-আচরণের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল না, একথা সত্য হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র তন্ত্রসাধনার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন এবং নব্য শিক্ষিতগণের

মত তন্ত্রমতকে একেবারে 'নস্যাৎ' করিয়া দিতে চাহিতেন একথা সত্য নহে। তাঁহার অঙ্কিত কাপালিক-চরিত্র হইতে যদি কিছু বুঝা যায় তবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, বহু কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াও অত্যন্ত কঠোরভাবে আত্ম-নির্যাতন করিয়াও মানুষ শেষ পর্যন্ত তাহার প্রকৃতি ও স্বভাব, তাহার সংস্কার ও স্বধর্ম একেবারে নিঃশেষে হত্যা করিয়া ফেলিতে পারে না।

কাপালিক কপালকুণ্ডলার শোণিতে ভৈরবীর প্রীতি উৎপাদন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার অবচেতন মনে যে ইন্দ্রিয়লালসা ছিল তাহাই তাহার সাধনার পথে দুরতিক্রম্য বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নবকুমারের নিকট নিজের দোষ স্বীকার করিয়া কাপালিক তাহার চরিত্রের ঋজুতা রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে চরিত্রের দুর্বলতা হ্রাস পায় নাই। আজীবন নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার সাধনা করিয়া কাপালিক শ্মশানভূমিতে শেষমুহূর্তে কপালকুণ্ডলার প্রতি স্নেহ ও করুণার উচ্ছাস রোধ করিতে পারে নাই। কাপালিকের সান্নিধ্য ও প্রভাব কপালকুণ্ডলাকে আত্মজীবন সম্বন্ধে উদাসীন করিয়াছে, মনুষ্যদেহের পরিণাম যে কী তাহা সে কাপালিকের নিকট হইতে হৃদয় দিয়াই গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার শিক্ষা কপালকুণ্ডলার মূল নারীপ্রকৃতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য—পরদুঃখকাতরতা ও সহানুভূতি প্রভৃতির মূলোচ্ছেদ করিতে পারে নাই। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে কপালকুণ্ডলার নিকট কাপালিকের পরাজয়ই ঘটিয়াছে।

সাগরসৈকতের অরণ্যভূমি হইতে বহুপথ অতিক্রম করিয়া ভগ্নবাহু কাপালিক যেভাবে সপ্তগ্রামে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল এবং কপালকুণ্ডলার সর্বনাশ সাধনের জন্য যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল তাহা কাপালিক চরিত্রকে একেবারে সাধারণ ও অকিঞ্চিৎকর করিয়া তুলিয়াছিল সন্দেহ নাই। মুখের গ্রাস সরিয়া গেলে মাংসাশী জন্তু যেমন হিংস্র হইয়া উঠে কাপালিকের আচরণ অনেকটা সেইরূপ। তবে এখানেও ভবানীর সুস্পষ্ট প্রত্যাদেশের পটভূমিকায় কাপালিক চরিত্রকে বিচার করিলে তাহাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ সাধারণ একজন নীচ ব্যক্তি বলিয়া মনে করা যায় না।

অপ্রধান চরিত্র

অধিকারীও শক্তিসাধক, নির্জন ভবানী-মন্দিরের তিনি পূজারী। কিন্তু কাপালিকের মত তিনি সমাজ-সংস্কারমুক্ত নহেন। তিনি যে দেবীর পূজা করেন তাহাও

করালিনীর সংহার-মূর্তি নহে, অধিকারীর উপাস্য বিশ্বের পালনকর্ত্রী, বিশ্বমাতা। সমাজের সঙ্গে একদিন অধিকারীর যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ, সাংসারিক অভিজ্ঞতাও তাঁহার ছিল প্রচুর। নবকুমারের সহিত বিবাহের কথায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের বিবাহ দিয়া ও উভয়ের পলায়নে সাহায্য করিয়া তিনি আখ্যায়িকার মধ্যে একটা প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কপাল-কুণ্ডলা-চরিত্রে একটা আধ্যাত্মিকতা সঞ্চারিত করিয়া, একটি করুণ কোমল মাধুর্য বিস্তার করিয়া দিয়াছেন। পিতৃকল্প স্নেহশীল এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাহচর্য না পাইলে, কেবল কাপালিকের সান্নিধ্যে কপালকুণ্ডলার চরিত্র হয়তো অন্যভাবে গড়িয়া উঠিত।

সংসারত্যাগী এই বৃদ্ধটি কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের কবলমুক্ত করিয়া তাহার জীবনের এক সন্ধিক্ষণে কপালকুণ্ডলার জীবনের গতি পরিবর্তনে সাহায্য করিলেন। আমাদের কেবল আক্ষেপ হয় এই কথা ভাবিয়া যে, পরমহিতৈষী পিতৃকল্প এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার আর দেখা হইল না।

কপালকুণ্ডলার অসাধারণ চরিত্রের পাশে একটি সাধারণ নারীচরিত্র তাহার জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থান করিতেছে। শ্যামাসুন্দরী গৃহস্থ ঘরের বধূ কিন্তু সে বহুপত্নীক কুলীন স্বামীর স্ত্রী। তাহার স্নেহ-মায়া ভালবাসার শেষ নাই, কিন্তু স্বামীর স্নেহ-ভালবাসা-আদর-সোহাগ সে পায় নাই। কপালকুণ্ডলা অযাচিতভাবে স্বামীর ভালবাসা লাভ করিয়াও মনে মনে অসুখী আর শ্যামাসুন্দরী কিছু না পাইয়াও কেবল কোন কালে পাইবার আশায় সংসার আঁকড়াইয়া আছে। কপালকুণ্ডলার চরিত্রচিত্রকে ভালোভাবে ফুটাইবার জন্য শ্যামা-চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। শ্যামা একবৎসর ধরিয়া যোগিনীকে গৃহিণী করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কতকটা সফলও হইয়াছে। তাহার নিজের ভাগ্য মন্দ বলিয়া কপাপকুণ্ডলাকে সে কখনও ঈর্ষ্যা করে নাই ; নিজের ফুটিবার সময় চলিয়া গিয়াছে, তাই বলিয়া যাহার ফুটিবার ও সুগন্ধ বিলাইবার সময় আছে, সে কেন ফুটিবে না ? শেষের দিকে দেখি শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে বশ করিবার ঔষধসংগ্রহে যে স্বামিপ্রেম কি তাহাই বুঝে না তাহার সাহায্য লইতেছে। এই ঔষধসংগ্রহের ব্যাপারে কপালকুণ্ডলা রাত্রিতে বনে প্রবেশ করিল এবং সেখানে ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। কাহিনীর দিক্ দিয়াও শ্যামাসুন্দরী-চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

মোহিতলাল লিখিয়াছেন—"শ্যামাসুন্দরীও ঠিক এইরূপ একটি চরিত্র, কপাল-কুণ্ডলা চরিত্রকে তুলনায় উজ্জ্বলতর করিবার জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই

দুইটিকে একত্র স্থাপন করিয়া লেখক, সমাজ-সংস্কার ও প্রকৃতি এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব অতিশয় পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন—শ্যামসুন্দরীর পাশে না দেখিলে আমরা কপাল-কুণ্ডলাকে উত্তমরূপে চিনিতে পারিতাম না। আরও দুই কারণে শ্যামাসুন্দরীর চরিত্র উল্লেখযোগ্য ; প্রথমতঃ, বঙ্কিমচন্দ্র এই একটিমাত্র চরিত্রের দ্বারা এই উপন্যাসে একটু বাস্তব আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ; এমন সরলহৃদয় স্নেহকাতর খাঁটি বাঙালী নারী এ সমাজে এখনও সর্বত্র সুলভ ; দ্বিতীয়তঃ, শ্যামাসুন্দরীর সেই স্ত্রীজনসুলভ কুসংস্কার সেকালের পক্ষে যেমন আরও স্বাভাবিক হইয়াছে তেমনই উহার ফলে, উপন্যাসের ঘটনাধারা একটা অপ্রত্যাশিত গতিবেগ লাভ করিয়াছে—সে পক্ষে এই চরিত্র বড় কাছে আসিয়াছে।"

কপালকুণ্ডলার পাশে যেমন শ্যামাসুন্দরী, মতিবিবির পাশে তেমনি পেষমন। পেষমন-চরিত্র সৃষ্টি না করিলে মতিবিবির মনের কথা, তাহার চরিত্রের ক্রমিক পরিবর্তনের রহস্য জানিবার উপায় ছিল না। পূর্বেই বলা হইয়াছে কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টি উভয় দিয়াই প্রত্যেকটি চরিত্রের সার্থকতা আছে। অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর কোন চরিত্র কপালকুণ্ডলায় একেবারেই নাই। কাহিনীর সূত্র ধরিয়া যাহারা দুই একবারও দেখা দিয়াছে, নেপথ্য হইতে এক-আধবার উঁকি দিয়া যাহারা অদৃশ্য হইয়াছে তাহাদের নিখুঁত চিত্রও বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গেই তুলিয়া লইয়াছেন। সেই প্রাচীন-যাত্রী, যিনি তীর্থে আসিয়াও বিশ-পঁচিশ বিঘার কথা ভুলিতে পারেন নাই, যিনি গ্রামে ফিরিয়া নিজের সাহসের বড়াই করিয়াছিলেন এবং নবকুমার তত সাহসী ছিল না এইজন্য পলাইতে পারে নাই বলিয়া যিনি দুঃখ করিয়াছিলেন, তাঁহার চিত্রও দুই-একটি রেখার সাহায্যে একেবারে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব যে সমস্ত জিনিস আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, কপাল-কুণ্ডলায় তাহার কোনটিরই অভাব নাই।

বুদ্ধ পূর্ণিমা
১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩
প্রেসিডেন্সী কলেজ,
কলিকাতা

শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী

কপালকুণ্ডলা

প্রথম খণ্ড

——(০)——

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাগরসঙ্গমে

"Floating straight obedient to the stream."

—*Comedy of Errors*

প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্ত্তগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিঙ্ নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছু নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবা পুরুষ, এই দুইজন মাত্র জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথাবার্ত্তা স্থগিত করিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ কত দূর যেতে পারবি?" মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, "মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, "ব্যস্ত হব না? বল কি, বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সম্বৎসর খাবে কি?"

এ সংবাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে পরে পশ্চাদাগত অন্য যাত্রীর মুখে পাইয়াছিলেন। যুবা কহিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটীতে অভিভাবক আর কেহ নাই—মহাশয়ের আসা ভাল হয় নাই।"

প্রাচীন পূর্ব্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, “আসব না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম্ম করিব না ত কবে করিব?”

যুবা কহিলেন, “যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।”

বৃদ্ধ কহিলেন, “তবে তুমি এলে কেন?”

যুবা উত্তর করিলেন, “আমি ত আগেই বলিয়াছি যে সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।” পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, “আহা!—কি দেখিলাম! জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না।

“দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥”

বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না, নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহাই একতানমনা হইয়া শুনিতেছিলেন।

একজন নাবিক অপরকে কহিতেছিল, “ও ভাই—এত বড় কাজটা খারাবি হলো—এখন কি বারদরিয়ায় পড়লেম—কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝিতে পারি না।”

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর। বৃদ্ধ বুঝিলেন যে, কোন বিপদ্ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাঝি, কি হয়েছে?” মাঝি উত্তর করিল না কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে; আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল—কোন দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। বুঝিলেন, নাবিকদিগের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না।—পাছে বাহির-সমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে।

হিমনিবারণ জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু নব্য যাত্রী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে সবিশেষ কহিলেন; তখন নৌকামধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। যে কয়টি স্ত্রীলোক নৌকামধ্যে ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়াছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, প্রাচীন কহিল, “কেনারায় পড়! কেনারায় পড়! কেনারায় পড়!”

নব্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেনারা কোথা? তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ্ হইবে কেন?"

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। নব্য যাত্রী কোন মতে তাঁহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিককে কহিলেন, "আশঙ্কার বিষয় কিছু নাই, প্রভাত হইয়াছে—চার পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্য্যোদয় হইবে। চার পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক্; পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।"

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ। বেশী বাতাস নাই। স্থতরাং তাঁহারা, তরঙ্গান্দোলনকম্প বড় জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দবিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,—সেই কেবল কাঁদিল না।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমত সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচপীরের নাম কীর্ত্তিত করিয়া মহাকোলাহল করিয়া উঠিল। যাত্রীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি! কি! মাঝি, কি হইয়াছে?" মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, "রোদ উঠেছে! রোদ উঠেছে! ঐ দেখ ডাঙ্গা!" যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্যসহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া কোথায় আসিয়াছেন, কি বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সূর্য্য প্রকাশ হইয়াছে। কুজ্ঝটিকার অন্ধকাররাশি হইতে দিঙ্মণ্ডল একেবারে বিমুক্ত হইয়াছে। বেলা প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে। যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে, সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহানা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্ত্তী বটে,—এমন কি, পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত, কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর যে দিকই দেখা যায় অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালাপ্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগন সহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল, সচরাচর সকর্দ্দম নদীজলবর্ণ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ। আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন; তবে সৌভাগ্য এই যে, উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্য্যপ্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন,

সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌতপ্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ সৈকতভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে "রসুলপুরের নদী" নাম ধারণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপকূলে

"Ingratitude ! Thou marble-hearted fiend !—"

—*King Lear*

আরোহীদিগের স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক কথা সমাপ্ত হইলে, নাবিকেরা প্রস্তাব করিল যে, জোয়ারের আরও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে;—এই অবকাশে আরোহিগণ সম্মুখস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে পারিবেন। আরোহিবর্গও এই পরামর্শে সম্মতি দিলেন; তখন নাবিকেরা তরী তীরলগ্ন করিলে, আরোহিগণ অবতরণ করিয়া স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাদির পর পাকের উদ্যোগে আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল—নৌকায় পাকের কাষ্ঠ নাই। ব্যাঘ্রভয়ে উপর হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে, সকলের উপবাসের উপক্রম দেখিয়া প্রাচীন প্রাগুক্ত যুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপু নবকুমার! তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাই।"

নবকুমার কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, যাইব; কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া একজন আমার সঙ্গে আইস।"

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না।

"খাবারের সময় বুঝা যাবে" এই বলিয়া নবকুমার কোমর বাঁধিয়া একাকী কুঠারহস্তে কাষ্ঠাহরণে চলিলেন।

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই। কেবল বনমাত্র। কিন্তু সে বন, দীর্ঘ বৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে;—কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়াছে। নবকুমার তন্মধ্যে আহরণযোগ্য

কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধানে নদীতট হইতে অধিক দূরে গমন করিতে হইল। পরিশেষে ছেদনযোগ্য একটি বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন। কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল; নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ সকল কর্ম্মে অভ্যাস ছিল না; সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভার বহন বড় ক্লেশকর হইল। যাহাই হউক, যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে অল্পে ক্ষান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না। এজন্য তিনি কোন মতে কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর বহেন, পরে ক্ষণেক বসিয়া বিশ্রাম করেন, আবার বহেন; এইরূপে আসিতে লাগিলেন।

এই হেতুবশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সমভিব্যাহারিগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল; তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। সম্ভাব্যকাল অতীত হইলে এইরূপই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হইল। অথচ কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার সন্ধান করে।

নৌকারোহিগণ এইরূপে কল্পনা করিতেছিল; ইত্যবসরে জলরাশিমধ্যে ভৈরব কল্লোল উত্থিত হইল। নাবিকেরা বুঝিল যে,—জোয়ার আসিতেছে। নাবিকেরা বিশেষ জানিত যে, এসকল স্থানে জলোচ্ছ্বাসকালে তটদেশে এইরূপ প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত হয় যে, তখন নৌকাদি তীরবর্ত্তী থাকিলে, তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এজন্য তাহারা অতি ব্যস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদী-মধ্যবর্ত্তী হইতে লাগিল। নৌকা মুক্ত হইতে না হইতেই সম্মুখস্থ সৈকতভূমি জলপ্লাবিত হইয়া গেল, যাত্রিগণ কেবল ত্রস্তে নৌকায় উঠিতে অবকাশ পাইয়াছিল, তণ্ডুলাদি যাহা যাহা চরে স্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় ভাসিয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নাবিকেরা সুনিপুণ নহে; নৌকা সামলাইতে পারিল না; প্রবল জলপ্রবাহ বেগে তরণী রসুলপুর নদীর মধ্যে লইয়া চলিল। একজন আরোহী কহিল, "নবকুমার রহিল যে?" একজন নাবিক কহিল, "আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।"

জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে লইয়া যাইতেছে, প্রত্যাগমন করিতে বিস্তর ক্লেশ হইবে, এইজন্য নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন কি সেই মাঘমাসে তাহাদিগের ললাটে স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল; এইরূপ পরিশ্রমদ্বারা রসুলপুর নদীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু নৌকা যেমন বাহিরে আসিতে লাগিল, অমনি তথাকার প্রবলতর স্রোতে

উত্তরমুখী হইয়া তীরবৎ বেগে চলিল, নাবিকেরা তাহার তিলার্দ্ধমাত্র সংযম করিতে পারিল না ; নৌকা আর ফিরিল না।

যখন জলবেগ এমত মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়াছিলেন। এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইবে কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, নবকুমারের সহযাত্রীরা তাঁহার প্রতিবেশী মাত্র, কেহই আত্মবন্ধু নহে। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে প্রতিবর্ত্তন করা আর এক ভাঁটার কর্ম্ম। পরে রাত্রি আগত হইবে, আর রাত্রে নৌকা চালনা হইতে পারিবে না, অতএব পরদিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এ কাল পর্য্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে। দুই দিন নিরাহারে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। বিশেষ নাবিকেরা প্রতিগমন করিতে অসম্মত ; তাহারা কথার বাধ্য নহে। তাহারা বলিতেছে যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। তাহাই সম্ভব। তবে এত ক্লেশ-স্বীকার কি জন্য ?

এইরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জ্জিত হইলেন।

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাসনিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজনে

"—Like a veil,
Which if withdrawn, would but disclose the frown
Of one who hates us, so the night was shown
And grimly darkled o'er their faces pale
And hopeless eyes."

—*Don Juan.*

যে স্থানে নবকুমারকে ত্যাগ করিয়া যাত্রীরা চলিয়া যান, তাহার অনতিদূরে দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে দুই ক্ষুদ্র গ্রাম এক্ষণে দৃষ্ট হয়। পরন্তু যে সময়ের

বর্ণনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়ে তথায় মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন ছিল না; অরণ্যময় মাত্র। কিন্তু বাঙ্গলাদেশের অন্যত্র ভূমি যেরূপ সচরাচর অনুদ্ঘাতিনী, এ প্রদেশে সেরূপ নহে। রসুলপুরের মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত অবাধে কয়েক যোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক বালুকাস্তূপশ্রেণী বিরাজিত আছে। আর কিছু উচ্চ হইলে ঐ বালুকাস্তূপশ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী বলা যাইতে পারিত। এক্ষণে লোকে উহাকে বালিয়াড়ি বলে। ঐ সকল বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালা মধ্যাহ্নসূর্য্যকিরণে দূর হইতে অপূর্ব্ব প্রভাবিশিষ্ট দেখায়। উহার উপর উচ্চ বৃক্ষ জন্মে না। স্তূপতলে সামান্য ক্ষুদ্র বন জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যদেশে বা শিরোভাগে প্রায়ই ছায়াশূন্য ধবলশোভা বিরাজ করিতে থাকে। অধোভাগমণ্ডনকারী বৃক্ষাদির মধ্যে ঝাটি, বনঝাউ এবং বনপুষ্পই অধিক।

এইরূপ অপ্রফুল্লকর স্থানে নবকুমার সঙ্গিগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কাষ্ঠভার লইয়া নদীতীরে আসিয়া নৌকা দেখিলেন না; তখন তাঁহার অকস্মাৎ অত্যন্ত ভয়সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু সঙ্গিগণ যে তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এমত বোধ হইল না। বিবেচনা করিলেন, জলোচ্ছ্বাসে সৈকতভূমি প্লাবিত হওয়ায় তাঁহারা নিকটস্থ অন্য কোন স্থানে নৌকা রক্ষা করিয়াছেন, শীঘ্র তাঁহাকে সন্ধান করিয়া লইবেন, এই প্রত্যাশায় কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু নৌকা আসিল না, নৌকারোহীও কেহ দেখা দিল না। নবকুমার ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। আর প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া, নৌকার সন্ধানে নদীর তীরে তীরে ফিরিতে লাগিলেন। কোথাও নৌকার সন্ধান পাইলেন না, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিলেন। তখন পর্য্যন্ত নৌকা না দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, জোয়ারের বেগে নৌকা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এখন প্রতিকূল স্রোতে প্রত্যাগমন করিতে সঙ্গীদিগের কাজেকাজেই বিলম্ব হইতেছে। কিন্তু জোয়ারও শেষ হইল। তখন ভাবিলেন, প্রতিকূল স্রোতের বেগাধিক্যবশতঃ জোয়ারে নৌকা ফিরিয়া আসিতে পারে নাই; এক্ষণে ভাঁটায় অবশ্য ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভাঁটাও ক্রমে অধিক হইল, ক্রমে ক্রমে বেলাবসান হইয়া আসিল; সূর্য্যাস্ত হইল। যদি নৌকা ফিরিয়া আসিবার হইত তবে এতক্ষণ ফিরিয়া আসিত।

তখন নবকুমারের প্রতীতি হইল যে, হয় জলোচ্ছ্বাসসম্ভূত তরঙ্গে নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, নচেৎ সঙ্গিগণ তাঁহাকে এই বিজনে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

নবকুমার দেখিলেন যে, গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য্য নাই, পেয়

নাই; নদীর জল অসহ্য লবণাক্তক; অথচ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। দুরন্ত শীতনিবারণজন্য আশ্রয় নাই, গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। এই তুষার-শীতল বায়ু-সঞ্চারিত নদীতীরে, হিমবর্ষী আকাশতলে নিরাশ্রয়ে নিরাবরণে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবেক। রাত্রিমধ্যে ব্যাঘ্র-ভল্লুকের সাক্ষাৎ পাইবার সম্ভাবনা। প্রাণনাশই নিশ্চিত।

মনের চাঞ্চল্যহেতু নবকুমার একস্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তীর ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন;—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র সর্ব্বত্র নীরব, কেবল অবিরলকল্লোলিত সমুদ্র-গর্জ্জন, আর কদাচিৎ বন্যপশুর রব। তথাপি নবকুমার সেই অন্ধকারে, হিমবর্ষী আকাশতলে বালুকাস্তূপের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন উপত্যকায়, কখন অধিত্যকায়, কখন স্তূপতলে, কখন স্তূপশিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে প্রতিপদে হিংস্র পশুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু একস্থানে বসিয়া থাকিলেও সেই আশঙ্কা।

ভ্রমণ করিতে করিতে নবকুমারের শ্রম জন্মিল। সমস্ত দিন অনাহার; এ জন্য অধিক অবসন্ন হইলেন। একস্থানে বালিয়াড়ির পার্শ্বে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া বসিলেন। গৃহের সুখতপ্ত শয্যা মনে পড়িল। যখন শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের অবসাদে চিন্তা উপস্থিত হয়, তখন কখন কখন নিদ্রা আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়। নবকুমার চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইলেন। বোধ হয়, যদি এরূপ নিয়ম না থাকিত, তবে সাংসারিক ক্লেশের অপ্রতিহত বেগ সকলে সকল সময়ে সহ্য করিতে পারিত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্তূপশিখরে

"—সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি।"

—মেঘনাদবধ।

যখন নবকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন রজনী গভীরা। এখনও যে তাঁহাকে ব্যাঘ্রে হত্যা করে নাই, ইহা তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্র আসিতেছে কিনা। অকস্মাৎ সম্মুখে বহুদূরে, একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। পাছে ভ্রম জন্মিয়া থাকে, এজন্য নবকুমার মনোভিনিবেশ-পূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আলোকপরিধি ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন এবং উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল—আগ্নেয় আলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মাইল। প্রতীতিমাত্র নবকুমারের জীবন-আশা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। মনুষ্যসমাগম ব্যতীত এ আলোকের উৎপত্তি সম্ভবে না। কেন না, এ দাবানলের সময় নহে। নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন ; যথায় আলোক, সেইদিকে ধাবিত হইলেন। একবার মনে ভাবিলেন, "এ আলোক ভৌতিক ?—হইতেও পারে ; কিন্তু শঙ্কায় নিরস্ত থাকিলেই কোন্ জীবন রক্ষা হয় ?" এই ভাবিয়া নির্ভীকচিত্তে আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। বৃক্ষ, লতা, বালুকাস্তূপ পদে পদে তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল। বৃক্ষ, লতা দলিত করিয়া বালুকাস্তূপ লঙ্ঘিত করিয়া, নবকুমার চলিলেন। আলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, এক অত্যুচ্চ বালুকাস্তূপের শিরোভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে ; তৎপ্রভায় শিখরাসীন মনুষ্যমূর্ত্তি আকাশপটস্থ চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে। নবকুমার শিখরাসীন মনুষ্যের সমীপবর্ত্তী হইবেন, স্থিরসঙ্কল্প করিয়া, অশিথিলীকৃত বেগে চলিলেন। পরিশেষে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। তখন কিঞ্চিৎ শঙ্কা হইতে লাগিল—তথাপি অকম্পিতপদে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। আসীন ব্যক্তির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া যাহা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিষ্ঠিবেন কি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

শিখরাসীন মনুষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল—নবকুমারকে প্রথমে দেখিতে পাইল না। নবকুমার দেখিলেন তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। পরিধানে কোন কার্পাসবস্ত্র আছে কি না, তাহা লক্ষ্য হইল না ; কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দূলচর্ম্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা ; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটাপরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল—সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য

করিয়া নবকুমার সে স্থলে আসিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার একটা বিকট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন ; ইহার আসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভূত করিতে পারিলেন। জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে ; তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রবপদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে—এমন কি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমাল্যমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। নবকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। অগ্রসর হইবেন কি স্থানত্যাগ করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কাপালিকদিগের কথা শ্রুত ছিলেন। বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি কাপালিক।

যখন নবকুমার উপনীত হইয়াছিলেন, তখন কাপালিক মন্ত্রসাধনে বা জপে বা ধ্যানে মগ্ন ছিল, নবকুমারকে দেখিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কস্ত্বম্ ?"

নবকুমার কহিলেন, "ব্রাহ্মণ।"

কাপালিক কহিল, "তিষ্ঠ।" এই কহিয়া পূর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত হইল। নবকুমার দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এইরূপে প্রহরার্দ্ধ গত হইল। পরিশেষে কাপালিক গাত্রোত্থান করিয়া নবকুমারকে পূর্ব্ববৎ সংস্কৃতে কহিল, "মামনুসর।"

ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, অন্যসময়ে নবকুমার কদাপি ইহার সঙ্গী হইতেন না। কিন্তু এক্ষণে ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত। অতএব কহিলেন, "প্রভুর যেমত আজ্ঞা। কিন্তু আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড় কাতর। কোথায় গেলে আহার্য্যসামগ্রী পাইব, অনুমতি করুন।"

কাপালিক কহিল, "ভৈরবীপ্রেরিতোঽসি ; মামনুসর ; পরিতোষঃ তে ভবিষ্যতি।"

নবকুমার কাপালিকের অনুগামী হইলেন। উভয়ে অনেক পথ বাহিত করিলেন —পথিমধ্যে কেহ কোন কথা কহিল না। পরিশেষে এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইল— কাপালিক প্রথমে প্রবেশ করিয়া নবকুমারকে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিল এবং নবকুমারের অবোধগম্য কোন উপায়ে একখণ্ড কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিত করিল। নবকুমার তদালোকে দেখিলেন যে, ঐ কুটীর সর্ব্বাংশে কেয়াপাতায় রচিত। তন্মধ্যে কয়েকখানা ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে—এক কলস জল ও কিছু ফলমূল আছে।

কাপালিক অগ্নি জ্বালিত করিয়া কহিল, "ফলমূল যাহা আছে, আত্মসাৎ করিতে পার। পর্ণপাত্র রচনা করিয়া কলসজল পান করিও। ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে, অভিরুচি হইলে শয়ন করিও। নির্ব্বিঘ্নে তিষ্ঠ—ব্যাঘ্রের ভয় করিও না। সময়ান্তরে আমার

সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্য্যন্ত এ কুটীর ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া কাপালিক প্রস্থান করিল। নবকুমার সেই সামান্য ফলমূল আহার করিয়া এবং সেই ঈষত্তিক্ত জল পান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। পরে ব্যাঘ্রচর্ম্মে শয়ন করিলেন, সমস্ত দিবসজনিত ক্লেশহেতু শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমুদ্রতটে

"——যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্ব্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্॥"

—রঘুবংশ।

প্রাতে উঠিয়া নবকুমার সহজেই বাটীগমনের উপায় করিতে ব্যস্ত হইলেন, বিশেষ এ কাপালিক সান্নিধ্য কোনক্রমেই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু আপাততঃ এ পথহীন বনমধ্য হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইবেন? কি প্রকারেই বা পথ চিনিয়া বাটি যাইবেন? কাপালিক অবশ্য পথ জানে; জিজ্ঞাসিলে কি বলিয়া দিবে না? বিশেষ যতদূর দেখা গিয়াছে, ততদূর কাপালিক তাঁহার প্রতি কোন শঙ্কাসূচক আচরণ করে নাই—কেনই বা তবে তিনি ভীত হন? এদিকে কাপালিক তাঁহাকে পুনঃসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কুটীর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহার অবাধ্য হইলে বরং তাহার রোষোৎপত্তির সম্ভাবনা। নবকুমার শ্রুত ছিলেন যে, কাপালিকেরা মন্ত্রবলে অসাধ্য-সাধনে সক্ষম। এ কারণে তাহার অবাধ্য হওয়া অনুচিত। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নবকুমার আপাততঃ কুটীরমধ্যে অবস্থান করাই স্থির করিলেন।

কিন্তু ক্রমে বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, তথাপি কাপালিক প্রত্যাগমন করিল না। পূর্ব্বদিনের উপবাস, অদ্য এ পর্য্যন্ত অনশন, ইহাতে ক্ষুধা প্রবল হইয়া উঠিল। কুটীরমধ্যে যে অল্প পরিমাণ ফলমূল ছিল, তাহা পূর্ব্বরাত্রেই ভুক্ত হইয়াছিল—এক্ষণে কুটীর ত্যাগ করিয়া ফলমূলান্বেষণ না করিলে ক্ষুধায় প্রাণ যায়। অল্প বেলা থাকিতে ক্ষুধার পীড়নে নবকুমার ফলান্বেষণে বাহির হইলেন।

নবকুমার ফলান্বেষণে নিকটস্থ বালুকাস্তূপসকলের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে দুই একটা গাছ বালুকায় জন্মিয়া থাকে, তাহার ফলাস্বাদন করিয়া দেখিলেন যে, এক বৃক্ষের ফল বাদামের ন্যায় অতি সুস্বাদু; তদ্দ্বারা ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিলেন।

কথিত বালুকাস্তূপশ্রেণী প্রস্থে অতি অল্প, অতএব নবকুমার অল্পকাল ভ্রমণ করিয়া তাহা পার হইলেন। তৎপরে বালুকাবিহীন নিবিড় বনমধ্যে পড়িলেন। যাঁহারা ক্ষণকালজন্য অপূর্ব্বপরিচিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পথহীন বনমধ্যে ক্ষণমধ্যেই পথভ্রান্তি জন্মে। নবকুমারের তাহাই ঘটিল। কিছু দূর আসিয়া আশ্রম কোন্ পথে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন যে, এ সাগর-গর্জ্জন! ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, সম্মুখেই সমুদ্র! অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র! উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও এমন প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্‌জাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।

কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধিশোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তৎকালে তিনি পরিমাণ-বোধ-রহিত। পরে একেবারে প্রদোষ-তিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে, আশ্রম সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন কেন, তাহা বলিতে পারি না—তখন তাঁহার মনে কোন্ ভূতপূর্ব্ব সুখের উদয় হইতেছিল; তাহা কে বলিবে? গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদিবারিধি-তীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার—অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতে-ছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গভীর অথচ

জ্যোতির্ম্ময় ; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রিয়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল, স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য ; বাহুযুগলের বিমল শ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্ত্তিমধ্যে যে একটী মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল ; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।

নবকুমার অকস্মাৎ এইরূপ দুর্গমমধ্যে দৈবী মূর্ত্তি দেখিয়া নিস্পন্দশরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল ;—স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। রমণীও স্পন্দহীন, অনিমেষলোচনে বিশাল চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। উভয়মধ্যে প্রভেদ এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল।

অনন্তর সমুদ্রের জনহীন তীরে, এইরূপে বহুক্ষণ দুইজনে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?"

এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না, কিন্তু একটী শব্দে, একটী রমণীকণ্ঠসম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়। সকলই লয়বিশিষ্ট হয়। সংসারযাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীতপ্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। নবকুমারের কর্ণে সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল।

"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?" এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল ; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল ; বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল ; সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী ; রমণী সুন্দরী ; ধ্বনিও সুন্দর ; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় মিলিতে লাগিল।

রমণী কোন উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "আইস।" এই বলিয়া তরুণী চলিল, পদক্ষেপ লক্ষ্য হয় না। বসন্তকালে মন্দানিল-সঞ্চালিত শুভ্র মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে অলক্ষ্য পাদবিক্ষেপে চলিল ; নবকুমার কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে চলিলেন। এক

স্থানের একটা ক্ষুদ্র বন পরিবেষ্টন করিতে হইবে; বনের অন্তরালে গেলে, আর সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন না। বনবেষ্টনের পর দেখেন যে, সম্মুখে কুটীর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাপালিকসঙ্গে

"কথং নিগড়সংযতাসি। দ্রুতম্
নয়ামি ভবতীমিতঃ—"

—রত্নাবলী।

নবকুমার কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারসংযোজনপূর্ব্বক করতলে মস্তক দিয়া বসিলেন; শীঘ্র আর মস্তকোত্তলন করিলেন না।

"এ কি দেবী—মানুষী—না কাপালিকের মায়ামাত্র।" নবকুমার নিস্পন্দ হইয়া হৃদয়মধ্যে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অন্যমনস্ক ছিলেন বলিয়া, নবকুমার আর একটি ব্যাপার দেখিতে পান নাই। সেই কুটীরমধ্যে তাঁহার আগমনপূর্ব্বাবধি একখানি কাষ্ঠ জ্বলিতেছিল। পরে যখন অনেক রাত্রে স্মরণ হইল যে, সায়াহ্নকৃত্য অসমাপ্ত রহিয়াছে—তখন জলান্বেষণ অনুরোধে চিন্তা হইতে ক্ষান্ত হইয়া এ বিষয়ের অসম্ভাবিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। শুধু আলো নহে, তণ্ডুলাদি পাকোপযোগী কিছু কিছু সামগ্রীও আছে। নবকুমার বিস্মিত হইলেন না—মনে করিলেন যে, এও কাপালিকের কর্ম্ম—এস্থানে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে।

নবকুমার সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে তণ্ডুলগুলি কুটিরমধ্যে প্রাপ্ত এক মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিয়া আত্মসাৎ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে চর্ম্মশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই সমুদ্রতীরাভিমুখে চলিলেন। পূর্ব্বদিনের যাতায়াতের গুণে অদ্য অল্প কষ্টে পথ অনুভূত করিতে পারিলেন। তথায় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন? পূর্ব্বদৃষ্টা মায়াবিনী পুনর্ব্বার সে স্থলে যে আসিবেন—এমত আশা নবকুমারের হৃদয়ে কতদূর প্রবল হইয়াছিল, বলিতে পারি না—কিন্তু সেস্থান তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। অনেক বেলাতেও তথায় কেহ আসিল না। তখন নবকুমার সেস্থানের চারিদিকে ভ্রমিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বৃথা অন্বেষণ মাত্র। মনুষ্যসমাগমের চিহ্নমাত্র

দেখিতে পাইলেন না। পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া সেইস্থানে উপবেশন করিলেন। সূর্য্য অস্তগত হইল; অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল; নবকুমার হতাশ হইয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। সায়াহ্নকালে সমুদ্রতীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, কাপালিক কুটীর মধ্যে ধরাতলে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে আছে। নবকুমার প্রথমে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাতে কাপালিক কোন উত্তর করিল না।

নবকুমার কহিলেন, "এ পর্য্যন্ত প্রভুর দর্শনে কি জন্য বঞ্চিত ছিলাম?" কাপালিক কহিল, "নিজ ব্রতে নিযুক্ত ছিলাম।"

নবকুমার গৃহগমনাভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। কহিলেন, "পথ অবগত নহি—পাথেয় নাই। যদ্বিহিতবিধান প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেই হইতে পারিবে, এই ভরসায় আছি।"

কাপালিক কেবলমাত্র কহিল, "আমার সঙ্গে আগমন কর।" এই বলিয়া উদাসীন গাত্রোত্থান করিলেন। বাটী যাইবার কোন সদুপায় হইতে পারিবে, প্রত্যাশায় নবকুমারও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

তখন সন্ধ্যালোক অন্তর্হিত হয় নাই—কাপালিক অগ্রে অগ্রে, নবকুমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ নবকুমারের পৃষ্ঠদেশে কাহার কোমল করস্পর্শ হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্পন্দহীন হইলেন। সেই আগুল্‌ফলম্বিত নিবিড়কেশরাশি-ধারিণী বন্যদেবীমূর্ত্তি। পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দ, নিস্পন্দ। কোথা হইতে এ মূর্ত্তি অকস্মাৎ তাঁহার পশ্চাতে আসিল। নবকুমার দেখিলেন, রমণী মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া আছে। নবকুমার বুঝিলেন যে, রমণী বাক্যস্ফূর্ত্তি নিষেধ করিতেছে। নিষেধের বড় প্রয়োজনও ছিল না। নবকুমার কি কথা কহিবেন? তিনি তথায় চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। কাপালিক এ সকল কিছুই দেখিতে পাইল না, অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। তাঁহারা উদাসীনশ্রবণাতিক্রান্ত হইলে রমণী মৃদুস্বরে কি কথা কহিল। নবকুমারের কর্ণে এই শব্দ প্রবেশ করিল, "কোথা যাইতেছ? যাইও না। ফিরিয়া যাও—পলায়ন কর।"

এই কথা সমাপ্ত করিয়াই উক্তিকারিণী সরিয়া গেলেন, প্রত্যুত্তর শুনিবার জন্য তিষ্ঠিলেন না। নবকুমার কিয়ৎকাল অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইলেন, পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু রমণী কোন্ দিকে গেল, তাহার কিছুই স্থিরতা পাইলেন না। মনে করিতে লাগিলেন, "এ কাহার মায়া? না আমারই ভ্রম হইতেছে? যে কথা শুনিলাম—সে ত আশঙ্কাসূচক, কিন্তু কিসের আশঙ্কা? তান্ত্রিকেরা সকলই করিতে পারে। তবে কি পলাইব? পলাইব কেন?"

নবকুমার এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময় দেখিলেন, কাপালিক তাঁহাকে সঙ্গে না দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। কাপালিক কহিল, "বিলম্ব করিতেছ কেন?"

কাপালিক পুনরাহ্বান করাতে বিনা বাক্যব্যয়ে নবকুমার তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া সম্মুখে এক মৃৎপ্রাচীরবিশিষ্ট কুটীর দেখিতে পাইলেন। তাহাকে কুটীরও বলা যাইতে পারে, ক্ষুদ্র গৃহও বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। ইহার পশ্চাতেই সিকতাময় সমুদ্রতীর। গৃহপার্শ্ব দিয়া কাপালিক নবকুমারকে সেই সৈকতে লইয়া চলিলেন। এমত সময় তীরের তুল্য বেগে পূর্ব্বদৃষ্টা রমণী তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। গমনকালে তাঁহার কর্ণে বলিয়া গেল, "এখনও পালাও। নরমাংস নইলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না?"

নবকুমারের কপালে স্বেদনির্গম হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুবতীর এই কথা কাপালিকের কর্ণে গেল। সে কহিল, "কপালকুণ্ডলে!"

স্বর নবকুমারের কর্ণে মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইল। কিন্তু কপালকুণ্ডলা কোন উত্তর দিল না।

কাপালিক নবকুমারের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মানুষঘাতী করস্পর্শে নবকুমারের শোণিত ধমনীমধ্যে শতগুণ বেগে প্রধাবিত হইল—লুপ্ত সাহস পুনর্ব্বার আসিল। কহিলেন, "হস্ত ত্যাগ করুন।"

কাপালিক উত্তর করিল না। নবকুমার পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন?"

কাপালিক কহিল, "পূজার স্থানে।"

নবকুমার কহিলেন, "কেন?"

কাপালিক কহিল, "বধার্থ।"

অতিতীব্রবেগে নবকুমার নিজ হস্ত টানিলেন। যে বলে তিনি হস্ত আকর্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সামান্য লোকে তাঁহার হাত ধরিয়া থাকিলে, হস্ত রক্ষা করা দূরে থাকুক,—বেগে ভূপতিত হইত। কিন্তু কাপালিকের অঙ্গমাত্র হেলিল না; নবকুমারের প্রকোষ্ঠ তাহার হস্তমধ্যেই রহিল। নবকুমারের অস্থিগ্রন্থিসকল যেন ভগ্ন হইয়া গেল। নবকুমার দেখিলেন, বলে হইবে না। কৌশলের প্রয়োজন। "ভাল দেখা যাউক",—এইরূপ স্থির করিয়া নবকুমার কাপালিকের সঙ্গে চলিলেন।

সৈকতের মধ্যস্থানে নীত হইয়া নবকুমার দেখিলেন, পূর্ব্বদিনের ন্যায় তথায় বৃহৎ কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছে। চতুঃপার্শ্বে তান্ত্রিকপূজার আয়োজন রহিয়াছে, তন্মধ্যে নরকপালপূর্ণ আসব রহিয়াছে—কিন্তু শব নাই। অনুমান করিলেন, তাঁহাকে শব হইতে হইবে।

কতকগুলি শুষ্ক, কঠিন লতাগুল্ম তথায় পূর্ব্ব হইতে আহরিত ছিল। কাপালিক তদ্দ্বারা নবকুমারকে দৃঢ় বন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। নবকুমার সাধ্যমত বলপ্রকাশ করিলেন; কিন্তু বলপ্রকাশ কিছুমাত্র ফলদায়ক হইল না। তাঁহার প্রতীতি হইল যে, এ বয়সেও কাপালিক মত্তহস্তীর বল ধারণ করে। নবকুমারের বলপ্রকাশ দেখিয়া কাপালিক কহিল,

"মূর্খ! কি-জন্য বলপ্রকাশ কর? তোমার জন্ম আজি সার্থক হইল। ভৈরবীর পূজায় তোমার এই মাংসপিণ্ড অর্পিত হইবেক, ইহার অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?"

কাপালিক নবকুমারকে দৃঢ় বন্ধন করিয়া সৈকতোপরি ফেলিয়া রাখিলেন এবং বধের প্রাক্কালিক পূজাদি ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হইলেন। ততক্ষণ নবকুমার বাঁধন ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শুষ্ক লতা অতি কঠিন—বন্ধন অতিদৃঢ়। মৃত্যু আসন্ন! নবকুমার ইষ্টদেবচরণে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন। একবার জন্মভূমি মনে পড়িল, নিজ সুখের আলয় মনে পড়িল, একবার বহুদিন-অন্তর্হিত জনক এবং জননীর মুখ মনে পড়িল, দুই এক বিন্দু অশ্রুজল সৈকত-বালুকায় শুষিয়া গেল। কাপালিক বলির প্রাক্কালিক ক্রিয়া সমাপনান্তে বধার্থ খড়্গ লইবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল। কিন্তু যথায় খড়্গ রাখিয়াছিল, তথায় খড়্গ পাইল না। আশ্চর্য! কাপালিক কিছু বিস্মিত হইল। তাহার নিশ্চিত মনে হইতেছিল যে, অপরাহ্ণে খড়্গ আনিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছিল এবং স্থানান্তরও করে নাই, তবে খড়্গ কোথায় গেল? কাপালিক ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল। কোথাও পাইল না। তখন পূর্ব্বকথিত কুটীরাভিমুখ হইয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিল, কিন্তু পুনঃপুনঃ ডাকাতেও কপালকুণ্ডলা কোন উত্তর দিল না। তখন কাপালিকের চক্ষু লোহিত, ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত হইল। দ্রুতপদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিল; এই অবকাশে বন্ধনলতা ছিন্ন করিতে নবকুমার আর একবার যত্ন পাইলেন—কিন্তু সে যত্নও নিষ্ফল হইল।

এমত সময়ে নিকটে বালুকার উপর অতি কোমল পদধ্বনি হইল—এ পদধ্বনি কাপালিকের নহে। নবকুমার নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই মোহিনী—কপালকুণ্ডলা। তাহার করে খড়্গ দুলিতেছে।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "চুপ! কথা কহিও না—খড়্গ আমারই কাছে—চুরি করিয়া রাখিয়াছি।"

এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা অতি শীঘ্রহস্তে নবকুমারের লতাবন্ধন খড়্গদ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন। নিমেষের মধ্যে তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। কহিলেন, "পলায়ন কর; আমার পশ্চাৎ আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা তীরের ন্যায় বেগে পথ দেখাইয়া চলিলেন; নবকুমার লাফ দিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অন্বেষণে

"And the great lord of Luna
Fell at that deadly stroke;
As falls on mount Alvernus
A thunder-smitten oak."

Lays of Ancient Rome.

এদিকে কাপালিক গৃহমধ্যে তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া, না খড়্গ, না কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইয়া সন্দিগ্ধচিত্তে সৈকতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তথায় আসিয়া দেখিল যে, নবকুমার তথায় নাই। ইহাতে অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল। কিয়ৎ-ক্ষণ পরেই ছিন্ন লতাবন্ধনের উপর দৃষ্টি পড়িল। তখন স্বরূপ অনুভূত করিতে পারিয়া কাপালিক নবকুমারের অন্বেষণে ধাবিত হইল; কিন্তু বিজনমধ্যে পলাতকেরা কোন্ দিকে কোন্ পথে গিয়াছে, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। অন্ধকারবশতঃ কাহাকেও দৃষ্টিপথবর্ত্তী করিতে পারিল না। এজন্য বাক্যশব্দ লক্ষ্য করিয়া ক্ষণেক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সকল সময়ে কণ্ঠধ্বনিও শুনিতে পাওয়া গেল না। অতএব বিশেষ করিয়া চারিদিক্ পর্যবেক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে এক উচ্চ বালিয়াড়ির শিখরে উঠিল। কাপালিক এক পার্শ্ব দিয়া উঠিল; তাহার অন্যতম পার্শ্বে বর্ষার জল-প্রবাহে স্তূপমূল ক্ষয়িত হইয়াছিল, তাহা সে জানিত না; শিখরে আরোহণ করিবামাত্র কাপালিকের শরীরভরে সেই পতনোন্মুখ স্তূপশিখর ভগ্ন হইয়া অতি ঘোর রবে ভূপতিত হইল। পতনকালে পর্ব্বতশিখরচ্যুত মহিষের ন্যায় কাপালিকও তৎসঙ্গে পড়িয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আশ্রয়ে

"And that very night—
Shall Romeo bear thee to Mantua."

—*Romeo and Juliet.*

সেই অমাবস্যার ঘোরান্ধকার যামিনীতে দুইজনে ঊর্দ্ধশ্বাসে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বন্য পথ নবকুমারের অপরিজ্ঞাত ; কেবল সহচারিণী ষোড়শীকে লক্ষ্য করিয়া তদ্বর্ত্মসবর্ত্তী হওয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় নাই। মনে মনে ভাবিলেন, "এও কপালে ছিল!" নবকুমার জানিতেন না যে, বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত হয় না। জানিলে এ দুঃখ করিতেন না। ক্রমে তাঁহারা পাদক্ষেপ মন্দ করিয়া চলিতে লাগিলেন। অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না ; কেবল কখন কোথায় নক্ষত্রালোকে কোন বালুকাস্তূপের শুভ্র শিখর অস্পষ্ট দেখা যায়, কোথাও খদ্যোতমালাসংবৃত বৃক্ষের অবয়ব জ্ঞানগোচর হয়।

কপালকুণ্ডলা পথিককে সমভিব্যাহারে লইয়া নিভৃত কাননাভ্যন্তরে উপনীত হইলেন। তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। সম্মুখে অন্ধকারে বনমধ্যে এক অত্যুচ্চ দেবালয়-চূড়া লক্ষিত হইল ; তন্নিকটে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত একটী গৃহও দেখা গেল। কপালকুণ্ডলা প্রাচীরদ্বারের নিকটস্থ হইয়া তাহাতে করাঘাত করিতে লাগিলেন : পুনঃপুনঃ করাঘাত করাতে ভিতর হইতে এক ব্যক্তি কহিল, "কে ও, কপালকুণ্ডলা বুঝি ?" কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "দ্বার খোল।"

উত্তরকারী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। যে ব্যক্তি দ্বার খুলিয়া দিল সে ঐ দেবালয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার সেবক বা অধিকারী ; বয়সে পঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা তাঁহার বিরলকেশ মস্তক করদ্বারা আকর্ষিত করিয়া আপন অধরের নিকট তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় আনিলেন এবং দুই চারি কথায় নিজ সঙ্গীর অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। অধিকারী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত করতললগ্নশীর্ষ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কহিলেন, "এ বড় বিষম ব্যাপার। মহাপুরুষ মনে করিলে সকল করিতে পারেন। যাহা হউক, মায়ের প্রসাদে তোমার অমঙ্গল ঘটিবে না। সে ব্যক্তি কোথায় ?"

কপালকুণ্ডলা, "আইস" বলিয়া নবকুমারকে আহ্বান করিলেন। নবকুমার অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিলেন, আহূত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অধিকারী

তাঁহাকে কহিলেন, "আজি এখানে লুকাইয়া থাক, কালি প্রত্যুষে তোমাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।"

ক্রমে কথায় কথায় অধিকারী জানিতে পারিলেন যে, এ পর্য্যন্ত নবকুমারের আহারাদি হয় নাই। ইহাতে অধিকারী তাঁহার আহারের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নবকুমার আহারে নিতান্ত অস্বীকৃত হইয়া কেবলমাত্র বিশ্রামস্থানের প্রার্থনা জানাইলেন। অধিকারী নিজ রন্ধনশালায় নবকুমারের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নবকুমার শয়ন করিলে, কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। অধিকারী তাঁহার প্রতি সস্নেহ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "যাইও না। ক্ষণেক দাঁড়াও, এক ভিক্ষা আছে।"

কপালকুণ্ডলা। কি ?

অধিকারী। তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত মা বলিয়া থাকি, দেবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতে পারি যে, মাতার অধিক তোমাকে স্নেহ করি। আমার ভিক্ষা অবহেলা করিবে না ?

কপা। করিব না।

অধি। আমার এই ভিক্ষা তুমি আর সেখানে ফিরিয়া যাইও না।

কপা। কেন ?

অধি। গেলে তোমার রক্ষা নাই।

কপা। তাহা ত জানি।

অধি। তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন ?

কপা। না গিয়া কোথায় যাইব ?

অধি। এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও।

কপালকুণ্ডলা নীরব হইয়া রহিলেন। অধিকারী কহিলেন, "মা, তুমি কি ভাবিতেছ ?"

কপা। যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে যে, যুবতীর এরূপ যুবাপুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত ; এখন যাইতে বল কেন ?

অধি। তখন তোমার জীবনের আশঙ্কা করি নাই, বিশেষ যে সদুপায়ের সম্ভাবনা ছিল, এখন সে সদুপায় হইতে পারিবে। আইস মায়ের অনুমতি লইয়া আসি।

এই বলিয়া অধিকারী দীপহস্তে দেবালয়ের দ্বারে গিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। কপালকুণ্ডলাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। মন্দিরমধ্যে মানবাকারপরিমিতা করাল কালীমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। অধিকারী আচমন করিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটী অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র লইয়া মন্ত্রপূত করিলেন, এবং তাহা

প্রতিমার পাদোপরি সংস্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন,

মা দেখ, দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন; বিল্বপত্র পড়ে নাই, যে মানস করিয়া অর্ঘ্য দিয়াছিলাম, তাহাতে অবশ্য মঙ্গল। তুমি এই পথিকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে গমন কর; কিন্তু আমি বিষয়ী লোকের রীতিচরিত্র জানি। তুমি যদি গলগ্রহ হইয়া ইহার সঙ্গে যাও, তবে এ ব্যক্তি অপরিচিত যুবতী সঙ্গে লইয়া লোকালয়ে লজ্জা পাইবে। তোমাকেও লোকে ঘৃণা করিবে। তুমি বলিতেছ, এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণসন্তান; গলাতেও যজ্ঞোপবীত দেখিতেছি। এ যদি তোমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যায়, তবে সকল মঙ্গল। নচেৎ আমিও তোমাকে ইহার সহিত যাইতে বলিতে পারি না।"

"বি—বা—হ!" এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, "বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?"

অধিকারী ঈষন্মাত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, "বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান; এইজন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।"

অধিকারী মনে করিলেন, সকলই বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, সকলই বুঝিলেন। বলিলেন,

"তাহাই হউক! কিন্তু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন।"

অধি। কি জন্য প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা জান না।

এই বলিয়া অধিকারী তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ, তাহা অস্পষ্ট রকম কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; কপালকুণ্ডলা তাহা কিছু বুঝিল না, কিন্তু তাহার বড় ভয় হইল। বলিল, "তবে বিবাহই হউক।"

এই বলিয়া উভয়ে মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। এক কক্ষমধ্যে কপালকুণ্ডলাকে বসাইয়া, অধিকারী, নবকুমারের শয্যাসন্নিধানে গিয়া তাঁহার শিয়রে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! নিদ্রিত কি?"

নবকুমারের নিদ্রা যাইবার অবস্থা নহে, নিজ দশা ভাবিতেছিলেন। বলিলেন, "আজ্ঞে না।"

অধিকারী কহিলেন, "মহাশয়! পরিচয়টা লইতে একবার আসিলাম, আপনি ব্রাহ্মণ?"

নব। আজ্ঞা হাঁ।

অধি। কোন্ শ্রেণী?

নব। রাঢ়ীয় শ্রেণী।

অধি। আমরাও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ—উৎকল ব্রাহ্মণ বিবেচনা করিবেন না। বংশে কুলাচার্য্য, তবে এক্ষণে মায়ের পদাশ্রয়ে আছি। মহাশয়ের নাম?

নব। নবকুমার শর্ম্মা।

অধি। নিবাস?

নব। সপ্তগ্রাম।

অধি। আপনারা কোন্ গাঁই?

নব। বন্দ্যঘাটী।

অধি। কয় সংসার করিয়াছেন?

নব। এক সংসার মাত্র।

নবকুমার সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এক সংসারও ছিল না। তিনি রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর পদ্মাবতী কিছুদিন পিত্রালয়ে রহিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিতেন। যখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা সপরিবারে পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়াছিলেন। এই সময়ে পাঠানেরা আকবর শাহ্ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত হইয়া উড়িষ্যায় সদলে বসতি করিতেছিল। তাহাদিগের দমনের জন্য আকবর শাহ্ বিধিমতে যত্ন পাইতে লাগিলেন। যখন রামগোবিন্দ ঘোষাল উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমন করেন, তখন মোগল পাঠানের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আগমনকালে তিনি পথিমধ্যে পাঠানসেনার হস্তে পতিত হয়েন। পাঠানেরা তৎকালে ভদ্রাভদ্র বিচারশূন্য, তাহারা নিরপরাধী পথিকের প্রতি অর্থের জন্য বলপ্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। রামগোবিন্দ কিছু উগ্রস্বভাব; পাঠান-দিগকে কটু কহিতে লাগিলেন। ইহার ফল এই হইল যে, সপরিবারে অবরুদ্ধ হইলেন: পরিশেষে জাতীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সপরিবারে মুসলমান হইয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।

রামগোবিন্দ ঘোষাল সপরিবারে প্রাণ লইয়া বাটী আসিলেন বটে, কিন্তু মুসলমান বলিয়া আত্মীয়জনসমাজে এককালীন পরিত্যক্ত হইলেন। এ সময়ে নবকুমারের পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাকে সুতরাং জাতিভ্রষ্ট বৈবাহিকের সহিত জাতিভ্রষ্টা

পুত্রবধূকে ত্যাগ করিতে হইল। আর নবকুমারের সহিত তাঁহার স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইল না।

স্বজনত্যক্ত ও সমাজচ্যুত হইয়া রামগোবিন্দ ঘোষাল অধিক দিন স্বদেশে বাস করিতে পারিলেন না। এই কারণেও বটে, এবং রাজপ্রাসাদে উচ্চ পদস্থ হইবার আকাঙ্ক্ষায়ও বটে, তিনি সপরিবারে রাজধানী রাজমহলে গিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া তিনি সপরিবারে মহম্মদীয় নাম ধারণ করিয়াছিলেন। রাজমহলে যাওয়ার পরে শ্বশুরের বা বনিতার কি অবস্থা হইল, তাহা নবকুমারের জানিতে পারিবার কোন উপায় রহিল না এবং এ পর্য্যন্ত কখন কিছু জানিতেও পারিলেন না। নবকুমার বিরাগবশতঃ আর দারপরিগ্রহ করিলেন না। এইজন্য বলিতেছি, নবকুমারের "এক সংসারও নহে।"

অধিকারী এ সকল বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না। তিনি বিবেচনা করিলেন, 'কুলীনের সন্তানের দুই সংসারে আপত্তি কি?' প্রকাশ্যে কহিলেন, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম। এই যে কন্যা আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে—এ পরহিতার্থ আত্মপ্রাণ নষ্ট করিয়াছে। যে মহাপুরুষের আশ্রয়ে ইহার বাস, তিনি অতি ভয়ঙ্করস্বভাব। তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিলে আপনার যে দশা ঘটিতেছিল, ইহার সেই দশা ঘটিবে। ইহার কোন উপায় বিবেচনা করিতে পারেন কি না?"

নবকুমার উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "আমিও সেই আশঙ্কা করিতেছিলাম। আপনি সকল অবগত আছেন, ইহার উপায় করুন। আমার প্রাণদান করিলে যদি কোন প্রত্যুপকার হয়;—তবে তাহাতেও প্রস্তুত আছি। আমি এমন সঙ্কল্প করিতেছি যে, আমি সেই নরঘাতকের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া আত্মসমর্পণ করি। তাহা হইলে ইহার রক্ষা হইবে।" অধিকারী হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি বাতুল। ইহাতে কি ফল দর্শিবে? তোমারও প্রাণসংহার হইবে—অথচ ইহার প্রতি মহাপুরুষের ক্রোধোপশম হইবে না। ইহার একমাত্র উপায় আছে।"

নব। সে কি উপায়?

অধি। আপনার সহিত ইহার পলায়ন। কিন্তু সে অতি দুর্ঘট। আমার এখানে থাকিলে দুই একদিনের মধ্যে ধৃত হইবে। এ দেবালয়ে মহাপুরুষের সর্ব্বদা যাতায়াত। সুতরাং কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টে অশুভ দেখিতেছি।

নবকুমার আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সহিত পলায়ন দুর্ঘট কেন?"

অধি। এ কাহার কন্যা, কোন্ কুলে জন্ম, তাহা আপনি কিছুই জানেন না। কাহার পত্নী,—কি চরিত্রা, তাহা কিছুই জানেন না। আপনি ইহাকে কি সঙ্গিনী করিবেন? সঙ্গিনী করিয়া লইয়া গেলেও কি আপনি ইহাকে নিজগৃহে স্থান দিবেন? আর যদি স্থান না দেন, তবে এ অনাথা কোথায় যাইবে?

নবকুমার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার প্রাণরক্ষয়িত্রীর জন্য কোন কার্য্য আমার অসাধ্য নহে। ইনি আমার আত্মপরিবারস্থ হইয়া থাকিবেন।"

অধি। ভাল। কিন্তু যখন আপনার আত্মীয়স্বজন জিজ্ঞাসা করিবে যে, এ কাহার স্ত্রী, কি উত্তর দিবেন?

নবকুমার পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আপনিই ইহার পরিচয় আমাকে দিন। আমি সেই পরিচয় সকলকে দিব।"

অধি। ভাল। কিন্তু এই পক্ষান্তরের পথ যুবক-যুবতী অনন্যসহায় হইয়া কি প্রকারে যাইবে? লোকে দেখিয়া শুনিয়া কি বলিবে? আত্মীয়স্বজনের নিকট কি বুঝাইবে? আর আমিও এই কন্যাকে মা বলিয়াছি, আমিই বা কি প্রকারে ইহাকে অজ্ঞাতচরিত্র যুবার সহিত একাকী দূরদেশে পাঠাইয়া দিই?

ঘটকরাজ ঘটকালীতে মন্দ নহেন।

নবকুমার কহিলেন, "আপনি সঙ্গে আসুন।"

অধি। আমি সঙ্গে যাইব? ভবানীর পূজা কে করিবে?

নবকুমার ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "তবে কি কোন উপায় করিতে পারেন না?"

অধি। একমাত্র উপায় হইতে পারে—সে আপনার ঔদার্য্যগুণের অপেক্ষা করে।

নব। সে কি? আমি কিসে অস্বীকৃত? কি উপায় বলুন।

অধি। শুনুন। ইনি ব্রাহ্মণকন্যা। ইহার বৃত্তান্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্করকর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত তাহাদের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন। সে সকল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ ইহার নিকট আপনি সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। কাপালিক ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন। ইনি এ পর্য্যন্ত অনূঢ়া; ইহার চরিত্র পরম পবিত্র। আপনি ইঁহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ দিব।

নবকুমার শয্যা হইতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অতি দ্রুতপদবিক্ষেপে ইতস্ততঃ

ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোন উত্তর করিলেন না। অধিকারী কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "আপনি এক্ষণে নিদ্রা যান। কল্য প্রত্যূষে আপনাকে আমি জাগরিত করিব। ইচ্ছা হয়, একাকী যাইবেন। আপনাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।"

এই বলিয়া অধিকারী বিদায় হইলেন ; গমনকালে মনে মনে কহিলেন, 'রাঢ়দেশের ঘটকালী কি ভুলিয়া গিয়াছি না কি ?'

নবম পরিচ্ছেদ

দেবনিকেতন

"কণ্ব। অলং রুদিতেন ; স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়।"

—শকুন্তলা।

প্রাতে অধিকারী নবকুমারের নিকট আসিলেন। দেখিলেন, এখনও নবকুমার শয়ন করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি কর্ত্তব্য ?"

নবকুমার কহিলেন, "আজি হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্ম্মপত্নী ; ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব। কে কন্যা সম্প্রদান করিবে ?"

ঘটকচূড়ামণির মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "এত দিনে জগদম্বার কৃপায় আমার কপালিনীর বুঝি গতি হইল।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমি সম্প্রদান করিব।" অধিকারী নিজ শয়নকক্ষমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। একটি খুঙ্গীর মধ্যে কয়েকখণ্ড অতি জীর্ণ তালপত্র ছিল ; তাহাতে তাঁহার তিথিনক্ষত্রাদি নির্দ্দিষ্ট থাকিত। তৎসমুদয় সবিশেষ সমালোচনা করিয়া আসিয়া কহিলেন, "আজি যদিও বৈবাহিক দিন নহে—তথাচ বিবাহে কোন বিঘ্ন নাই। গোধূলিলগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিব। তুমি অদ্য উপবাস করিয়া থাকিবে মাত্র, কৌলিক আচরণ সকল বাটী গিয়া করাইও। একদিনের জন্য তোমাদিগকে লুকাইয়া রাখিতে পারি, এমন স্থান আছে। আজি যদি তিনি আসেন, তবে তোমাদিগের সন্ধান পাইবেন না। পরে বিবাহান্তে কালি প্রাতে সপত্নীক বাটী যাইও।"

নবকুমার ইহাতে সম্মত হইলেন ; এ অবস্থায় যতদূর সম্ভবে ততদূর যথাশাস্ত্র

কার্য্য হইল। গোধূলিলগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিকপালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।

কাপালিকের কোন সংবাদ নাই। পরদিন প্রত্যূষে তিনজনে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অধিকারী মেদিনীপুরের পথ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে রাখিয়া আসিবেন।

যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা কালী-প্রণামার্থ গেলেন। ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, পুষ্পপাত্র হইতে একটী অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি পড়িয়া গেল।

কপালকুণ্ডলা নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা। বিল্বদল প্রতিমাচরণচ্যুত হইল দেখিয়া ভীত হইলেন ;—এবং অধিকারীকে সংবাদ দিলেন। অধিকারী ও বিষণ্ণ হইলেন ; কহিলেন, "এখন নিরুপায়। এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। অতএব নিঃশব্দে চল।"

সকলে নিঃশব্দে চলিলেন। অনেক বেলা হইলে মেদিনীপুরের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অধিকারী বিদায় হইলেন। কপালকুণ্ডলা কাঁদিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে যে জন তাঁহার একমাত্র সুহৃদ, সে বিদায় হইতেছে।

অধিকারীও কাঁদিতে লাগিলেন। চক্ষের জল মুছাইয়া কপালকুণ্ডলার কানে কানে কহিলেন, "মা! তুই জানিস্ পরমেশ্বরীর প্রসাদে তোর সন্তানের অর্থের অভাব নাই। হিজলীর ছোট বড় সকলেই তাঁহার পূজা দেয়। তোর কাপড়ে যাহা বাঁধিয়া দিয়াছি, তাহা তোর স্বামীর নিকট দিয়া তোকে পাল্কী করিয়া দিতে বলিস্। সন্তান বলিয়া মনে করিস্।"

অধিকারী এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেলেন। কপালকুণ্ডলাও কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

——:o:——

প্রথম পরিচ্ছেদ

"—There—now lean on me
Place your foot here—"
—*Manfred.*

নবকুমার মেদিনীপুরে আসিয়া অধিকারী প্রদত্ত ধনবলে কপালকুণ্ডলার জন্য একজন দাসী, একজন রক্ষক ও শিবিকাবাহক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শিবিকা-রোহণে পাঠাইলেন। অর্থের অপ্রাচুর্য্যহেতু স্বয়ং পদব্রজে চলিলেন। নবকুমার পূর্ব্বদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন, মধ্যাহ্নভোজনের পর বাহকেরা তাঁহাকে অনেক পশ্চাৎ করিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। শীতকালের অনিবিড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যাও অতীত হইল। পৃথিবী অন্ধকারময়ী হইল। অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। নবকুমার কপালকুণ্ডলার সহিত একত্র হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মনে মনে স্থির জ্ঞান ছিল যে, প্রথম সরাইতে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন, কিন্তু সরাইও আপাততঃ দেখা যায় না। প্রায় রাত্রি চারি ছয় দণ্ড হইল। নবকুমার দ্রুতপাদবিক্ষেপ করিতে করিতে চলিলেন। অকস্মাৎ কোন কঠিন দ্রব্যে তাঁহার চরণ-স্পর্শ হইল। পদভরে সে বস্তু খড়্ খড়্ মড়্ মড়্ শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। নবকুমার দাঁড়াইলেন; পুনর্ব্বার পদচালনা করিলেন; পুনর্ব্বার ঐরূপ হইল। পদ-স্পৃষ্ট বস্তু হস্তে করিয়া তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন ঐ বস্তু তক্তাভাঙ্গার মত।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলেও সচরাচর এমন অন্ধকার হয় না যে, অনাবৃত স্থানে স্থূল বস্তুর অবয়ব লক্ষ্য হয় না। সম্মুখে একটি বৃহৎ বস্তু পড়িয়াছিল; নবকুমার অনুভব করিয়া দেখিলেন যে, সে ভগ্ন শিবিকা; অমনি তাঁহার হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার বিপদ্ আশঙ্কা হইল। শিবিকার দিকে যাইতে আবার ভিন্নপ্রকার পদার্থে তাঁহার পাদস্পর্শ হইল। এ স্পর্শ কোমল মনুষ্যশরীরস্পর্শের ন্যায় বোধ হইল। বসিয়া হাত বুলাইয়া দেখিলেন, মনুষ্যশরীর বটে। স্পর্শ অত্যন্ত শীতল, তৎসঙ্গে দ্রবপদার্থের স্পর্শ অনুভূত হইল। নাড়ীতে হাত দিয়া দেখিলেন, স্পন্দন নাই, প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া দেখিলেন, যেন নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। নিঃশ্বাস আছে, তবে নাড়ী নাই কেন? এ কি রোগী? নাসিকার নিকট হাত দিয়া দেখিলেন নিঃশ্বাস বহিতেছে না। তবে শব্দ কেন? হয় ত কোন জীবিত

ব্যক্তিও এখানে আছে, এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কেহ জীবিত ব্যক্তি আছে ?"

মৃদুস্বরে এক উত্তর হইল, "আছি।"

নবকুমার কহিলেন, "কে তুমি ?"

উত্তর হইল, "তুমি কে ?" নবকুমারের কর্ণে স্বর স্ত্রীকণ্ঠজাত বোধ হইল। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কপালকুণ্ডলা না কি ?"

স্ত্রীলোক কহিল, "কপালকুণ্ডলা কে, তা জানি না—আমি পথিক, আপাততঃ দস্যুহস্তে নিষ্কুণ্ডলা হইয়াছি।"

ব্যঙ্গ শুনিয়া নবকুমার ঈষৎ প্রসন্ন হইলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "কি হইয়াছে ?"

উত্তরকারিণী কহিলেন, "দস্যুতে আমার পাল্কী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, আমার একজন বাহককে মারিয়া ফেলিয়াছে, আর সকলে পলাইয়া গিয়াছে। দস্যুরা আমার অঙ্গের অলঙ্কার সকল লইয়া আমাকে পাল্কীতে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

নবকুমার অন্ধকারে অনুধাবন করিয়া দেখিলেন, যথার্থই একটি স্ত্রীলোক শিবিকাতে বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়তর বন্ধনযুক্ত আছে। নবকুমার শীঘ্রহস্তে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া কহিলেন, "তুমি উঠিতে পারিবে কি ?" স্ত্রীলোক কহিল, "আমাকেও এক ঘা লাঠি লাগিয়াছিল, এজন্য পায়ে বেদনা আছে, কিন্তু বোধ হয় অল্প সাহায্য করিলে উঠিতে পারিব।"

নবকুমার হস্ত বাড়াইয়া দিলেন। রমণী তৎসাহায্যে গাত্রোত্থান করিলেন। নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "চলিতে পারিবে কি ?"

স্ত্রীলোক উত্তর না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পশ্চাতে কেহ পথিক আসিতেছে দেখিয়াছেন ?"

নবকুমার কহিলেন, "না।"

স্ত্রীলোক পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "চটি কত দূর ?"

নবকুমার কহিলেন, "কত দূর বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয় নিকটে।"

স্ত্রীলোক কহিল, "অন্ধকারে একাকিনী মাঠে বসিয়া কি করিব, আপনার সঙ্গে চটি পর্য্যন্ত যাওয়াই উচিত। বোধ হয় কোন কিছুর উপর ভর করিতে পারিলে চলিতে পারিব।"

নবকুমার কহিলেন, "বিপৎকালে সঙ্কোচ মূঢ়ের কাজ। আমার কাঁধে ভর করিয়া চল।"

স্ত্রীলোকটি মূঢ়ের কার্য্য করিল না। নবকুমারের স্কন্ধেই ভর করিয়া চলিল।

যথার্থ চটি নিকটে ছিল। এ সকল কালে চটির নিকটেও দুষ্ক্রিয়া করিতে দস্যুরা সঙ্কোচ করিত না। অনধিক বিলম্বে নবকুমার সমভিব্যাহারিণীকে লইয়া তথায় উপনীত হইলেন।

নবকুমার দেখিলেন যে, ঐ চটিতেই কপালকুণ্ডলা অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার দাসদাসী তজ্জন্য একখানা ঘর নিযুক্ত করিয়াছিল। নবকুমার স্বীয় সঙ্গিনীর জন্য তৎপার্শ্ববর্ত্তী একখানা ঘর নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তাঁহার আজ্ঞামত গৃহস্বামীর বনিতা প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল। যখন দীপরশ্মিস্রোতঃ তাঁহার সঙ্গিনীর শরীরে পড়িল, তখন নবকুমার দেখিলেন যে, ইনি অসামান্যা সুন্দরী। রূপরাশিতরঙ্গে তাঁহার যৌবনশোভা শ্রাবণের নদীর ন্যায় উছলিয়া পড়িতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পান্থনিবাসে

"কৈষা যোষিৎ প্রকৃতিচপলা।"

—উদ্ধবদূত।

যদি এই রমণী নির্দ্দোষসৌন্দর্য্যবিশিষ্টা হইতেন, তবে বলিতাম, পুরুষ পাঠক! ইনি আপনার গৃহিণীর ন্যায় সুন্দরী। আর সুন্দরী পাঠকারিণি! ইনি আপনার দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায় রূপবতী। তাহা হইলে রূপবর্ণনার একশেষ হইত। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নহেন; সুতরাং নিরস্ত হইতে হইল।

ইনি যে নির্দ্দোষসুন্দরী নহেন, তাহা বলিবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ ইঁহার শরীর মধ্যমাকৃতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ; দ্বিতীয়তঃ অধরোষ্ঠ কিছু চাপা; তৃতীয়তঃ প্রকৃত পক্ষে ইনি গৌরাঙ্গী নহেন।

শরীর ঈষদ্দীর্ঘ বটে, কিন্তু হস্তপদহৃদয়াদি সর্ব্বাঙ্গ সুগোল, সম্পূর্ণীভূত। বর্ষাকালে বিটপিলতা যেমন আপন পত্ররাশির বাহুল্যে দলমল করে, ইহার শরীর তেমনই আপন পূর্ণতায় দলমল করিতেছিল; সুতরাং ঈষদ্দীর্ঘ দেহও পূর্ণতাহেতু অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গী বলি, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও বর্ণ পূর্ণচন্দ্রকৌমুদীর ন্যায়, কাহারও কাহারও ঈষদারক্তবদনা উষার ন্যায়। ইঁহার বর্ণ এতদুভয়বর্জ্জিত; সুতরাং ইঁহাকে প্রকৃত গৌরাঙ্গী বলিলাম না বটে, কিন্তু মুগ্ধকরী শক্তিতে ইহার বর্ণও ন্যূন নহে। ইনি শ্যামবর্ণা। "শ্যামা মা" বা "শ্যামসুন্দর" যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ নহে, তপ্তকাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ এ সেই শ্যাম। পূর্ণচন্দ্রকরলেখা, অথবা হেমাম্বুদকিরীটিনী উষা যদি গৌরাঙ্গীদিগের

বর্ণপ্রতিমা হয়, তবে বসন্তপ্রসূত নবচূতদলরাজির শোভা এই শ্যামার বর্ণের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে গৌরাঙ্গী বর্ণের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, কিন্তু যদি কেহ এরূপ শ্যামার মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েন তবে তাঁহাকে বর্ণজ্ঞানশূন্য বলিতে পারিব না। এ কথায় যাঁহার বিরক্তি জন্মে, তিনি একবার নবচূতপল্লববিরাজী ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় সেই উজ্জ্বলশ্যামললাটবিলম্বী অলকাবলী মনে করুন। সেই সপ্তমীচন্দ্রাকৃতিললাটতলস্থ অলকস্পর্শী ভ্রূযুগ মনে করুন; সেই পক্কচূতোজ্জ্বল কপোলদেশ মনে করুন; তন্মধ্যবর্তী ঘোরারক্ত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর মনে করুন; তাহা হইলে এই অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরীপ্রধানা বলিয়া অনুভূত হইবে। চক্ষু দুইটি অতি বিশাল নহে, কিন্তু সুবঙ্কিম পল্লবরেখাবিশিষ্ট—আর অতিশয় উজ্জ্বল। তাঁহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্ম্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ অনুভূত কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মন পর্য্যন্ত দেখিতেছে; দেখিতে দেখিতে সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয়; চক্ষু সুকোমল স্নেহময় রসে গলিয়া যায়। আবার কখন বা তাহাতে কেবল সুখাবেশজনিত ক্লান্তিপ্রকাশমাত্র, যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখন বা লালসাবিস্ফারিত মদনরসে টলটলায়মান। আবার কখন লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ—যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্দাম। মুখকান্তিমধ্যে দুইটি অনির্ব্বচনীয় শোভা; প্রথম সর্ব্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় আত্মগরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত, তিনি রমণীকুলরাজ্ঞী।

সুন্দরীর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর—ভাদ্র মাসের ভরা নদী। ভাদ্র মাসের নদী-জলের ন্যায় ইহার রূপরাশি টলটল করিতেছিল—উছলিয়া পড়িতেছিল। বর্ণাপেক্ষা, নয়নাপেক্ষা, সর্ব্বাপেক্ষা সেই সৌন্দর্য্যের পারিপ্লব মুগ্ধকর। পূর্ণযৌবনভরে সর্ব্বশরীর সতত ঈষচ্চঞ্চল; বিনা বায়ুতে শরতের নদী যেমন ঈষচ্চঞ্চল, তেমনি চঞ্চল; সে চাঞ্চল্য মুহুর্ম্মুহুঃ নূতন নূতন শোভা বিকাশের কারণ। নবকুমার নিমেষশূন্যচক্ষে সেই নূতন নূতন শোভা দেখিতেছিলেন।

সুন্দরী নবকুমারের চক্ষু নিমেষশূন্য দেখিয়া কহিলেন, "আপনি কি দেখিতেছেন? আমার রূপ?"

নবকুমার ভদ্রলোক; অপ্রতিভ হইয়া মুখাবনত করিলেন। নবকুমারকে নিরুত্তর দেখিয়া অপরিচিতা পুনরপি হাসিয়া কহিলেন, "আপনি কখনও কি স্ত্রীলোক দেখেন নাই, না আপনি আমাকে বড় সুন্দরী মনে করিতেছেন?"

সহজে এ কথা কহিলে তিরস্কারস্বরূপ বোধ হইত, কিন্তু রমণী যে হাসির সহিত

বলিলেন, তাহাতে ব্যঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইল না। নবকুমার দেখিলেন, এ অতি মুখরা; মুখরার কথায় কেন না উত্তর করিবেন? কহিলেন, "আমি স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই।"

রমণী সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটীও না?"

নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার রূপ জাগিতেছিল; তিনিও সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "একটীও না, এমত বলিতে পারি না।"

উত্তরকারিণী কহিলেন, "তবুও ভাল। সেটি কি আপনার গৃহিণী?"

নব। কেন? গৃহিণী কেন মনে ভাবিতেছ?

স্ত্রী। বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে।

নব। আমি বাঙ্গালী; আপনিও ত বাঙ্গালীর ন্যায় কথা কহিতেছেন। আপনি তবে কোন্ দেশীয়?

যুবতী আপন পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "অভাগিনী বাঙ্গালী নহে; পশ্চিমপ্রদেশীয়া মুসলমানী।" নবকুমার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, পরিচ্ছদ পশ্চিমপ্রদেশীয়া মুসলমানীর ন্যায় বটে, কিন্তু বাঙ্গালা ত ঠিক বাঙ্গালীর মতই বলিতেছে। ক্ষণপরে তরুণী বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়! বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে আমার পরিচয় লইলেন—আপন পরিচয় দিয়া চরিতার্থ করুন। যে গৃহে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী গৃহিণী, সে গৃহিণী, সে গৃহ কোথায়?

নবকুমার কহিলেন, "আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।"

বিদেশিনী কোন উত্তর করিলেন না। সহসা তিনি মুখাবনত করিয়া, প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, "দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?"

নবকুমার বলিলেন, "নবকুমার শর্ম্মা।"

প্রদীপ নিবিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুন্দরী-সন্দর্শনে

"—ধর দেবী মোহন মূরতি
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপু
আনি নানা আভরণ।"

—মেঘনাদবধ।

নবকুমার গৃহস্বামিনীকে ডাকিয়া অন্য প্রদীপ আনিতে বলিলেন। অন্য প্রদীপ আনিবার পূর্ব্বে একটি দীর্ঘনিশ্বাস শব্দ শুনিতে পাইলেন। প্রদীপ আনিবার ক্ষণেক পরে ভৃত্যবেশী একজন মুসলমান আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদেশিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "সে কি, তোমাদের এত বিলম্ব হইল কেন? আর সকলে কোথায়?"

ভৃত্য কহিল, "বাহকেরা সকল মাতোয়ারা হইয়াছিল। তাহাদের গুছাইয়া আনিতে আমরা পাল্কীর পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম। পরে ভগ্নশিবিকা দেখিয়া এবং আপনাকে না দেখিয়া আমরা একেবারে অজ্ঞান হইয়াছিলাম। কেহ কেহ সেই স্থানে আছে; কেহ কেহ অন্যান্য দিকে আপনার সন্ধানে গিয়াছে। আমি এদিকে সন্ধানে আসিয়াছি।"

মতি কহিলেন, "তাহাদিগকে লইয়া আইস।"

নফর সেলাম করিয়া চলিয়া গেল, বিদেশিনী কিয়ৎকাল করলগ্নকপোলা হইয়া বসিয়া রহিলেন।

নবকুমার বিদায় চাহিলেন। তখন মতি স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্ববৎভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় অবস্থিতি করিবেন?

নব। ইহারই পরের ঘরে।

মতি। আপনার সে ঘরের কাছে একখানি পাল্কী দেখিলাম, আপনার কি কেহ সঙ্গী আছেন?

নব। আমার স্ত্রী সঙ্গে।

মতিবিবি আবার ব্যঙ্গের অবকাশ পাইলেন। কহিলেন, "তিনিই কি অদ্বিতীয়া রূপসী?"

নব। দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

মতি। দেখা কি পাওয়া যায়?

নব। (চিন্তা করিয়া) ক্ষতি কি?

মতি। তবে একটু অনুগ্রহ করুন। অদ্বিতীয়া রূপসীকে দেখিতে বড় কৌতূহল

হইতেছে। আগরা গিয়া বলিতে চাহি ; কিন্তু এখনই নহে—আপনি এখন যান। ক্ষণেক পরে আমি আপনাকে সংবাদ দিব।

নবকুমার চলিয়া গেলেন। ক্ষণেক পরে অনেক লোকজন, দাসদাসী ও বাহক সিন্দুক ইত্যাদি লইয়া উপস্থিত হইল। একখানি শিবিকাও আসিল ; তাহাতে একজন দাসী। পরে নবকুমারের নিকট সংবাদ আসিল, "বিবি স্মরণ করিয়াছেন।"

নবকুমার মতিবিবির নিকট পুনরাগমন করিলেন। দেখিলেন, এবার আবার রূপান্তর। মতিবিবি পূর্ব্বপরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সুবর্ণমুক্তাদিশোভিত কারুকার্য্যযুক্ত বেশভূষা ধারণ করিয়াছেন। নিরলঙ্কার দেহ অলঙ্কারে খচিত করিয়াছেন ; যেখানে যাহা ধরে—কুন্তলে, কবরীতে, কপালে, নয়নপার্শ্বে, কর্ণে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, বাহুযুগে, সর্ব্বত্র সুবর্ণমধ্য হইতে হীরকাদি রত্ন ঝলসিতেছে। নবকুমারের চক্ষু অস্থির হইল। প্রভূতনক্ষত্রমালাভূষিত আকাশের ন্যায়—মধুরায়ত শরীরসহিত অলঙ্কারবাহুল্য সুসঙ্গত বোধ হইল, বরং তাহাতে আরও সৌন্দর্য্যপ্রভা বর্দ্ধিত হইল। মতিবিবি নবকুমারকে কহিলেন, "মহাশয়, চলুন, আপনার পত্নীর নিকট পরিচিত হইয়া আসি।" নবকুমার বলিলেন, "সেজন্য অলঙ্কার পরিবার প্রয়োজন ছিল না। আমার পরিবারের কোন গহনাই নাই।"

মতিবিবি। গহনাগুলি না হয় দেখাইবার জন্য পরিয়াছি ; স্ত্রীলোকের গহনা থাকিলে সে না দেখাইলে বাঁচে না। এখন চলুন।

নবকুমার মতিবিবিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। যে দাসী শিবিকারোহণে আসিয়াছিল, সেও সঙ্গে চলিল। ইহার নাম পেষ্‌মন।

কপালকুণ্ডলা দোকানঘরের আর্দ্র মৃত্তিকায় একাকিনী বসিয়াছিলেন। একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছে মাত্র—অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল। মতিবিবি প্রথম যখন তাঁহাকে দেখিলেন, তখন অধরপার্শ্বে ও নয়নপ্রান্তে ঈষৎ হাসি ব্যক্ত হইল। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রদীপটি তুলিয়া কপালকুণ্ডলার মুখের নিকট আনিলেন। তখন সে হাসি-হাসি ভাব দূর হইল ; মতির মুখ গম্ভীর হইল ;—অনিমেষলোচনে দেখিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা কহেন না।—মতি মুগ্ধা ; কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।

ক্ষণেক পরে মতি আপন অঙ্গ হইতে অলঙ্কাররাশি মোচন করিতে লাগিলেন। মতি আত্মশরীর হইতে অলঙ্কাররাশি মুক্ত করিয়া একে একে কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা কিছু বলিলেন না। নবকুমার কহিতে লাগিলেন, "ও কি হইতেছে?" মতি তাহার কোন উত্তর করিলেন না।

অলঙ্কার সমাবেশ সমাপ্ত হইলে, মতি নবকুমারকে কহিলেন, "আপনি সত্যই বলিয়াছিলেন ; এ ফুল রাজোদ্যানেও ফুটে না। পরিতাপ এই যে, রাজধানীতে এ রূপরাশি দেখাইতে পারিলাম না। এ সকল অলঙ্কার এই অঙ্গেরই উপযুক্ত—এইজন্য পরাইলাম। আপনিও কখন কখন পরাইয়া মুখরা বিদেশিনীকে মনে করিবেন।"

নবকুমার চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "সে কি! এ বহুমূল্য অলঙ্কার, আমি এ সব লইব কেন ?"

মতি কহিলেন, "ঈশ্বর প্রসাদাৎ আমার আরও আছে। আমি নিরাভরণ হইব না। ইহাকে পরাইয়া আমার যদি সুখবোধ হয় আপনি কেন ব্যাঘাত করেন ?"

মতিবিবি ইহা কহিয়া দাসীসঙ্গে চলিয়া গেলেন। বিরলে আসিলে পেষ্‌মন মতিবিবিকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিবিজান্, এ ব্যক্তি কে ?"

যবনবালা উত্তর করিল, "মেরা শোহর।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিবিকারোহণে

"——খুলিনু সত্বরে,
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী।" —মেঘনাদবধ।

গহনার দশা কি হইল, বলি শুন। মতিবিবি গহনা রাখিবার জন্য একটি রৌপ্যজড়িত হস্তিদন্তের কৌটা পাঠাইয়া দিলেন। দস্যুরা তাঁহার অল্প সামগ্রীই লইয়াছিল—নিকটে যাহা ছিল, তদ্ব্যতীত কিছুই পায় নাই।

নবকুমার দুই একখানি গহনা কপালকুণ্ডলার অঙ্গে রাখিয়া অধিকাংশ কৌটায় তুলিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রভাতে মতিবিবি বর্দ্ধমানাভিমুখে, নবকুমার সপত্নীক সপ্তগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে শিবিকাতে তুলিয়া দিয়া তাঁর সঙ্গে গহনার কৌটা দিলেন। বাহকেরা সহজেই নবকুমারকে পশ্চাৎ করিয়া চলিল। কপালকুণ্ডলা শিবিকাদ্বার খুলিয়া চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন ; একজন ভিক্ষুক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, ভিক্ষা চাইতে চাইতে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "আমার ত কিছুই নাই, তোমাকে কি দিব ?"

ভিক্ষুক কপালকুণ্ডলার অঙ্গে যে দুই একখানা অলঙ্কার ছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "সে কি মা! তোমার গায়ে হীরা-মুক্তা—তোমার কিছুই নাই ?"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গহনা পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও ?"

ভিক্ষুক কিছু বিস্মিত হইল। ভিক্ষুকের আশা অপরিমিত। ক্ষণমাত্র পরে বলিল, "হই বৈ কি।"

কপালকুণ্ডলা অপকটহৃদয়ে কৌটাসমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন। অঙ্গের অলঙ্কারগুলিও খুলিয়া দিলেন।

ভিক্ষুক ক্ষণেক বিহ্বল হইয়া রহিল। দাসদাসী কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। ভিক্ষুকের বিহ্বলভাব ক্ষণিকমাত্র। তখনই এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া গহনা লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কপালকুণ্ডলা ভাবিলেন, "ভিক্ষুক দৌড়িল কেন ?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বদেশে

"শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ।
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ॥"

—মেঘদূত।

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া স্বদেশে উপনীত হইলেন। নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিল। জ্যেষ্ঠা বিধবা, তাঁহার সহিত পাঠক মহাশয়ের পরিচয় হইবে না। দ্বিতীয়া শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা, কেন না তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেন।

অবস্থান্তরে নবকুমার অজ্ঞাতকুলশীল তপস্বিনীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনায়, তাঁহার আত্মীয়স্বজন কতদূর সন্তুষ্টিপ্রকাশ করিতেন, তাহা আমরা বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে তাঁহাকে কোন ক্লেশ পাইতে হয় নাই। সকলেই তাঁহার প্রত্যাগমনপক্ষে নিরাশ্বাস হইয়াছিল। সহযাত্রীরা প্রত্যাগমন করিয়া রটনা করিয়াছিলেন যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। পাঠক মহাশয় মনে করিবেন যে, এই সত্যবাদীরা আত্মপ্রতীতিমতই কহিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তির অবমাননা করা হয়। প্রত্যাগত

যাত্রীর মধ্যে অনেকে নিশ্চিত করিয়া কহিয়াছিলেন যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রমুখে পড়িতে তাঁহারা প্রত্যক্ষই দৃষ্টি করিয়াছিলেন। কখন কখন ব্যাঘ্রটার পরিমাণ লইয়া তর্কবিতর্ক হইল; কেহ বলিলেন, "ব্যাঘ্রটা আট হাত হইবে।" কেহ কহিলেন, "না, প্রায় চৌদ্দ হাত।" পূর্ব্বপরিচিত প্রাচীন যাত্রী কহিলেন, "যাহা হউক, আমি বড় রক্ষা পাইয়াছিলাম। ব্যাঘ্রটা আমাকেই অগ্রে তাড়া করিয়াছিল, আমি পলাইলাম; নককুমার তত সাহসী পুরুষ নহে; পলাইতে পারিল না।''

যখন এই সকল রটনা নবকুমারের মাতা প্রভৃতির কর্ণগোচর হইল, তখন পুর-মধ্যে এমত ক্রন্দনধ্বনি উঠিল যে, কয়দিন তাহার ক্ষান্তি হইল না। একমাত্র পুত্রের মৃতসংবাদে নবকুমারের মাতা একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। এমত সময়ে যখন নবকুমার সস্ত্রীক হইয়া বাটী আগমন করিলেন, তখন তাহাকে কে জিজ্ঞাসা করে যে. তোমার বধূ কোন্ জাতীয়া বা কাহার কন্যা? সকলেই আহ্লাদে অন্ধ হইল।

নবকুমারের মাতা মহাসমাদরে বধূ বরণ করিয়া গৃহে লইলেন।

যখন নবকুমার দেখিলেন যে. কপালকুণ্ডলা তাঁহার গৃহমধ্যে সাদরে গৃহীতা হইলেন, তখন তাঁহার আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল। অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুণ্ডলা লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই;— অথচ তাঁহার হৃদয়াকাশে কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তিতেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই আশঙ্কাতেই তিনি কপালকুণ্ডলার পাণিগ্রহণ প্রস্তাবে অকস্মাৎ সম্মত হয়েন নাই; এই আশঙ্কাতেই পাণিগ্রহণ করিয়াও গৃহাগমন পর্য্যন্তও বারেকমাত্র কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়সম্ভাষণ করেন নাই। পরিপ্লবোন্মুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা দূর হইল। জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধকারী উপলমোচনে যেরূপ দুর্গম স্রোতোবেগ জন্মে, সেইরূপ বেগে নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল।

এই প্রেমাবির্ভাব সর্ব্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না, কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেই যেরূপ সজললোচনে তাঁহার প্রতি অনিমেষ চাহিয়া থাকিতেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইত; যেরূপ নিষ্প্রয়োজনে, প্রয়োজন কল্পনা করিয়া কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ দিবানিশি কপাল-কুণ্ডলার সুখস্বচ্ছন্দতার অন্বেষণ করিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; সর্ব্বদা অন্য-মনস্কতাসূচক পদবিক্ষেপে প্রকাশ পাইত। তাঁহার প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতে

লাগিল। যেখানে চাঞ্চল্য ছিল, সেখানে গাম্ভীর্য্য জন্মিল; যেখানে অপ্রসাদ ছিল, সেখানে প্রসন্নতা জন্মিল; নবকুমারের মুখ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। হৃদয় স্নেহের আধার হওয়াতে অপর সকলের প্রতি স্নেহের আধিক্য জন্মিল; বিরক্তিজনকের প্রতি বিরাগের লাঘব হইল; মনুষ্যমাত্র প্রেমের পাত্র হইল; পৃথিবী সৎকর্ম্মের জন্য মাত্র সৃষ্টা বোধ হইতে লাগিল। সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। প্রণয় এইরূপ। প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।

আর কপালকুণ্ডলা? তাহার কি ভাব? চল পাঠক তাহাকে দর্শন করি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অবরোধে

"কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা
বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে॥"

—কুমারসম্ভব।

সকলেই অবগত আছেন যে, পূর্ব্বকালে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিল। এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরীতে মিলিত হইত; কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তন্নগরীর প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতস্বতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সঙ্কীর্ণশরীরা হইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্য্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণ বাণিজ্যবাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। বাণিজ্যগৌরব নগরের বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়। সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে হুগলী নূতন সৌষ্ঠবে তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। তথায় পর্ত্তুগীসেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও সপ্তগ্রাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই। তথায় এ পর্য্যন্ত ফৌজদার

প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগের বাস ছিল; কিন্তু নগরের অনেকাংশ শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল।

সপ্তগ্রামের এক নির্জ্জন ঔপনগরিক ভাগে নবকুমারের বাস। এক্ষণে সপ্তগ্রামের ভগ্নদশায় তথায় প্রায় মনুষ্যসমাগম ছিল না; রাজপথ সকল লতাগুল্মাদিতে পরিপূরিত হইয়াছিল। নবকুমারের বাটীর পশ্চাতেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ দূর একটী ক্ষুদ্র খাল বহিত; সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। গৃহটী ইষ্টকরচিত; দেশকাল বিবেচনা করিলে তাহাকে নিতান্ত সামান্য গৃহ বলা যাইতে পারিত না। দোতলা বটে, কিন্তু ভয়ানক উচ্চ নহে, এখন একতলায় সেরূপ উচ্চতা অনেক দেখা যায়।

এই গৃহের সৌধোপরি দুইটী নবীনবয়সী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতেছিলেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে যাহা দেখা যাইতেছিল, তাহা লোচনরঞ্জক বটে। নিকটে একদিকে নিবিড় বন; তন্মধ্যে অসংখ্য পক্ষী কলরব করিতেছে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র খাল, রূপার সূতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। দূরে মহানগরের অসংখ্য সৌধমালা নববসন্তপবনস্পর্শলোলুপ নাগরিকগণে পরিপূরিত হইয়া শোভা পাইতেছে। অন্যদিকে অনেক দূরে নৌকাভরণা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছে।

যে নবীনাদ্বয় প্রাসাদোপরি দাঁড়াইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন চন্দ্ররশ্মিবর্ণাভা, অবিন্যস্ত কেশভারমধ্যে প্রায় অর্দ্ধলুক্কায়িতা; অপরা কৃষ্ণাঙ্গী। তিনি সুমুখী ষোড়শী, তাঁহার ক্ষুদ্র দেহ, মুখখানি ক্ষুদ্র, তাহার উপরার্দ্ধে চারিদিক্ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কুন্তলদাম বেড়িয়া পড়িয়াছে; যেন নীলোৎপলদলরাজি উৎপলমধ্যকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। নয়নযুগল বিস্ফারিত, কোমল, শ্বেতবর্ণ, সফরীসদৃশ অঙ্গুলিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সঙ্গিনীর কেশতরঙ্গমধ্যে ন্যস্ত হইয়াছে। পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন যে, চন্দ্ররশ্মিবর্ণশোভিনী কপালকুণ্ডলা; তাঁহাকে বলিয়া দিই, কৃষ্ণাঙ্গী তাঁহার ননন্দা শ্যামাসুন্দরী।

শ্যামাসুন্দরী ভ্রাতৃজায়াকে কখন "বউ," কখন আদর করিয়া "বন," কখন "মৃণো"—সম্বোধন করিতেছিলেন। কপালকুণ্ডলা নামটি বিকট বলিয়া গৃহস্থেরা তাঁর নাম মৃন্ময়ী রাখিয়াছিল; এইজন্যই "মৃণো" সম্বোধন আমরাও এখন কখন কখন ইহাকে মৃন্ময়ী বলিব।

শ্যামাসুন্দরী একটি শৈশবাভ্যস্ত কবিতা বলিতেছিলেন, যথা—

"বলে—পদ্মরাণী, বদনখানি, রেতে রাখে ঢেকে।
ফুটায় কলি, ছুটায় অলি, প্রাণপতিকে দেখে॥
আবার—বনের লতা, ছড়িয়ে পাতা, গাছের দিকে ধায়।
নদীর জল, নাম্‌লে ঢল, সাগরেতে যায়॥
ছি ছি—সরম টুটে, কুমুদ ফুটে, চাঁদের আলো পেলে।
বিয়ের কনে রাখতে নারি ফুলশয্যা গেলে॥
মরি—একি জ্বালা, বিধির খেলা, হরিষে বিষাদ।
পরপরশে, সবাই রসে, ভাঙ্গে লাজের বাঁধ॥

তুই কি লো একা তপস্বিনী থাকিবি ?"

মৃন্ময়ী উত্তর করিল, "কেন, কি তপস্যা করিতেছি ?"

শ্যামাসুন্দরী দুই করে মৃন্ময়ীর কেশতরঙ্গমালা তুলিয়া কহিল, "তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবে না ?"

মৃন্ময়ী কেবল ঈষৎ হাসিয়া শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন।

শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন, "ভাল, আমার সাধটি পূরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কতদিন যোগিনী থাকিবে ?"

মৃ। যখন এই ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

শ্যা। এখন আর থাকিতে পারিবে না।

মৃ। কেন থাকিব না ?

শ্যা। কেন ? দেখিবি ? তোর যোগ ভাঙ্গিব ? পরশপাতর কাকে বলে জান ?

মৃন্ময়ী কহিলেন, "না।"

শ্যা। পরশপাতরের স্পর্শে রাঙ্গও সোনা হয়।

মৃ। তাতে কি ?

শ্যা। মেয়েমানুষেরও পরশপাতর আছে।

মৃ। সে কি ?

শ্যা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পাতর ছুঁয়েছিস্। দেখিবি,—

বাঁধব চুলের রাশ, পরাব চিকন বাস,
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে সিঁথির ধার, কাঁকালেতে চন্দ্রহার,
কানে তোর দিব যোড়া দুল॥
কুঙ্কুম চন্দন চুয়া, বাটা ভরে পান গুয়া,
রাঙ্গামুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোনার পুত্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে—
দেখি ভাল লাগে কি না লাগে॥

মৃন্ময়ী কহিলেন, "ভাল, বুঝিলাম। পরশপাতর যেন ছুঁয়েছি, সোনা হলেম। চুল বাঁধিলাম, ভাল কাপড় পরিলাম, খোঁপায় ফুল দিলাম, কাঁকালে চন্দ্রহার পরিলাম, কানে দুল দুলিল ; চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, পান, গুয়া, সোনার পুত্তলি পর্য্যন্ত হইল। মনে কর, সকলই হইল। তাহা হইলেই বা কি সুখ ?"

শ্যা। বল দেখি, ফুলটি ফুটিলে কি সুখ ?

মৃ। লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি ?

শ্যামাসুন্দরীর মুখকান্তি গম্ভীর হইল ; প্রভাতবাতাহত নীলোৎপলবৎ বিস্ফারিত চক্ষু ঈষৎ দুলিল ; বলিলেন, "ফুলের কি ? তাহা ত বলিতে পারি না। কখন ফুল হইয়া ফুটি নাই। কিন্তু যদি তোমার মত কলি হইতাম, তবে ফুটিয়া সুখ হইত।"

শ্যামাসুন্দরী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "আচ্ছা,—তাই যদি না হইল, —তবে শুনি দেখি, তোমার সুখ কি ?"

মৃন্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।"

শ্যামাসুন্দরী কিছুটা বিস্মিতা হইলেন। তাঁহাদিগের যত্নে যে মৃন্ময়ী উপকৃতা হয়েন নাই, ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধা হইলেন ; কিছু রুষ্টা হইলেন। কহিলেন, "এখন ফিরিয়া যাইবার উপায় ?"

মৃ। উপায় নাই।

শ্যা। তবে করিবে কি ?

মৃ। অধিকারী কহিতেন, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

শ্যামাসুন্দরী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! কি হইল ?"

মৃন্ময়ী নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “যাহা বিধাতা করাইবেন, তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে, তাহাই ঘটিবে।”

শ্যা। কেন, কপালে আর কি আছে? কপালে সুখ আছে। তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল কেন?

মৃন্ময়ী কহিলেন, “শুন। যেদিন স্বামীর সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলাম। আমি মার পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম্ম করিতাম না। যদি কর্ম্মে শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে শঙ্কা হইতে লাগিল। ভাল মন্দ জানিতে মার কাছে গেলাম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না; অতএব কপালে কি আছে, জানি না।”

মৃন্ময়ী নীরব হইলেন। শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

—:০:—

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূতপূর্বে

“কষ্টোঽয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ।”

—রত্নাবলী।

যখন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া চটি হইতে যাত্রা করেন, তখন মতিবিবি পথান্তরে বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ মতিবিবি পথবাহন করেন, ততক্ষণ আমরা তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছু বলি। মতির চরিত্র মহাদোষ কলুষিত, মহদ্গুণেও শোভিত। এরূপ চরিত্রের বিস্তারিত বৃত্তান্তে পাঠক মহাশয় অসন্তুষ্ট হইবেন না।

যখন ইহার পিতা মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন, তখন ইঁহার হিন্দুনাম পরিবর্ত্তিত হইয়া লুৎফ-উন্নিসা নাম হইল। মতিবিবি কোনকালেও ইঁহার নাম নহে। তবে কখন কখন ছদ্মবেশে দেশবিদেশে ভ্রমণকালে ঐ নাম গ্রহণ করিতেন। ইঁহার পিতা

ঢাকায় আসিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তথায় অনেক নিজদেশীয় লোকের সমাগম। দেশীয় সমাজে সমাজচ্যুত হইয়া সকলের থাকিতে ভাল লাগে না। অতএব তিনি কিছুদিনে সুবাদারের নিকট প্রতিপত্তিলাভ করিয়া তাঁহার সুহৃদ অনেকানেক ওমরাহের নিকট পত্রসংগ্রহপূর্ব্বক সপরিবারে আগ্রায় আসিলেন। আকবরশাহের নিকট কাহারও গুণ অবিদিত থাকিত না। শীঘ্রই তিনি ইহার গুণ গ্রহণ করিলেন। লুৎফ-উন্নিসার পিতা শীঘ্রই উচ্চপদস্থ হইয়া আগ্রার প্রধান ওমরাহমধ্যে গণ্য হইলেন। এদিকে লুৎফ-উন্নিসা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আগ্রাতে আসিয়া তিনি পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য-গীত রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হইলেন। রাজধানীর অসংখ্য রূপবতী গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যাসম্বন্ধে তাঁহার যাদৃশ শিক্ষা হইয়াছিল, নীতিসম্বন্ধে তাহার কিছুই হয় নাই। লুৎফ-উন্নিসার বয়স পূর্ণ হইলে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তাঁহার মনোবৃত্তিসকল দুর্দ্দমবেগবতী। ইন্দ্রিয়দমনের কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। সদসতে সমান প্রবৃত্তি। এ কার্য্য সৎ, এ কার্য্য অসৎ, এমত বিচার করিয়া তিনি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না; যাহা ভাল লাগিত, তাহাই করিতেন; যখন সৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন সৎকর্ম্ম করিতেন; যখন অসৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন অসৎকর্ম্ম করিতেন; যৌবনকালের মনোবৃত্তি দুর্দ্দম হইলে যে সকল দোষ জন্মে, তাহা লুৎফ-উন্নিসাসম্বন্ধে জন্মিল। তাঁহার পূর্ব্বস্বামী বর্ত্তমান, ওমরাহেরা কেহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনিও বড় বিবাহের অনুরাগিণী হইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব? প্রথমে কানাকানি, শেষে কালিময় কলঙ্ক রটিল। তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে আপন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

লুৎফ-উন্নিসা গোপনে যাহাদিগকে কৃপা বিতরণ করিতেন, তন্মধ্যে যুবরাজ সেলিম একজন। একজন ওমরাহের কুলকলঙ্ক জন্মাইলে, পাছে আপনার অপক্ষপাতী পিতার কোপানলে পড়িতে হয়, এই আশঙ্কায় সেলিম এ পর্য্যন্ত লুৎফ-উন্নিসাকে আপন অবরোধবাসিনী করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সুযোগ পাইলেন। রাজপুত-পতি মানসিংহের ভগিনী যুবরাজের প্রধানা মহিষী ছিলেন। যুবরাজ লুৎফ-উন্নিসাকে তাঁহার প্রধানা সহচরী করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা বেগমের সখী, পরোক্ষে যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী হইলেন।

লুৎফ-উন্নিসার ন্যায় বুদ্ধিমতী মহিলা যে অল্পদিনেই রাজকুমারের হৃদয়াধিকার

করিবেন, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। সেলিমের চিত্তে তাঁহার প্রভুত্ব এরূপ প্রতিযোগিশূন্য হইয়া উঠিল যে, লুৎফ-উন্নিসা উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পাটরাণী হইবেন, ইহা তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা হইল। কেবল লুৎফ-উন্নিসার স্থির প্রতিজ্ঞা হইল, এমত নহে, রাজপুরবাসী সকলেরই ইহা সম্ভব বোধ হইল। এইরূপ আশার স্বপ্নে লুৎফ-উন্নিসা জীবন বাহিত করিতেছিলেন, এমন সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল। আকবর-শাহের কোষাধ্যক্ষ (আকতিবাদ-উদ্দৌলা) থাজা আয়াসের কন্যা মেহের-উন্নিসা যবনকুলে প্রধানা সুন্দরী। একদিন কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার সেলিম ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন। সেইদিন মেহের-উন্নিসার সহিত সেলিমের সাক্ষাৎ হইল এবং সেইদিন সেলিম মেহের-উন্নিসার নিকট চিত্ত রাখিয়া গেলেন। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। শের আফগান নামক একজন মহাবিক্রমশালী ওমরাহের সহিত কোষাধ্যক্ষের কন্যার সম্বন্ধ পূর্ব্বেই হইয়াছিল। সেলিম অনুরাগান্ধ হইয়া সে সম্বন্ধ রহিত করিবার জন্য পিতার নিকট যাচমান হইলেন; কিন্তু নিরপেক্ষ পিতার নিকট কেবল তিরস্কৃত হইলেন মাত্র। সুতরাং সেলিমকে আপাততঃ নিরস্ত হইতে হইল। আপাততঃ নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। শের আফগানের সহিত মেহের-উন্নিসার বিবাহ হইল। কিন্তু সেলিমের চিত্তবৃত্তি সকল লুৎফ-উন্নিসার নখদর্পণে ছিল,—তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, শের আফগানের সহস্র প্রাণ থাকিলেও তাঁহার নিস্তার নাই। আকবরশাহের মৃত্যু হইলেই তাঁহারও প্রাণান্ত হইবে—মেহের-উন্নিসা সেলিমের মহিষী হইবেন। লুৎফা-উন্নিসা সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিলেন।

মহম্মদীয় সম্রাট্‌কুলগৌরব আকবরের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিল। যে প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রভায় তুরকী হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছিল, সে সূর্য্য অস্তগামী হইল। এসময়ে লুৎফ-উন্নিসা আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্য এক দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিলেন।

রাজপুতপতি রাজা মানসিংহের ভগিনী সেলিমের প্রধানা মহিষী। খস্রু তাঁহার পুত্র। একদিন তাঁহার সহিত আকবরশাহের পীড়িতশরীরসম্বন্ধে লুৎফ-উন্নিসার কথোপকথন হইতেছিল, রাজপুতকন্যা এক্ষণে বাদশাহপত্নী হইবেন এই কথার প্রসঙ্গ করিয়া লুৎফ-উন্নিসা তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছিলেন। প্রত্যুত্তরে খস্রুর জননী কহিলেন, "বাদশাহের মহিষী হইলে মনুষ্য জন্ম সার্থক হয় বটে, কিন্তু যে বাদশাহ-জননী, সেই সর্ব্বোপরি" উত্তর শুনিবামাত্র এক অপূর্ব্ব-চিন্তিত অভিসন্ধি

লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে উদয় হইল। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "তাই হউক না কেন? সেও ত আপনার ইচ্ছাধীন।" বেগম কহিলেন, "সে কি?" চতুরা উত্তর করিলেন, "যুবরাজ খস্রুকে সিংহাসন দান করুন।"

বেগম কোন উত্তর করিলেন না। সেদিন এ প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপিত হইল না; কিন্তু কেহই একথা ভুলিলেন না। স্বামীর পরিবর্ত্তে পুত্র যে সিংহাসনারোহণ করেন, ইহা বেগমের অনভিমত নহে, মেহের-উন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ লুৎফ-উন্নিসার যেরূপ হৃদয়শেল, বেগমেরও সেইরূপ। মানসিংহের ভগিনী আধুনিক তুর্কমান-কন্যার যে আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবেন তাহা ভাল লাগিবে কেন? লুৎফ-উন্নিসারও এ সঙ্কল্পে উদ্যোগিনী হইবার গাঢ় তাৎপর্য্য ছিল। অন্যদিন পুনর্ব্বার এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। উভয়ের মত স্থির হইল।

সেলিমকে ত্যাগ করিয়া খস্রুকে আকবরের সিংহাসনে স্থাপিত করা অসম্ভাবনীয় বোধ হইবার কোন কারণ ছিল না। একথা লুৎফ-উন্নিসা বেগমের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করাইলেন। তিনি কহিলেন, "মোগলের সাম্রাজ্য রাজপুতের বাহুবলে স্থাপিত রহিয়াছে; সেই রাজপুত জাতির চূড়া রাজা মানসিংহ, তিনি খস্রুর মাতুল; আর মুসলমানদিগের প্রধান খাঁ আজিম, তিনি প্রধান রাজমন্ত্রী, তিনি খস্রুর শ্বশুর; ইঁহারা দুইজনে উদ্যোগী হইলে কে ইঁহাদের অনুবর্ত্তী না হইবে? আর কাহার বলেই বা যুবরাজ সিংহাসন গ্রহণ করিবেন? রাজা মানসিংহকে একার্য্যে ব্রতী করা আপনার ভার। খাঁ আজিম ও অন্যান্য মহম্মদীয় ওমরাহগণকে লিপ্ত করা আমার ভার। আপনার আশীর্ব্বাদে কৃতকার্য্য হইব, কিন্তু এক আশঙ্কা, পাছে সিংহাসন আরোহণ করিয়া খস্রু এ দুশ্চারিণীকে পুরবহিষ্কৃত করিয়া দেন।"

বেগম সহচরীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। হাসিয়া কহিলেন, "তুমি আগ্রায় যে ওমরাহের গৃহিণী হইতে চাও, সেই তোমার পাণিগ্রহণ করিবে। তোমার স্বামী পঞ্চ হাজারী মন্সবদার হইবেন।"

লুৎফ-উন্নিসা সন্তুষ্ট হইলেন। ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যদি রাজপুরীমধ্যে সামান্যা পুরস্ত্রী হইয়া থাকিতে হইল, তবে প্রতিপুষ্পবিহারিণী মধুকরীর পক্ষচ্ছেদন করিয়া কি সুখ হইল? যদি স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে হইল, তবে বাল্যসখী মেহের-উন্নিসার দাসীত্বে কি সুখ? তাহার অপেক্ষা কোন রাজপুরুষের সর্ব্বময়ী ঘরণী হওয়া গৌরবের বিষয়।

শুধু এই লোভে লুৎফ-উন্নিসা একর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন না। সেলিম যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহের-উন্নিসার জন্য এত ব্যস্ত, ইহার প্রতিশোধও তাঁহার উদ্দেশ্য।

খাঁ আজিম প্রভৃতি আগ্রা-দিল্লীর ওমরাহেরা লুৎফ-উন্নিসার বিলক্ষণ বাধ্য ছিলেন। খাঁ আজিম যে জামাতার ইষ্টসাধনে উদ্যুক্ত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। তিনি এবং আর আর ওমরাহগণ সম্মত হইলেন, খাঁ আজিম লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন, "মনে কর, যদি কোন অনুযোগে আমরা কৃতকার্য্য না হই, তবে তোমার আমার রক্ষা নাই। অতএব প্রাণ বাঁচাইবার একটা পথ রাখা ভাল।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "আপনার কি পরামর্শ?" খাঁ আজিম কহিলেন, "উড়িষ্যা ভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই। কেবল সেইখানে মোগলের শাসন তত প্রখর নহে, উড়িষ্যার সৈন্য আমাদিগের হস্তগত থাকা আবশ্যক। তোমার ভ্রাতা উড়িষ্যার মন্সবদার আছেন। আমি কল্য প্রচার করিব, তিনি যুদ্ধে আহত হইয়াছেন। তুমি তাঁহাকে দেখিবার ছলে কল্য উড়িষ্যায় যাত্রা কর। তথায় যৎকর্তব্য, তাহা সাধন করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন কর।"

লুৎফ-উন্নিসা এ পরামর্শে সম্মত হইলেন। তিনি উড়িষ্যায় আসিয়া যখন প্রত্যাগমন করিতেছিলেন তখন তাঁহার সহিত পাঠক মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পথান্তরে

"যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধ'রে।
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে ॥
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল।
আজিকে বিফল হলো, হতে পারে কাল ॥"

—নবীন তপস্বিনী।

যেদিন নবকুমারকে বিদায় করিয়া মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসা বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন, সেদিন তিনি বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেন না। অন্য চটিতে রহিলেন। সন্ধ্যার সময়ে পেষ্‌মনের সহিত একত্র বসিয়া কথোপকথন হইতেছিল, এমতকালে মতি সহসা পেষ্‌মনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"পেষ্‌মন! আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে?"

পেষ্‌মন কিছু বিস্মিত হইয়া, "কেমন আর দেখিব?" মতি কহিলেন, "সুন্দর পুরুষ বটে কি না?"

নবকুমারের প্রতি পেষমনের বিশেষ বিরাগ জন্মিয়াছিল। যে অলঙ্কারগুলি মতি কপালকুণ্ডলাকে দিয়াছিলেন, তৎপ্রতি পেষমনের বিশেষ লোভ ছিল; মনে

মনে ভরসা ছিল, একদিন চাহিয়া লইবে। সেই আশা নির্ম্মূল হইয়াছিল; সুতরাং কপালকুণ্ডলা এবং তাঁহার স্বামী উভয়ের প্রতি তাহার দারুণ বিরক্তি! অতএব স্বামিনীর প্রশ্নে উত্তর করিলেন,

"দরিদ্র ব্রাহ্মণ আবার সুন্দর কুৎসিত কি?"

সহচরীর মনের ভাব বুঝিয়া মতি হাস্য করিয়া কহিলেন, "দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যদি ওমরাহ হয়, তবে সুন্দর পুরুষ হইবে কি না?"

পে। সে আবার কি?

মতি। কেন, তুমি জান না যে বেগম স্বীকার করিয়াছেন যে, খস্রু বাদশাহ হইলে আমার স্বামী ওমরাহ হইবে?

পে। তা ত জানি, কিন্তু তোমার পূর্ব্বস্বামী ওমরাহ হইবেন কেন?

মতি। তবে আমার কোন্ স্বামী আছে?

পে। যিনি নূতন হইবেন।

মতি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমার ন্যায় সতীর দুই স্বামী বড় অন্যায় কথা—ও কে যাইতেছে?"

যাহাকে দেখিয়া মতি কহিলেন, 'ও কে যাইতেছে'? পেষ্‌মন তাহাকে চিনিল, সে আগ্রানিবাসী খাঁ আজিমের আশ্রিত ব্যক্তি। উভয়ে ব্যস্ত হইলেন। পেষমন্ তাহাকে ডাকিল। সে ব্যক্তি আসিয়া লুৎফ-উন্নিসাকে অভিবাদনপূর্ব্বক একখানি পত্র দান করিল; কহিল,

"পত্র লইয়া উড়িষ্যায় যাইতেছিলাম। পত্র জরুরী।"

পত্র পড়িয়া মতিবিবির আশা ভরসা সকল অন্তর্হিত হইল। পত্রের মর্ম এই—

'আমাদিগের যত্ন বিফল হইয়াছে। মৃত্যুকালে আকবরশাহ আপন বুদ্ধিবলে আমাদিগকে পরাভূত করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকে গতি হইয়াছে। তাঁহার আজ্ঞাবলে কুমার সেলিম এক্ষণে জাহাঁগীর শাহ হইয়াছেন। তুমি খস্রুর জন্য ব্যস্ত হইবে না। এই উপলক্ষে কেহ তোমার শত্রুতা সাধিতে না পারে, এমত চেষ্টার জন্য তুমি শীঘ্র আগ্রায় ফিরিয়া আসিবে।'

আকবরশাহ যে প্রকারে এ ষড়যন্ত্র নিষ্ফল করেন, তাহা ইতিহাসে বর্ণিত আছে; এ স্থলে সে বিবরণের আবশ্যকতা নাই।

পুরস্কারপূর্ব্বক দূতকে বিদায় করিয়া মতি পেষ্‌মনকে পত্র শুনাইলেন। পেষ্‌মন কহিল,

"এক্ষণে উপায়?"

মতি। এখন আর উপায় নাই।

পে। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ভাল, ক্ষতি কি? যেমন ছিলে তেমনই থাকিবে, মোগল বাদশাহের পুরস্ত্রীমাত্রেই অন্য রাজ্যের পাটরাণী অপেক্ষাও বড়।

মতি। (ঈষৎ হাসিয়া) তাহা আর হয় না। আর সে রাজপুরে থাকিতে পারিব না। শীঘ্রই মেহের-উন্নিসার সহিত জাহাঁগীরের বিবাহ হইবে। মেহের-উন্নিসাকে আমি কিশোরবয়োবধি ভাল জানি; একবার সে পুরবাসিনী হইলে সেই বাদশাহ হইবে। জাহাঁগীর বাদশাহ নামমাত্র থাকিবে। আমি যে তাহার সিংহাসনারোহণের পথরোধের চেষ্টা পাইয়াছিলাম, ইহা তাহার অবিদিত থাকিবে না। তখন আমার দশা কি হইবে?

পেষ্‌মন প্রায় রোদনোন্মুখী হইল, "তবে কি হইবে?"

মতি কহিলেন, "এক ভরসা আছে। মেহের-উন্নিসার চিত্ত জাহাঁগীরের প্রতি কিরূপ? তাঁহার যেরূপ দার্ঢ্য, তাহাতে যদি সে জাহাঁগীরের প্রতি অনুরাগিণী না হইয়া স্বামীর প্রতি যথার্থ স্নেহশালিনী হইয়া থাকে, তবে জাহাঁগীর শত শের আফগান বধ করিলেও মেহের-উন্নিসাকে পাইবেন না। আর যদি মেহের-উন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অভিলাষিণী হয়, তবে আর কোন ভরসা নাই।"

পে। মেহের-উন্নিসার মন কি প্রকারে জানিবে?

মতি হাসিয়া কহিলেন, "লুৎফ-উন্নিসার অসাধ্য কি? মেহের-উন্নিসা আমার বাল্যসখী—কালি বর্দ্ধমানে গিয়া তাহার নিকট দুইদিন অবস্থিতি করিব।"

পে। যদি মেহের-উন্নিসা বাদশাহের অনুরাগিণী না হন, তাহা হইলে কি করিবে?

ম। পিতা কহিয়া থাকেন, "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।"

উভয়ে ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন। ঈষৎ হাসিতে মতির ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইতে লাগিল। পেষ্‌মন জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিতেছ কেন?"

মতি কহিলেন, "কোন নূতন ভাব উদয় হইতেছে।

পে। কি নূতন ভাব?

মতি তাহা পেষ্‌মনকে বলিলেন না। আমরাও তাহা পাঠককে বলিব না। পশ্চাৎ প্রকাশ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিযোগিনী-গৃহে

"শ্যামাদন্যো নহি নহি নহি প্রাণনাথো মমাস্তি।"—উদ্ধবদূত।

এই সময়ে শের আফগান বঙ্গদেশের সুবাদারের অধীনে বর্দ্ধমানের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন।

মতিবিবি বর্দ্ধমানে আসিয়া শের আফগানের আলয়ে উপনীত হইলেন। শের আফগান সপরিবারে তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরে তথায় অবস্থিতি করাইলেন। যখন শের আফগান এবং তাঁহার স্ত্রী মেহের-উন্নিসা আগ্রায় অবস্থিতি করিতেন, তখন মতি তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ পরিচিতা ছিলেন। মেহের-উন্নিসার সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল, পরে উভয়েই দিল্লীর সাম্রাজ্যলাভের জন্য প্রতিযোগিনী হইয়াছিলেন। এক্ষণে একত্র হওয়ার মেহের-উন্নিসা মনে ভাবিতেছেন, "ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্ব কাহার অদৃষ্টে বিধাতা লিখিয়াছেন? বিধাতাই জানেন আর সেলিম জানেন, আর কেহ যদি জানে ত সে এই লুৎফ-উন্নিসা; দেখি লুৎফ-উন্নিসা কি কিছু প্রকাশ করিবে না?" মতিবিবিরও মেহের-উন্নিসার মন জানিবার চেষ্টা।

মেহের-উন্নিসা তৎকালে ভারতবর্ষ মধ্যে প্রধানা রূপবতী ও গুণবতী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, তাদৃশ রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যে ইতিহাসকীর্ত্তিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য ঐতিহাসিকমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কোনপ্রকার বিদ্যায় তৎকালিক পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নৃত্য-গীতে মেহেরউন্নিসা অদ্বিতীয়া; কবিতারচনায় বা চিত্রলেখনেও তিনি সকলের মনোমুগ্ধ করিতেন। তাঁহার সরস কথা, তাঁহার সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও মোহময়ী ছিল। মতিও এ সকল গুণে হীনা ছিলেন না। অদ্য এই দুইটি চমৎকারিণী পরস্পরের মন জানিতে উৎসুক হইলেন।

মেহের-উন্নিসা খাস কামরায় বসিয়া তসবীর লিখিতেছিলেন। মতি মেহের-উন্নিসার পৃষ্ঠের নিকট বসিয়া চিত্রলিখন দেখিতেছিলেন এবং তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন; মেহের-উন্নিসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিত্র কেমন হইতেছে?" মতিবিবি উত্তর করিলেন, তোমার চিত্র যেরূপ হইয়া থাকে তাহাই হইতেছে। অন্য কেহ যে তোমার ন্যায় চিত্রনিপুণ নহে, ইহাই দুঃখের বিষয়।';

মেহে। তাই যদি সত্য হয় ত দুঃখের বিষয় কেন?

ম। অন্যের তোমার মত চিত্রনৈপুণ্য থাকিলে তোমার এ মুখের আদর্শ রাখিতে পারিত।

মেহে। কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে।

মেহের-উন্নিসা এই কথা কিছু গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন।

ম। ভগিনি! আজ মনের স্ফূর্ত্তির এত অল্পতা কেন?

মেহে। স্ফূর্ত্তির অল্পতা কই? তবে যে তুমি আমাকে কাল প্রাতে ত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহাই বা কি প্রকারে ভুলিব? আর দুইদিন থাকিয়া তুমি কেনই বা চরিতার্থ না করিবে?

ম। সুখে কার অসাধ? সাধ্য হইলে আমি কেন যাইব? কিন্তু আমি পরের অধীন; কি প্রকারে থাকিব?

মেহে। আমার প্রতি তোমার ভালবাসা আর নাই, থাকিলে তুমি কোন মতে রহিয়া যাইতে। আসিয়াছ ত রহিতে পার না কেন?

ম। আমি ত সকল কথাই বলিয়াছি। আমার সহোদর মোগলসৈন্যে মন্সবদার—তিনি উড়িষ্যার পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়া সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন। আমি তাঁহারই বিপৎসংবাদ পাইয়া বেগমের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। উড়িষ্যায় অনেক বিলম্ব করিয়াছি, এক্ষণে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। তোমার সহিত অনেক দিন দেখা হয় নাই, এইজন্য দুইদিন রহিয়া গেলাম।

মেহে। বেগমের নিকট কোন্ দিন পৌছিবার কথা স্বীকার করিয়া আসিয়াছ?

মতি বুঝিলেন, মেহের-উন্নিসা ব্যঙ্গ করিতেছেন। মার্জ্জিত অথবা মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গে মেহের-উন্নিসা যেরূপ নিপুণ, মতি সেরূপ নহেন। কিন্তু অপ্রতিভ হইবার লোকও নহেন। তিনি উত্তর করিলেন, "দিন নিশ্চিত করিয়া তিনমাসের পথ যাতায়াত করা কি সম্ভবে? কিন্তু অনেক কাল বিলম্ব করিয়াছি; আরও বিলম্বে অসন্তোষের কারণ জন্মিতে পারে।"

মেহের-উন্নিসা নিজ ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কাহার অসন্তোষের আশঙ্কা করিতেছ; যুবরাজের, না তাঁহার মহিষীর?"

মতি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "এ লজ্জাহীনাকে কেন লজ্জা দিতে চাও? উভয়ের অসন্তোষ হইতে পারে।"

মে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—তুমি স্বয়ং বেগম নাম ধারণ করিতেছ না কেন? শুনিয়াছিলাম, কুমার সেলিম তোমাকে বিবাহ করিয়া খাসবেগম করিবেন; তাহার কত দূর?

ম। আমি সহজেই পরাধীন। যে কিছু স্বাধীনতা আছে, তাহা কেন নষ্ট

করিব? বেগমের সহচারিণী বলিয়া অনায়াসে উড়িষ্যায় আসিতে পারিলাম, সেলিমের বেগম হইলে কি উড়িষ্যায় আসিতে পারিতাম?

মে। যে দিল্লীশ্বরের প্রধানা মহিষী হইবে, তাহার উড়িষ্যায় আসিবার প্রয়োজন?

ম। সেলিমের প্রধানা মহিষী হইব, এমন স্পর্দ্ধা কখন করি না। এ হিন্দুস্থান দেশে কেবল মেহের-উন্নিসাই দিল্লীশ্বরের প্রাণেশ্বরী হইবার উপযুক্ত।

মেহের-উন্নিসা মুখ নত করিলেন। ক্ষণেক নিরুত্তর থাকিয়া কহিলেন, "ভগিনি! আমি এমত মনে করি না যে, তুমি আমাকে পীড়া দিবার জন্য এ কথা বলিলে, কি আমার মন জানিবার জন্য বলিলে। কিন্তু তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা, আমি যে শের আফগানের বনিতা, আমি যে কায়মনোবাক্যে শের আফগানের দাসী, তাহা তুমি বিস্মৃত হইয়া কথা কহিও না।"

লজ্জাহীনা মতি এ তিরস্কারে অপ্রতিভ হইলেন না; বরং আরও সুযোগ পাইলেন। কহিলেন, "তুমি যে পতিগতপ্রাণা, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। সেই জন্যই ছলক্রমে এ কথা তোমার সম্মুখে পাড়িতে সাহস করিয়াছি। সেলিম যে এ পর্য্যন্ত তোমার সৌন্দর্য্যের মোহ ভুলিতে পারেন নাই, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য। সাবধান থাকিও।"

মে। এখন বুঝিলাম। কিন্তু কিসের আশঙ্কা?

মতি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "বৈধব্যের আশঙ্কা।"

এই কথা বলিয়া মতি মেহের-উন্নিসার মুখপানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিয়া রহিলেন, কিন্তু ভয় বা আহ্লাদের কোন চিহ্ন তথায় দেখিতে পাইলেন না। মেহের-উন্নিসা সদর্পে কহিলেন, "বৈধব্যের আশঙ্কা! শের আফগান আত্মরক্ষায় অক্ষম নহেন। বিশেষ আক্‌বর বাদশাহের রাজ্যমধ্যে তাঁহার পুত্রও বিনাদোষে পরপ্রাণ নষ্ট করিয়া নিস্তার পাইবেন না।"

ম। সত্য কথা, কিন্তু সম্প্রতিকার আগ্রার সংবাদ এই যে, আক্‌বরশাহ গত হইয়াছেন। সেলিম সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন। দিল্লীশ্বরকে কে দমন করিবে?

মেহের-উন্নিসা আর কিছু শুনিলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিতে লাগিল। আবার মুখ নত করিলেন, লোচনযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদ কেন?"

মেহের-উন্নিসা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?"

মতির মনস্কাম সিদ্ধ হইল; তিনি কহিলেন, "তুমি আজও যুবরাজকে একেবারে বিস্মৃত হইতে পার নাই ?"

মেহের-উন্নিসা গদ্‌গদ্‌স্বরে কহিলেন, "কাহাকে বিস্মৃত হইব ? আত্মজীবন বিস্মৃত হইব, তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না। কিন্তু শুন, ভগিনি! অকস্মাৎ মনের কপাট খুলিল; তুমি এ কথা শুনিলে; কিন্তু আমার শপথ, এ কথা যেন কর্ণান্তরে না যায়।"

মতি কহিল, "ভাল, তাহাই হইবে। কিন্তু যখন সেলিম শুনিবেন যে, আমি বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলাম, তখন তিনি অবশ্য জিজ্ঞাসা করিবেন যে, মেহের-উন্নিসা আমার কথা কি-বলিল। তখন আমি কি উত্তর করিব ?"

মেহের-উন্নিসা কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, "এই কহিও যে, মেহের-উন্নিসা হৃদয়মধ্যে তাঁহার ধ্যান করিবে। প্রয়োজন হইলে তাঁহার জন্য আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিবে। কিন্তু কখন আপন কুলমান সমর্পণ করিবে না। দাসীর স্বামী জীবিত থাকিতে সে কখন দিল্লীশ্বরকে মুখ দেখাইবে না। আর যদি দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক তাহার স্বামীর প্রাণান্ত হয়, তবে স্বামিহন্তার সহিত ইহজন্মে তাহার মিলন হইবেক না।"

ইহা কহিয়া মেহের-উন্নিসা সেই স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। মতিবিবি চমৎকৃত হইয়া রহিলেন। কিন্তু মতিবিবিরই জয় হইল। মেহের-উন্নিসার চিত্তের ভাব মতিবিবি জানিলেন; মতিবিবির আশা-ভরসা মেহের-উন্নিসা কিছুই জানিতে পারিলেন না। যিনি পরে আত্মবুদ্ধিপ্রভাবে দিল্লীশ্বরেরও ঈশ্বরী হইয়াছিলেন, তিনিও মতির নিকট পরাজিতা হইলেন। ইহার কারণ, মেহের-উন্নিসা প্রণয়শালিনী; মতিবিবি এস্থলে কেবলমাত্র স্বার্থপরায়ণা।

মনুষ্যহৃদয়ের বিচিত্র গতি মতিবিবি বিলক্ষণ বুঝিতেন। মেহের-উন্নিসার কথা আলোচনা করিয়া তিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন, কালে তাহাই যথার্থীভূত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, মেহের-উন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অনুরাগিণী; অতএব নারীদর্পে এখন যাহাই বলুন, পথ মুক্ত হইলে মনের গতি রোধ করিতে পারিবেন না। বাদশাহের মনস্কামনা অবশ্য সিদ্ধ করিবেন।

এ সিদ্ধান্তে মতির আশা-ভরসা সকলই নির্ম্মূল হইল। কিন্তু তাহাতে কি মতি নিতান্তই দুঃখিত হইলেন ? তাহা নহে। বরং ঈষৎ সুখানুভবও হইল। কেন যে এমন অসম্ভব চিত্তপ্রসাদ জন্মিল, তাহা মতি প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আগ্রার পথে যাত্রা করিলেন। পথে কয়েক দিন গেল। সেই কয়েক দিনে আপন চিত্তভাব বুঝিলেন।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজনিকেতন

"পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।"

—বীরাঙ্গনা কাব্য।

মতি আগ্রায় উপনীতা হইলেন। আর তাঁহাকে মতি বলিবার আবশ্যক করে না। কয়দিনে তাঁহার চিত্তবৃত্তিসকল একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

জাহাঁগীরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। জাহাঁগীর তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সমাদর করিয়া, তাঁহার সহোদরের সংবাদ ও পথের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা যাহা মেহের-উন্নিসাকে বলিয়াছিলেন তাহা সত্য হইল। অন্যান্য প্রসঙ্গের পর বর্দ্ধমানের কথা শুনিয়া, জাহাঁগীর জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মেহের-উন্নিসার নিকট দুইদিন ছিলে বলিতেছ, মেহের-উন্নিসা আমার কথা কি বলিল ?" লুৎফ-উন্নিসা অকপটহৃদয়ে মেহের-উন্নিসার অনুরাগের পরিচয় দিলেন। বাদশাহ শুনিয়া নীরবে রহিলেন; তাঁহার বিস্ফারিত লোচনে দুই এক বিন্দু অশ্রু বহিল।

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "জাহাঁপনা! দাসী শুভ সংবাদ দিয়াছে। দাসীর এখনও কোন পুরস্কারের আদেশ হয় নাই।"

বাদশাহ হাসিয়া কহিলেন, "বিবি! তোমার আকাঙ্ক্ষা অপরিমিত।"

লু। জাহাঁপনা! দাসীর কি দোষ ?

বাদ। দিল্লীর বাদশাহকে তোমার গোলাম করিয়া দিয়াছি; আরও পুরস্কার চাহিতেছ ?

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "স্ত্রীলোকের অনেক সাধ।"

বাদ। আবার কি সাধ হইয়াছে ?

লু। আগে রাজাজ্ঞা হউক যে, দাসীর আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

বাদ। যদি রাজকার্য্যে বিঘ্ন না হয়।

লু। (হাসিয়া) একের জন্য দিল্লীশ্বরের কার্য্যের বিঘ্ন হয় না।

বাদ। তবে স্বীকৃত হইলাম; সাধটি কি শুনি।

লু। সাধ হইয়াছে, একটী বিবাহ করিব।

জাহাঁগীর উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ নূতনতর সাধ বটে। কোথাও সম্বন্ধের স্থিরতা হইয়াছে ?"

লু। তা হইয়াছে। কেবল রাজাজ্ঞার অপেক্ষা। রাজার সম্মতি প্রকাশ না হইলে কোন সম্বন্ধ স্থির নহে।

বাদ। আমার সম্মতির প্রয়োজন কি? কাহাকে এ সুখের সাগরে ভাসাইবে অভিপ্রায় করিয়াছ?

লু। দাসী দিল্লীশ্বরের সেবা করিয়াছে বলিয়া দ্বিচারিণী নহে। দাসী আপন স্বামীকেই বিবাহ করিবার অনুমতি চাহিতেছে।

বাদ। বটে! এ পুরাতন নফরের দশা কি করিবে?

লু। দিল্লীশ্বরী মেহের-উন্নিসাকে দিয়া যাইব।

বাদ। দিল্লীশ্বরী মেহের-উন্নিসা কে?

লু। যিনি হইবেন।

জাহাঁগীর মনে ভাবিলেন যে, মেহের-উন্নিসা যে দিল্লীশ্বরী হইবেন, তাহা লুৎফ-উন্নিসা ধ্রুব জানিয়াছেন। তৎকারণে নিজ মনোভিলাষ বিফল হইল বলিয়া রাজাবরোধ হইতে বিরাগে অবসর লইতে চাহিতেছেন।

এইরূপ বুঝিয়া জাহাঁগীর দুঃখিত হইয়া নীরবে রহিলেন। লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "মহারাজের কি এ সম্বন্ধে সম্মতি নাই?"

বাদ। আমার অসম্মতি নাই। কিন্তু স্বামীর সহিত আবার বিবাহের আবশ্যকতা কি?

লু। কপালক্রমে প্রথম বিবাহে স্বামী পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। এক্ষণে জাহাঁপনার দাসীকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

বাদশাহ রহস্যে হাস্য করিয়া পরে গম্ভীর হইলেন। কহিলেন, "প্রেয়সি! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। তোমার যদি সেই প্রবৃত্তি হয়, তবে তদ্রূপই কর। কিন্তু আমাকে কেন ত্যাগ করিয়া যাইবে? এক আকাশে কি চন্দ্র সূর্য্য উভয়েই বিরাজ করে না? এক বৃন্তে কি দুটী ফুল ফোটে না!"

লুৎফ-উন্নিসা বিস্ফারিতচক্ষে বাদশাহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া থাকে, কিন্তু এক মৃণালে দুইটী কমল ফুটে না। আপনার রত্নসিংহাসনতলে কেন কণ্টক হইয়া থাকিব?"

লুৎফ-উন্নিসা আত্মমন্দিরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার এরূপ মনোবাঞ্ছা যে কেন জন্মিল, তাহা তিনি জাহাঁগীরের নিকট ব্যক্ত করেন নাই। অনুভবে যেরূপ বুঝা

যাইতে পারে, জাহাঁগীর সেইরূপ বুঝিয়া ক্ষান্ত হইলেন। নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই জানিলেন না। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় পাষাণ। সেলিমের রমণীহৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখনও তাঁহার মনোমুগ্ধ করে নাই। কিন্তু এইবার পাষাণমধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আত্মমন্দিরে

"জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলিল এক॥"

—বিদ্যাপতি

লুৎফ-উন্নিসা আলয়ে আসিয়া প্রফুল্লবদনে পেষ্‌মনকে ডাকিয়া বেশভূষা পরিত্যাগ করিলেন। স্বর্ণ মুক্তাদি-খচিত বসন পরিত্যাগ করিয়া পেষ্‌মনকে কহিলেন যে, "এই পোষাকটী তুমি লও।"

শুনিয়া পেষ্‌মন কিছু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পোষাকটি বহুমূল্যে সম্প্রতিমাত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। কহিলেন, "পোষাক আমায় কেন? আজিকার কি সংবাদ?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "শুভ সংবাদ বটে।"

পে। তা ত বুঝিতে পারিতেছি। মেহের-উন্নিসার ভয় কি ঘুচিয়াছে?

লু। ঘুচিয়াছে। এক্ষণে সে বিষয়ে কোন চিন্তা নাই।

পেষ্‌মন অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "তবে এক্ষণে বেগমের দাসী হইলাম।"

লু। যদি তুমি বেগমের দাসী হইতে চাও, তবে আমি মেহের-উন্নিসাকে বলিয়া দিব।

পে। সে কি? আপনি কহিতেছেন যে, মেহের-উন্নিসার বাদশাহের বেগম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

লু। আমি এমন কথা বলি নাই। আমি বলিয়াছি, সে বিষয়ে আমার কোন চিন্তা নাই।

পে। চিন্তা নাই কেন? আপনি আগ্রার একমাত্র অধীশ্বরী না হইলে যে সকলই বৃথা হইল।

লু। আগ্রার সহিত সম্পর্ক রাখিব না।

পে। সে কি? আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আজিকার শুভ সংবাদটা তবে কি, বুঝাইয়া বলুন।

লু। শুভ সংবাদ এই যে, আমি এ জীবনের মত আগ্রা ত্যাগ করিয়া চলিলাম।

পে। কোথায় যাইবেন?

লু। বাঙ্গালায় গিয়া বাস করিব। পারি যদি কোন ভদ্রলোকের গৃহিণী হইব।

পে। এরূপ ব্যঙ্গ নূতন বটে, কিন্তু শুনিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

লু। ব্যঙ্গ করিতেছি না। আমি সত্য সত্যই আগ্রা ত্যাগ করিয়া চলিলাম। বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছি।

পে। এমন কুপ্রবৃত্তি আপনার কেন জন্মিল?

লু। কুপ্রবৃত্তি নহে। অনেক দিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফল লাভ হইল? সুখের তৃষ্ণা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এ পর্য্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম? কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করিয়াছি? আর যে যে উদ্দেশ্যে এত দূর করিলাম, তাহার কোন্‌টাই বা হস্তগত হয় নাই? ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলই ত প্রচুরপরিমাণে ভোগ করিলাম। এত করিয়াও কি হইল? আজি এইখানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, একদিনের তরেও সুখী হই নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কখনও সুখভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল তৃষ্ণা বাড়ে মাত্র। চেষ্টা করিলে আরও সম্পদ্, আরও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি কিন্তু কি জন্য? এ সকলে যদি সুখ থাকিত, তবে এতদিন একদিনের তরেও সুখী হইতাম। এই সুখাকাঙ্ক্ষা পার্ব্বতীর নির্ঝরিণীর ন্যায়—প্রথম নির্ম্মল ক্ষীণ ধারা বিজনপ্রদেশ হইতে বাহির হয়, আপন গর্ভে আপনি লুকাইয়া রহে, কেহ জানে না; আপনি আপনি কল্

কল্ করে, কেহ শুনে না। ক্রমে যত যায় তত দেহ বাড়ে, তত পঙ্কিল হয়। শুধু তাহাই নয় ; কখন আবার বায়ু বহে, তরঙ্গ হয়, মকর-কুম্ভীরাদি বাস করে। আরও শরীর বাড়ে, জল আরও কর্দ্দমময় হয়, লবণময় হয়, অগণ্য সৈকতচর—মরুভূমি নদীহৃদয়ে বিরাজ করে, বেগ মন্দীভূত হইয়া যায়, তখন সেই সকর্দ্দম নদীশরীর অনন্ত সাগরে কোথায় লুকায়, কে বলিবে ?

পে। আমি ইহার ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এ সবে তোমার সুখ হয় না কেন ?

লু। কেন হয় না, তা এতদিন বুঝিয়াছি। তিন বৎসর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসিয়া যে সুখ না হইয়াছে, উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে একরাত্রে সে সুখ হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিয়াছি।

পে। কি বুঝিয়াছ ?

লু। আমি এতকাল হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণ রত্নাদিতে খচিত ; ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখন আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণমধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।

পে। এও ত কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

লু। আমি এই আগ্রায় কখনও কাহাকে ভালবাসিয়াছি ?

পে। (চুপি চুপি) কাহাকেও না।

লু। তবে পাষাণী নই ত কি ?

পে। তা এখন যদি ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, তবে ভালবাস না কেন ?

লু। মানস ত বটে। সেইজন্য আগ্রা ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।

পে। তারই বা প্রয়োজন কি ? আগ্রায় কি মানুষ নাই যে, চুয়াড়ের দেশে যাইবে ? এখন যিনি তোমাকে ভালবাসেন, তাঁহাকেই কেন ভালবাস না ? রূপে বল, ঐশ্বর্য্যে বল, যাহাতে বল, দিল্লীর বাদশাহের বড় পৃথিবীতে কে আছে ?

লু। আকাশে চন্দ্রসূর্য্য থাকিতে জল অধোগামী কেন ?

পে। কেন ?

লু। ললাটলিখন।

লুৎফ-উন্নিসা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চরণতলে

"কায় মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে।
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে॥"

—বীরাঙ্গনা কাব্য।

ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুর হয়। যখন অঙ্কুর হয়, তখন কেহ জানিতে পারে না—কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু একবার বীজ রোপিত হইলে রোপণকারী যথায় থাকুক না কেন, ক্রমে অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ মস্তক উন্নত করিতে থাকে। অদ্য বৃক্ষটি অঙ্গুলিপরিমেয় মাত্র, কেহ দেখিয়াও দেখিতে পায় না। ক্রমে তিল তিল বৃদ্ধি। ক্রমে বৃক্ষটি অর্দ্ধ হস্ত, এক হস্ত, দুই হস্তপরিমিত হইল; তথাপি, যদি তাহাতে কাহারও স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা না রহিল, তবে কেহ দেখে না, দেখিয়াও দেখে না। দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়, ক্রমে তাহার উপর চক্ষু পড়ে। আর অমনোযোগের কথা নাই,—ক্রমে বৃক্ষ বড় হয়, তাহার ছায়ায় অন্য বৃক্ষ নষ্ট করে,—চাহি কি, ক্ষেত্র অনন্যপাদপ হয়।

লুৎফ-উন্নিসার প্রণয় এইরূপ বাড়িয়াছিল। প্রথম একদিন অকস্মাৎ প্রণয়-ভাজনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন প্রণয়সঞ্চার বিশেষ জানিতে পারিলেন না। কিন্তু তখনই অঙ্কুর হইয়া রহিল। তারপর আর সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু অসাক্ষাতে পুনঃপুনঃ সেই মুখমণ্ডল মনে পড়িতে লাগিল, স্মৃতিপটে সে মুখমণ্ডল চিত্রিত করা কতক কতক সুখকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীজে অঙ্কুর জন্মিল। মূর্ত্তিপ্রতি অনুরাগ জন্মিল। চিত্তের ধর্ম্ম এই যে, যে মানসিক কর্ম্ম যত অধিক বার করা যায় সে কর্ম্মে তত অধিক প্রবৃত্তি হয়; সে কর্ম্ম ক্রমে স্বভাবসিদ্ধ হয়। লুৎফ-উন্নিসা সেই মূর্ত্তি অহরহঃ মনে ভাবিতে লাগিলেন। দারুণ দর্শনাভিলাষ জন্মিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহজস্পৃহাপ্রবাহও দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠিল। দিল্লীর সিংহাসনলালসাও তাঁহার নিকট লঘু হইল। সিংহাসন যেন মন্মথশরসম্ভূত অগ্নিরাশিবেষ্টিত বোধ হইতে লাগিল। রাজ্য, রাজধানী, রাজসিংহাসন সকল বিসর্জ্জন দিয়া প্রিয়জন-সন্দর্শনে ধাবিত হইলেন। সে প্রিয়জন নবকুমার।

এইজন্যই লুৎফ-উন্নিসা মেহের-উন্নিসার আশানাশিনী কথা শুনিয়াও অসুখী হয়েন নাই; এইজন্যই আগ্রায় আসিয়া সম্পদ্‌রক্ষায় কোন যত্ন পাইলেন না; এই জন্যই জন্মের মত বাদশাহের নিকট বিদায় লইলেন।

লুৎফ-উন্নিসা সপ্তগ্রামে আসিলেন। রাজপথের অনতিদূরে নগরীর মধ্যে এক অট্টালিকায় আপন বাসস্থান করিলেন। রাজপথের পথিকেরা দেখিলেন, অকস্মাৎ এই অট্টালিকা স্বর্ণখচিতবসনভূষিত দাসদাসীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে হর্ম্ম্যসজ্জা অতি মনোহর। গন্ধদ্রব্য, গন্ধবারি, কুসুমদাম সর্ব্বত্র আমোদ করিতেছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, গজদন্তাদিখচিত গৃহশোভার্থ নানাদ্রব্য সকল স্থানেই আলো করিতেছে। এইরূপ সজ্জীভূত এক কক্ষে লুৎফ-উন্নিসা অধোবদনে বসিয়া আছেন; পৃথকাসনে নবকুমার বসিয়া আছেন। সপ্তগ্রামে নবকুমারের সহিত লুৎফ-উন্নিসার আর দুই একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাহাতে লুৎফ-উন্নিসার মনোরথ কতদূর সিদ্ধ হইয়াছিল তাহা অন্যকার কথায় প্রকাশ হইবে।

নবকুমার কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "তবে আমি এক্ষণে চলিলাম। তুমি আর আমাকে ডাকিও না।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "যাইও না। আর একটু থাক। আমার যাহা বক্তব্য তাহা সমাপ্ত করি নাই।"

নবকুমার আরও ক্ষণেক প্রতীক্ষা করিলেন, কিন্তু লুৎফ-উন্নিসা কিছু বলিলেন না। ক্ষণেক পরে নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি বলিবে?" লুৎফ-উন্নিসা কোন উত্তর করিলেন না—তিনি নীরবে রোদন করিতেছিলেন।

নবকুমার ইহা দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধৃত করিলেন। নবকুমার ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কি, বল না?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ্, মান, প্রণয়, রঙ্গ, রহস্য পৃথিবীতে যাহাকে যাহাকে সুখ বলে, সকলই দিব; কিছুই তাহার প্রতিদান চাহি না; কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরবও চাহি না, কেবল দাসী।"

নবকুমার কহিলেন, "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার দত্ত ধনসম্পদ্ লইয়া যবনীজার হইতে পারিব না।"

যবনীজার!—নবকুমার এ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই যে, এই রমণী তাঁহার পত্নী। লুৎফ-উন্নিসা অধোবদনে রহিলেন। নবকুমার তাঁহার হস্ত হইতে বস্ত্রাগ্রভাগ মুক্ত করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা আবার তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধরিয়া কহিলেন,

"ভাল, সে যাউক। বিধাতার যদি সেই ইচ্ছা তবে চিত্তবৃত্তিসকল অতল জলে ডুবাইব। আর কিছু চাই না, এক একবার তুমি এই পথে যাইও; দাসী ভাবিয়া এক একবার দেখা দিও, কেবল চক্ষুঃপরিতৃপ্তি করিব।"

নব। তুমি যবনী—পরস্ত্রী—তোমার সহিত এরূপ আলাপেও দোষ। তোমার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না।

ক্ষণেক নীরব। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে ঝটিকা বহিতেছিল। প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ নিস্পন্দ রহিলেন। নবকুমারের বস্ত্রাগ্রভাগ ত্যাগ করিলেন। কহিলেন, "যাও।"

নবকুমার চলিলেন। দুই চারি পদ চলিয়াছিলেন মাত্র, সহসা লুৎফ-উন্নিসা বাতোন্মূলিত পাদপের ন্যায় তাঁহার পদতলে পড়িলেন। বাহুলতায় চরণযুগল বদ্ধ করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন,

"নির্দ্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমি আমায় ত্যাগ করিও না।"

নবকুমার কহিলেন, "তুমি আবার আগ্রাতে ফিরিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।"

"এ জন্মে নহে।" লুৎফ-উন্নিসা তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সদর্পে কহিলেন, "এ জন্মে তোমার আশা ছাড়িব না।" মস্তক উন্নত করিয়া, ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া নবকুমারের মুখপ্রতি অনিমেষ আয়ত চক্ষুঃ স্থাপিত করিয়া, রাজরাজমোহিনী দাঁড়াইলেন। যে অনবনমনীয় গর্ব্ব হৃদয়াগ্নিতে গলিয়া গিয়াছিল, আবার তাহার জ্যোতিঃ স্ফুরিল ; যে অজেয় মানসিক শক্তি ভারতরাজ্যশাসনকল্পনায় ভীত হয় নাই, সেই শক্তি আবার প্রণয়দুর্ব্বল দেহে সঞ্চারিত হইল। ললাটদেশে ধমনী সকল স্ফীত হইয়া রমণীয় রেখা দেখা দিল ; জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু রবিকরমুখরিত সমুদ্রবারিবৎ ঝলসিতে লাগিল। নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল। স্রোতোবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিবিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গি করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "এ জন্মে না, তুমি আমারই হইবে।"

সেই কুপিতফণিনীমূর্ত্তি প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে নবকুমার ভীত হইলেন। লুৎফ-উন্নিসার অনির্ব্বচনীয় দেহমহিমা এখন যেরূপ দেখিতে পাইলেন, সেরূপ আর কখনও দেখেন নাই। কিন্তু সে শ্রী বজ্রসূচক বিদ্যুতের ন্যায় মনোমোহিনী ; দেখিয়া ভয় হইল। নবকুমার চলিয়া যান, তখন সহসা তাঁহার আর এক তেজোময়ী মূর্ত্তি মনে পড়িল। একদিন নবকুমার তাঁহার প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃতা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; এমনই তাহার চক্ষুঃ প্রদীপ্ত হইয়াছিল, এমনই ললাটে রেখাবিকাশ হইয়াছিল, এমনই নাসারন্ধ্র কাঁপিয়াছিল,

এমনই মস্তক হেলিয়াছিল। বহুকাল সে মূর্ত্তি মনে পড়ে নাই, এখন মনে পড়িল। অমনই সাদৃশ্য অনুভূত হইল। সংশয়াধীন হইয়া নবকুমার সঙ্কুচিত স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুমি কে?"

যবনীর নয়নতারা আরও বিস্ফারিত হইল। কহিলেন, "আমি পদ্মাবতী।"

উত্তর-প্রতীক্ষা না করিয়া লুৎফ-উন্নিসা স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। নবকুমারও অন্যমনে কিছু শঙ্কান্বিত হইয়া আপন আলয়ে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উপনগর-প্রান্তে

"—I am settled, and bend up
Each corporal agent to this terrible feat."

—*Macbeth*

কক্ষান্তরে গিয়া লুৎফ-উন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দুইদিন পর্য্যন্ত সেই কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন না। এই দুইদিনে তিনি নিজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিলেন। স্থির করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সূর্য্য অস্তাচলগামী। তখন লুৎফ-উন্নিসা পেষ্‌মনের সাহায্যে বেশভূষা করিতেছিলেন। আশ্চর্য্য বেশভূষা! রমণীবেশের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। যে বেশভূষা করিলেন, তাহা মুকুরে দেখিয়া পেষ্‌মনকে কহিলেন, "কেমন পেষ্‌মন, আর আমাকে চেনা যায়?"

পেষ্‌মন কহিল, "কার সাধ্য।"

লু। তবে আমি চলিলাম। আমার সঙ্গে যেন কোন দাসদাসী না যায়।

পেষ্‌মন কিছু সঙ্কুচিতচিত্তে কহিল, "যদি দাসীর অপরাধ ক্ষমা করেন, তবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।" লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "কি?" পেষ্‌মন কহিল, "আপনার উদ্দেশ্য কি?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "আপাততঃ কপালকুণ্ডলার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ। পরে তিনি আমার হইবেন।"

পে। বিবি! ভাল করিয়া বিবেচনা করুন, সে নিবিড় বন, রাত্রি আগতা; আপনি একাকিনী।

লুৎফ-উন্নিসা এ কথার কোন উত্তর না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন।

সপ্তগ্রামের যে জনহীন বনময় উপনগর-প্রান্তে নবকুমারের বসতি, সেইদিকে চলিলেন। তৎপ্রদেশে উপনীত হইতে রাত্রি হইয়া আসিল। নবকুমারের বাটীর অনতিদূরে এক নিবিড় বন আছে, পাঠক মহাশয়ের স্মরণ হইতে পারে। তাহারই প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। কিছুকাল বসিয়া যে দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার অননুভূতপূর্ব্ব সহায় উপস্থিত হইল।

লুৎফ-উন্নিসা যথায় বসিয়াছিলেন, তথা হইতে এক অনবরত সমানোচ্চারিত মনুষ্য-কণ্ঠনির্গত শব্দ শুনিতে পাইলেন। উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন যে, বনমধ্যে একটি আলো দেখা যাইতেছে। লুৎফ-উন্নিসা সাহসে পুরুষের অধিক ; যথায় আলো জ্বলিতেছে, সেই স্থানে গেলেন। প্রথমে বৃক্ষান্তরাল হইতে দেখিলেন, ব্যাপার কি ? দেখিলেন যে, যে আলো জ্বলিতেছিল, সে হোমের আলো ; যে শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন তাহা মন্ত্রপাঠের শব্দ। মন্ত্রমধ্যে একটি শব্দ বুঝিতে পারিলেন, সে একটী নাম। নাম শুনিবামাত্র লুৎফা-উন্নিসা হোমকারীর নিকটে গিয়া বসিলেন।

এক্ষণে তিনি তথায় বসিয়া থাকুন, পাঠক মহাশয় বহুকাল কপালকুণ্ডলার কোন সংবাদ পান নাই; সুতরাং কপালকুণ্ডলার সংবাদ আবশ্যক হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শয়নাগারে

"রাধিকার বেড়ী ভাঙ্গ, এ মম মিনতি।"

—ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

লুৎফ-উন্নিসার আগ্রা গমন করিতে এবং তথা হইতে সপ্তগ্রাম আসিতে প্রায় এক বৎসর গত হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা এক বৎসরের অধিককাল নবকুমারের গৃহিণী। যেদিন প্রদোষকালে লুৎফ-উন্নিসা কাননে, সেদিন কপালকুণ্ডলা অন্যমনে শয়নকক্ষে বসিয়া আছেন। পাঠক মহাশয় সমুদ্রতীরে আলুলায়িতকুন্তলা ভূষণহীনা যে কপাল-কুণ্ডলা দেখিয়াছিলেন, এ সে কপালকুণ্ডলা নহে। শ্যামাসুন্দরীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে ; স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিণী গৃহিণী হইয়াছে, এক্ষণে সেই অসংখ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল, ভুজঙ্গের বৃহতুল্য, আগুল্ফলম্বিত কেশরাজির পশ্চাদ্ভাগে স্থূলবেণীসম্বদ্ধ হইয়াছে।

বেণীরচনায়ও শিল্পপারিপাট্য লক্ষিত হইতেছে, কেশবিন্যাসে অনেক সূক্ষ্ম কারুকার্য্য শ্যামাসুন্দরীর বিন্যাস-কৌশলের পরিচয় দিতেছে। কুসুমদামও পরিত্যক্ত হয় নাই, চতুষ্পার্শে কিরীটমণ্ডলস্বরূপ বেণী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কেশের যে ভাগ বেণী-মধ্যে ন্যস্ত হয় নাই, তাহা যে শিরোপরি সর্ব্বত্র সমানোচ্চ হইয়া রহিয়াছে, এমত নহে। আকুঞ্চন প্রযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণতরঙ্গরেখায় শোভিত হইয়া রহিয়াছে। মুখ-মণ্ডল এখন আর কেশভারে অর্দ্ধলুক্কায়িত নহে; জ্যোতির্ম্ময় হইয়া শোভা পাইতেছে, কেবলমাত্র স্থানে স্থানে বন্ধনবিস্রংসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলকাগুচ্ছ তদুপরি স্বেদবিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। বর্ণ সেই অর্দ্ধপূর্ণশশাঙ্করশ্মিরুচির। এখন দুই কর্ণে হেমকর্ণভূষা দুলিতেছে; কণ্ঠে হিরন্ময় কণ্ঠমালা দুলিতেছে। বর্ণের নিকট সে সকল ম্লান হয় নাই, অর্দ্ধচন্দ্রকৌমুদীবসনা ধরণীর অঙ্গে নৈশকুসুমবৎ শোভা পাইতেছে। তাঁহার পরিধানে শুক্লাম্বর; সে শুক্লাম্বর অর্দ্ধচন্দ্রদীপ্ত আকাশমণ্ডলে অনিবিড় শুক্ল মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

বর্ণ সেইরূপ চন্দ্রার্দ্ধকৌমুদীময় বটে, কিন্তু যেন পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ সমল, যেন আকাশ-প্রান্তে কোথা হইতে কাল মেঘ দেখা দিয়াছে। কপালকুণ্ডলা একাকিনী বসিয়া-ছিলেন না; সখী শ্যামাসুন্দরী নিকটে বসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের পরস্পরের কথোপকথন হইতেছিল। তাহার কিয়দংশ পাঠক মহাশয়কে শুনিতে হইবে।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "ঠাকুরজামাই আর কতদিন এখানে থাকিবেন?"

শ্যামা কহিলেন, "কালি বিকালে চলিয়া যাইবে। আহা! আজি রাত্রে যদি ঔষধটী তুলিয়া রাখিতাম, তবু তারে বশ করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে পারিতাম। কালি রাত্রে বাহির হইয়াছিলাম বলিয়া নাথি ঝাঁটা খাইলাম, আর আজি বাহির হইব কি প্রকারে?"

ক। দিনে তুলিলে কেন হয় না?

শ্যা। দিনে তুলিলে ফল্‌বে কেন? ঠিক দুই প্রহর রাত্রে এলোচুলে তুলিতে হয়। তা ভাই মনের সাধ মনেই রহিল।

ক। আচ্ছা, আমি ত আজ দিনে সে গাছ চিনে এসেছি, আর যে বনে হয়, তাও দেখে এসেছি। তোমাকে আজি আর যেতে হবে না, আমি একা গিয়ে ঔষধ তুলিয়া আনিব।

শ্যা। একদিন যা হইয়াছে, তা হইয়াছে। রাত্রে তুমি আর বাহির হইও না।

ক। সেজন্য তুমি কেন চিন্তা কর? শুনেছ ত, রাত্রে বেড়ান আমার

ছেলেবেলা হইতে অভ্যাস। মনে ভেবে দেখ, যদি আমার সে অভ্যাস না থাকিত, তবে তোমার সঙ্গে আমার কখনও চাক্ষুষ হইত না।

শ্যা। সে ভয়ে বলি না, কিন্তু একা রাত্রে বনে বনে বেড়ান কি গৃহস্থের বউ-ঝির ভাল? দুইজনে গিয়াও এত তিরস্কার খাইলাম, তুমি একাকিনী গেলে কি রক্ষা থাকিবে?

ক। ক্ষতিই কি? তুমি কি মনে করিয়াছ যে, আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?

শ্যা। আমি তা মনে করি না। কিন্তু মন্দলোকে মন্দ বলে।

ক। বলুক, আমি তাতে মন্দ হব না।

শ্যা। তা ত হবে না—কিন্তু তোমাকে কেহ কিছু মন্দ বলিলে আমাদিগের অন্তঃকরণে ক্লেশ হবে।

ক। এমন অন্যায় ক্লেশ হইতে দিও না।

শ্যা। তাও আমি পারিব। কিন্তু দাদাকে কেন অসুখী করিবে?

কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর প্রতি নিজ স্নিগ্ধোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, "ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।"

ইহার পর আর কথা শ্যামাসুন্দরী ভাল বুঝিলেন না, আত্মকর্ম্মে উঠিয়া গেলেন।

কপালকুণ্ডলা প্রয়োজনীয় গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া ঔষধির অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। তখন রাত্রি প্রহরাতীত হইয়াছিল। নিশা সজ্যোৎস্না। নবকুমার বহিঃপ্রকোষ্ঠে বসিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা যে বাহির হইয়া যাইতেছেন, তাহা গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন। তিনিও গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া মৃন্ময়ীর হাত ধরিলেন। কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "কি?"

নবকুমার কহিলেন, "কোথা যাইতেছ?" নবকুমারের স্বরে তিরস্কারের সূচনামাত্র ছিল না।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ চাহে, আমি ঔষধের সন্ধানে যাইতেছি।"

নবকুমার পূর্ব্ববৎ কোমলস্বরে কহিলেন, "ভাল, কালি ত একবার গিয়েছিলে? আজি আবার কেন?"

ক। কালি খুঁজিয়া পাই নাই, আজি আবার খুঁজিব।

নবকুমার অতি মৃদুভাবে কহিলেন, "ভাল, দিনে খুঁজিলেও ত হয়?" নবকুমারের স্বর স্নেহপরিপূর্ণ।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "দিবসে ঔষধ ফলে না।"

নব। কাজ কি তোমার ঔষধ তল্লাসে? আমাকে গাছের নাম বলিয়া দাও। আমি ঔষধ তুলিয়া আনিয়া দিব।

ক। আমি গাছ দেখিলে চিনিতে পারি, কিন্তু নাম জানি না। আর তুমি তুলিলে ফলিবে না। স্ত্রীলোকে এলোচুলে তুলিতে হয়। তুমি পরের উপকারের বিঘ্ন করিও না।

কপালকুণ্ডলা এই কথা অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন; নবকুমার আর আপত্তি করিলেন না। বলিলেন, "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

কপালকুণ্ডলা গর্ব্বিতবচনে কহিলেন, "আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কিনা স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।"

নবকুমার আর কিছু বলিতে পারিলেন না। নিশ্বাসহকারে কপালকুণ্ডলার হাত ছাড়িয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাননতলে

"———Tender is the night,
And haply the Queen moon is on her throne,
Clustered around by all her starry fays;
But here there is no light."

—*Keats*.

সপ্তগ্রামের এই ভাগ যে বনময়, তাহা পূর্ব্বেই কতক কতক উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রামের কিছু দূরে নিবিড় বন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী এক সঙ্কীর্ণ বন্য পথে ঔষধির সন্ধানে চলিলেন। যামিনী মধুরা একান্ত শব্দমাত্রবিহীনা। মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধরশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেত মেঘমণ্ডলসকল উত্তীর্ণ হইতেছে; পৃথিবীতলে বন্য বৃক্ষলতাসকল তদ্রূপ নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে, নীরবে বৃক্ষপত্র-সকল সে কিরণের প্রতিঘাত করিতেছে, নীরবে লতাগুল্মমধ্যে শ্বেত কুসুমদল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। পশুপক্ষী নীরব। কেবল কোথাও কদাচিৎ মাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দনশব্দ, কোথাও ক্বচিৎ শুষ্কপত্রপাতশব্দ, কোথাও

তলস্থ শুষ্কপত্রমধ্যে উরগজাতীয় জীবের ক্বচিৎ গতিজনিতশব্দ ; ক্বচিৎ অতিদূরস্থ কুক্কুররব। এমত নহে যে, একেবারে বায়ু বহিতেছিল না, মধুমাসের দেহস্নিগ্ধকর বায়ু অতিমন্দ ; একান্ত নিঃশব্দ বায়ুমাত্র ; তাহাতে কেবলমাত্র বৃক্ষের সর্ব্বাগ্রভাগরূঢ় পত্রগুলি হেলিতেছিল ; কেবলমাত্র আভূমিপ্রণত শ্যামা লতা দুলিতেছিল ; কেবলমাত্র নীলাম্বরসঞ্চারী ক্ষুদ্র শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি ধীরে ধীরে চলিতেছিল। কেবলমাত্র তদ্রূপ বায়ুসংসর্গে সম্ভুক্ত পূর্ব্বসুখের অস্পষ্ট স্মৃতি হৃদয়ে অল্প জাগরিত হইতেছিল।

কপালকুণ্ডলার সেইরূপ পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছিল ; বালিয়াড়ির শিখরে যে সাগরবারিবিন্দুসংস্পৃষ্ট মলয়ানীল তাঁহার লম্বালকমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিত, তাহা মনে পড়িল, অমল নীলানন্ত গগনপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন ; সেই অমল নীলানন্ত গগনরূপী সমুদ্র মনে পড়িল, কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বস্মৃতি সমালোচনায় অন্যমনা হইয়া চলিলেন।

অন্যমনে যাইতে যাইতে কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন, কপালকুণ্ডলা তাহা ভাবিলেন না। যে পথে যাইতেছিলেন, তাহা ক্রমে অগম্য হইয়া আসিল ; বন নিবিড়তর হইল ; মাথার উপর বৃক্ষশাখাবিন্যাসে চন্দ্রালোক প্রায় একেবারে রুদ্ধ হইয়া আসিল ; ক্রমে আর পথ দেখা যায় না। পথের অলক্ষ্যতায় প্রথমে কপালকুণ্ডলা চিন্তামগ্নতা হইতে উত্থিত হইলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এই নিবিড় বনমধ্যে আলো জ্বলিতেছে। লুৎফ-উন্নিসা পূর্ব্বে এই আলো দেখিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বাভ্যাসফলে এ সকল সময়ে ভয়হীন অথচ কৌতূহলময়ী। ধীরে ধীরে সেই দীপজ্যোতির অভিমুখে গেলেন। দেখিলেন যথায় আলো জ্বলিতেছে, তথায় কেহ নাই, কিন্তু তাহার অনতিদূরে বননিবিড়তা হেতু দূর হইতে অদৃশ্য একটী ভগ্নগৃহ আছে। গৃহটী ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র, অতি সামান্য ; তাহাতে একটী মাত্র ঘর। সেই ঘর হইতে মনুষ্যকথোপকথনশব্দ নির্গত হইতেছিল। কপালকুণ্ডলা নিঃশব্দপদক্ষেপে গৃহসন্নিধানে গেলেন। গৃহের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বোধ হইল, দুই মনুষ্য সাবধানে কথোপকথন করিতেছে। প্রথমে কথোপকথন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে ক্রমে চেষ্টাজনিত কর্ণের তীক্ষ্ণতা জন্মিলে নিম্নলিখিত মত কথা শুনিতে পাইলেন।

একজন কহিতেছে, "আমার অভীষ্ট মৃত্যু, ইহাতে তোমার অভিমত না হয়, আমি তোমার সাহায্য করিব না, তুমিও আমার সহায়তা করিও না।"

অপর ব্যক্তি কহিল, "আমিও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহি ; কিন্তু যাবজ্জীবন জন্য ইহার নির্ব্বাসন হয়, তাহাতে আমি সম্মত আছি। কিন্তু হত্যার কোন উদ্যোগ আমা হইতে হইবে না ; বরং তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিব।"

প্রথমালাপকারী কহিল, "তুমি অতি অবোধ, অজ্ঞান। তোমায় কিছু জ্ঞানদান করিতেছি। মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর। অতি গূঢ় বৃত্তান্ত বলিব। চতুর্দ্দিক একবার দেখিয়া আইস, যেন মনুষ্যশ্বাস শুনিতে পাইতেছি।"

বাস্তবিক কপালকুণ্ডলা কথোপকথন উত্তমরূপে শুনিবার জন্য কক্ষপ্রাচীরের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এবং তাঁহার আগ্রহাতিশয় ও শঙ্কার কারণে ঘন ঘন গুরুশ্বাস বহিতেছিল।

সমভিব্যাহারীর কথায় গৃহমধ্য হইতে একব্যক্তি বাহিরে আসিলেন এবং আসিয়াই কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইলেন। কপালকুণ্ডলাও পরিষ্কার চন্দ্রালোকে আগন্তুক পুরুষের অবয়ব সুস্পষ্ট করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া ভীতা হইবেন, কি প্রফুল্লিতা হইবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। দেখিলেন, আগন্তুক ব্রাহ্মণ-বেশী; সামান্য ধুতি পরা; গাত্র উত্তরীয়ে উত্তমরূপে আচ্ছাদিত। ব্রাহ্মণকুমার অতি কোমলবয়স্ক; মুখমণ্ডলে বয়শ্চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। মুখখানি পরম সুন্দর, সুন্দরী রমণীমুখের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু রমণীদুর্ল্লভতেজোগর্ব্ববিশিষ্ট। তাঁহার কেশগুলি সচরাচর পুরুষদিগের কেশের ন্যায় ক্ষৌরকার্য্যাবিশেষাত্মক মাত্র নহে, স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় অচ্ছিন্নাবস্থায় উত্তরীয় প্রচ্ছন্ন করিয়া পৃষ্ঠদেশে, অংসে, বাহুদেশে, কদাচিৎ বক্ষে সংসর্পিত হইয়া পড়িয়াছে। ললাট প্রশস্ত, স্ফীত, মধ্যস্থলে একমাত্র শিরাপ্রকাশশোভিত। চক্ষু দুইটি বিদ্যুত্তেজঃপরিপূর্ণ। কোষশূন্য এক দীর্ঘ তরবারি হস্তে ছিল। কিন্তু এ রূপরাশিমধ্যে এক ভীষণ ভাব ব্যক্ত হইতেছিল। হেমকান্ত বর্ণে যেন কোন করাল কামনার ছায়া পড়িয়াছিল। অন্তস্তল পর্য্যন্ত অন্বেষণক্ষম কটাক্ষ দেখিয়া কপালকুণ্ডলার ভীতি সঞ্চার হইল।

উভয়ে উভয়ের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। প্রথমে কপালকুণ্ডলা নয়ন-পল্লব নিক্ষিপ্ত করিলেন। কপালকুণ্ডলা নয়নপল্লব নিক্ষিপ্ত করাতে আগন্তুক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

যদি একবৎসর পূর্ব্বে হিজলীর কিয়াবনে কপালকুণ্ডলার প্রতি এ প্রশ্ন হইত, তবে তিনি তৎক্ষণেই সঙ্গত উত্তর দিতেন। কিন্তু এখন কপালকুণ্ডলা কতক দূর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না হইয়াছিলেন, সুতরাং সহসা উত্তর করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে নিরুত্তর দেখিয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, "কপাল-কুণ্ডলা! তুমি রাত্রে এ নিবিড় বনমধ্যে কি জন্য আসিয়াছ?"

অজ্ঞাত রাত্রিচর পুরুষের মুখে আপন নাম শুনিয়া কপালকুণ্ডলা অবাক্ হইলেন,

কিছু ভীতাও হইলেন। সুতরাং সহসা কোন উত্তর তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

ব্রাহ্মণবেশী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছ?"

সহসা কপালকুণ্ডলা বাক্‌শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি উত্তর না দিয়া কহিলেন, "আমিও তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ কাননমধ্যে তোমরা দুজনে এ নিশীথে কি কুপরামর্শ করিতেছিলে?"

ব্রাহ্মণবেশী কিছুকাল নিরুত্তরে চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। যেন কোন নূতন ইষ্টসিদ্ধির উপায় তাঁহার চিত্তমধ্যে উপস্থিত হইল। তিনি কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ করিলেন এবং হস্ত ধরিয়া ভগ্নগৃহ হইতে কিছু দূরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা অতি ক্রোধে হস্ত মুক্ত করিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণবেশী অতি মৃদু স্বরে কপালকুণ্ডলার কানের কাছে কহিলেন, "চিন্তা কি? আমি পুরুষ নহি।"

কপালকুণ্ডলা আরও চমৎকৃত হইলেন। এ কথায় তাঁহার কতক বিশ্বাস হইল, সম্পূর্ণ বিশ্বাসও হইল না। তিনি ব্রাহ্মণবেশধারিণীর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ভগ্নগৃহ হইতে অদৃশ্য স্থানে গিয়া ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে কর্ণে কর্ণে কহিলেন, "আমরা যে কুপরামর্শ করিতেছিলাম, তাহা শুনিবে? সে তোমারই সম্বন্ধে।"

কপালকুণ্ডলার ভয় এবং আগ্রহ অতিশয় বাড়িল। কহিলেন, "শুনিব।"

ছদ্মবেশী কহিলেন, "তবে যতক্ষণ না প্রত্যাগমন করি, ততক্ষণ এইস্থানে প্রতীক্ষা কর।"

এই বলিয়া ছদ্মবেশিনী ভগ্নগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; কপালকুণ্ডলা কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার কিছু ভয় জন্মিয়াছিল। এক্ষণে একাকিনী অন্ধকার বনমধ্যে বসিয়া থাকাতে উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। বিশেষ এই ছদ্মবেশী তাঁহাকে কি অভিপ্রায়ে তথায় বসাইয়া রাখিয়া গেল, তাহা কে বলিতে পারে? হয়ত সুযোগ পাইয়া আপনার মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। এদিকে ব্রাহ্মণবেশীর প্রত্যাগমনে অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা আর বসিতে পারিলেন না; উঠিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

তখন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল; কাননতলে যে সামান্য আলো ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে পারিলেন না। শীঘ্রপদে কাননভ্যিন্তর হইতে বাহিরে আসিতে

লাগিলেন। আসিবার সময় যেন পশ্চাদ্ভাগে অপর ব্যক্তির পদক্ষেপধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, ব্রাহ্মণবেশী তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছেন। বনত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষুদ্র বনপথে আসিয়া বাহির হইলেন। তথায় তাদৃশ অন্ধকার নহে; দৃষ্টিপথে মনুষ্য থাকিলে দেখা যায়। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না; অতএব দ্রুতপদে চলিলেন। কিন্তু আবার স্পষ্ট মনুষ্যগতিশব্দ শুনিতে পাইলেন। আকাশ নীলকাদম্বিনীতে ভীষণতর হইল। কপালকুণ্ডলা আরও দ্রুত চলিলেন। গৃহ অনতিদূরে, কিন্তু গৃহপ্রাপ্তি হইতে না হইতেই প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি ভীষণরবে প্রঘোষিত হইল। কপালকুণ্ডলা দৌড়িলেন। পশ্চাতে যে আসিতেছিল, সেও যেন দৌড়িল এমত শব্দ বোধ হইল। গৃহ দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি কপালকুণ্ডলার মস্তকের উপর দিয়া প্রধাবিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব্দ এবং অশনিসম্পাতশব্দ হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া গৃহে আসিলেন। প্রাঙ্গণভূমি পার হইয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে উঠিলেন। দ্বার তাঁহার জন্য খোলা ছিল। দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রাঙ্গণের দিকে সম্মুখ ফিরিলেন। বোধ হইল, যেন প্রাঙ্গণভূমিতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। একবার বিদ্যুতেই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সে সাগরতীরপ্রবাসী সেই কাপালিক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বপ্নে

"I had a dream which was not at all a dream."

—*Byron.*

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিলেন। ধীরে ধীরে শয়নাগারে আসিলেন, ধীরে ধীরে পালঙ্কে শয়ন করিলেন। মনুষ্যহৃদয় অনন্ত সমুদ্র, যখন তদুপরি ক্ষিপ্ত বায়ুগণ সমর করিতে থাকে, কে তাহার তরঙ্গমালা গণিতে পারে? কপালকুণ্ডলার হৃদয়সমুদ্রে যে তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, কে তাহা গণিবে?

সে রাত্রে নবকুমার হৃদয়বেদনায় অন্তঃপুরে আইসেন নাই। শয়নাগারে একাকিনী কপালকুণ্ডলা শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। প্রবলবায়ুতাড়িত

বারিধারাপরিসিঞ্চিত জটাজূটবেষ্টিত সেই মুখমণ্ডল অন্ধকারমধ্যেও চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, কাপালিকের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া তিনি চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল ; কাপালিক নিবিড় বনমধ্যে যে সকল পৈশাচিক কার্য্য করিতেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল ; তৎকৃত ভৈরবীপূজা, নবকুমারের বন্ধন, এ সকল মনে পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা শিহরিয়া উঠিলেন। অদ্যকার রাত্রের সকল ঘটনাও মনোমধ্যে আসিতে লাগিল। শ্যামার ঔষধিকামনা, নবকুমারের নিষেধ, তাঁহার প্রতি কপালকুণ্ডলার তিরস্কার, তৎপরে অরণ্যের জ্যোৎস্নাময়ী শোভা, কাননতলে অন্ধকার, সেই অরণ্যমধ্যে যে সহচর পাইয়াছিলেন, তাহার ভীমকান্তগুণময় রূপ, সকলই মনে পড়িতে লাগিল।

পূর্ব্বদিকে ঊষার মুকুটজ্যোতিঃ প্রকটিত হইল ; তখন কপালকুণ্ডলার অল্প তন্দ্রা আসিল। সেই অপ্রগাঢ় নিদ্রায় কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি যেন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সাগরহৃদয়ে তরণী আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। তরণী সুশোভিত ; তাহাতে বসন্ত রঙ্গের পতাকা উড়িতেছে ; নাবিকেরা ফুলের মালা গলায় দিয়া বাহিতেছে। রাধাশ্যামের অনন্ত প্রণয়গীত করিতেছে। পশ্চিমগগন হইতে সূর্য্য স্বর্ণধারা বৃষ্টি করিতেছে। স্বর্ণধারা পাইয়া সমুদ্র হাসিতেছে ; আকাশ-মণ্ডলে মেঘগণ সেই স্বর্ণবৃষ্টিতে ছুটাছুটি করিয়া স্নান করিতেছে। অকস্মাৎ রাত্রি হইল, সূর্য্য কোথায় গেল। স্বর্ণমেঘসকল কোথায় গেল। নিবিড়নীল কাদম্বিনী আসিয়া আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিল ; আর সমুদ্রে দিক্ নিরূপণ হয় না। নাবিকেরা তরী ফিরাইল। কোন্ দিকে বাহিবে, স্থিরতা পায় না। তাহারা গীত বন্ধ করিল, গলার মালা সকল ছিঁড়িয়া ফেলিল। বসন্ত রঙ্গের পতাকা আপনি খসিয়া জলে পড়িয়া গেল। বাতাস উঠিল ; বৃক্ষপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল ; তরঙ্গমধ্য হইতে একজন জটজূটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বামহস্তে তুলিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল। এমত সময়ে সেই ভীমকান্তশ্রীময় ব্রাহ্মণবেশধারী আসিয়া তরী ধরিয়া রহিল। সে কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় রাখি, কি নিমগ্ন করি ?" অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার মুখ হইতে বাহির হইল, "নিমগ্ন কর।" ব্রাহ্মণবেশী নৌকা ছাড়িয়া দিল। তখন নৌকাও শব্দময়ী হইল, কথা কহিয়া উঠিল। নৌকা কহিল, "আমি আর এ ভার বহিতে পারি না, আমি পাতালে প্রবেশ করি।" ইহা কহিয়া নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল।

ঘর্ম্মাক্তকলেবরা হইয়া কপালকুণ্ডলা স্বপ্নোত্থিতা হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন; দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে—গবাক্ষ মুক্ত রহিয়াছে, তন্মধ্য দিয়া বসন্ত-বায়ুস্রোত প্রবেশ করিতেছে। মন্দান্দোলিত বৃক্ষশাখায় পক্ষিগণ কূজন করিতেছে। সেই গবাক্ষের উপর কতকগুলি মনোহর বন্যলতা সুবাসিত কুসুমসহিত দুলিতেছে। কপালকুণ্ডলা নারীস্বভাববশতঃ লতাগুলি গুছাইয়া লইতে লাগিলেন। তাহা সুশৃঙ্খল করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে তাহার মধ্য হইতে একখানি লিপি বাহির হইল। কপালকুণ্ডলা অধিকারীর ছাত্র, পড়িতে পারিতেন। নিম্নোক্তমত পাঠ করিলেন—

"অদ্য সন্ধার পর কল্য রাত্রের ব্রাহ্মণকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবা। তোমার নিজ সম্পর্কীয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে, তাহা শুনিবে।

অহং ব্রাহ্মণবেশী।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃতসঙ্কেতে

"———I will have grounds
More relative than this."

—*Hamlet.*

কপালকুণ্ডলা সেদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনন্যচিন্তা হইয়া কেবল ইহাই বিবেচনা করিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ বিধেয় কি না। পতিব্রতা যুবতীর পক্ষে রাত্রিকালে নির্জ্জনে অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ যে অবিধেয়, ইহা ভাবিয়া তাঁহার মনে সঙ্কোচ জন্মে নাই; তদ্বিষয়ে তাঁহার স্থির সিদ্ধান্তই ছিল যে, সাক্ষাতের উদ্দেশ্য দূষ্য না হইলে এমত সাক্ষাতের দোষ নাই—পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার, স্ত্রী পুরুষে সাক্ষাতের উভয়েরই সেইরূপ অধিকার উচিত বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল; বিশেষ ব্রাহ্মণবেশী পুরুষ কি না তাহাতে সন্দেহ। সুতরাং সে সঙ্কোচ অনাবশ্যক; কিন্তু এ সাক্ষাতে মঙ্গল, কি অমঙ্গল জন্মিবে, তাহাই অনিশ্চিত বলিয়া কপালকুণ্ডলা এতদূর সঙ্কোচ করিতেছিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণবেশীর কথোপকথন, পরে কাপালিকের দর্শন, তৎপরে স্বপ্ন, এই সকল হেতুতে কপালকুণ্ডলার নিজ অমঙ্গল যে অদূরবর্ত্তী, এমত সন্দেহ প্রবল হইয়াছিল। সেই অমঙ্গল যে কাপালিকের আগমনসহিত সম্বন্ধমিলিত, এমত সন্দেহও অমূলক বোধ হইল না। এই ব্রাহ্মণবেশীকে তাঁহারই সহচর বোধ হইতেছে—অতএব

তাহার সহিত সাক্ষাতে সেই আশঙ্কার বিষয়ীভূত অমঙ্গলে পতিতও হইতে পারেন। সে ত স্পষ্টই বলিয়াছে যে, কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধেই পরামর্শ হইতেছিল। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, ইহা হইতে তন্নিরাকরণ-স্থচনা হইবে। ব্রাহ্মণকুমার এক ব্যক্তির সহিত গোপনে পরামর্শ করিতেছিল, সে ব্যক্তিকে এই কাপালিক বলিয়া বোধ হয়। সেই কথোপকথনে কাহারও মৃত্যুর সঙ্কল্প প্রকাশ পাইতেছিল, নিতান্ত পক্ষে চির-নির্ব্বাসন। সে কাহার? ব্রাহ্মণবেশী ত স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধেই কুপরামর্শ হইতেছিল। তবে তাহারই মৃত্যু বা তাহারই চিরনির্ব্বাসন কল্পনা হইতে-ছিল। হইলই বা! তারপর স্বপ্ন;—সে স্বপ্নের তাৎপর্য্য কি? স্বপ্নে ব্রাহ্মণবেশী মহাবিপত্তিকালে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কার্য্যেও তাহাই ফলিতেছে। ব্রাহ্মণবেশী সকল ব্যক্ত করিতে চাহিতেছেন। তিনি স্বপ্নে বলিয়াছেন, "নিমগ্ন কর।" কার্য্যেও কি সেইরূপ বলিবেন? না, না,—ভক্তবৎসলা ভবানী অনুগ্রহ করিয়া স্বপ্নে তাঁহার রক্ষাহেতু উপদেশ দিয়াছেন, ব্রাহ্মণবেশী আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চাহিতেছেন; তাঁহার সাহায্য ত্যাগ করিলে নিমগ্ন হইবেন। অতএব কপালকুণ্ডলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন কি না, তাহাতে সন্দেহ; কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের সহিত আমাদিগের সংস্রব নাই। কপালকুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না—স্থতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। কৌতূহলপরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্তরূপরাশিদর্শন-লোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, নৈশবনভ্রমণবিলাসিনী সন্ন্যাসিপালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভবানী-ভক্তিভাববিমোহিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, জলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পর গৃহকর্ম্ম কতক কতক সমাপন করিয়া কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বমত বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কপালকুণ্ডলা যাত্রাকালে শয়নাগারে প্রদীপটী উজ্জ্বল করিয়া গেলেন। তিনি যেমন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন, অমনি গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেল।

যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা এ কথা বিস্মৃত হইলেন—ব্রাহ্মণবেশী কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছিলেন? এইজন্য পুনর্ব্বার লিপিপাঠের আবশ্যক হইল। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যেস্থানে প্রাতে লিপি রাখিয়াছিলেন, সেইস্থানে অন্বেষণ করিলেন, সেস্থানে লিপি পাইলেন না। স্মরণ হইল যে, কেশবন্ধন সময়ে ঐ লিপি সঙ্গে রাখিবার জন্য কবরীমধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। অতএব কবরীমধ্যে অঙ্গুলি দিয়া সন্ধান করিলেন। অঙ্গুলিতে লিপি স্পর্শ না হওয়াতে কবরী আলুলায়িত

করিলেন, তথাপি সে লিপি পাইলেন না। তখন গৃহের অন্যান্য স্থানে তত্ত্ব করিলেন। কোথাও না পাইয়া পরিশেষে পূর্ব্বসাক্ষাৎস্থানেই সাক্ষাৎ সম্ভব সিদ্ধান্ত করিয়া পুনর্যাত্রা করিলেন। অনবকাশপ্রযুক্ত সে বিশাল কেশরাশি পুনর্বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই, অতএব আজি কপালকুণ্ডলা অনূঢ়াকালের মত কেশমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৃহদ্বারে

"Stand you awhile apart,
Confine yourself but in a patient list."

—*Othello.*

যখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কপালকুণ্ডলা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, তখন লিপি কবরীবন্ধনচ্যুত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা তাহা জানিতে পারেন নাই। নবকুমার তাহা দেখিয়াছিলেন। কবরী হইতে পত্র খসিয়া পড়িল দেখিয়া নবকুমার বিস্মিত হইলেন। কপালকুণ্ডলা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলে লিপি খুলিয়া বাহিরে গিয়া পাঠ করিলেন। সে লিপি পাঠ করিয়া একই সিদ্ধান্ত সম্ভবে। "যে কথা কাল শুনিতে চাহিয়াছিলে, সে কথা শুনিবে।" সে কি? প্রণয়-কথা? ব্রাহ্মণবেশী মৃন্ময়ীর উপপতি? যে ব্যক্তি পূর্ব্বরাত্রের বৃত্তান্ত অনবগত, তাহার পক্ষে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত সম্ভবে না।

পতিব্রতা, স্বামীর সহগমনকালে অথবা অন্য কারণে যখন কেহ জীবিতে চিতারোহণ করিয়া চিতায় অগ্নি সংলগ্ন করে, তখন প্রথমে ধূমরাশি আসিয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করে; দৃষ্টিলোপ করে; অন্ধকার করে; পরে ক্রমে কাষ্ঠরাশি জ্বলিতে আরম্ভ হইলে প্রথমে নিম্ন হইতে সর্পজিহ্বার ন্যায় দুই একটী শিখা আসিয়া অঙ্গের স্থানে স্থানে দংশন করে, পরে সশব্দে অগ্নিজ্বালা চতুর্দিক্ হইতে আসিয়া বেষ্টন করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যাপিতে থাকে; শেষে প্রচণ্ড রবে অগ্নিরাশি গগনমণ্ডল জ্বালাময় করিয়া মস্তক অতিক্রমপূর্ব্বক ভস্মরাশি করিয়া ফেলে।

নবকুমারের লিপি পাঠ করিয়া সেইরূপ হইল। প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না; পরে সংশয়, পরে নিশ্চয়তা, শেষে জ্বালা। মনুষ্যহৃদয় ক্লেশাধিক্য বা সুখাধিক্য একেবারে গ্রহণ করিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করে। নবকুমারকে প্রথমে ধূম-রাশি বেষ্টন করিল; পরে বহ্নিশিখা হৃদয় তাপিত করিতে লাগিল; শেষে বহ্নিশিখাতে হৃদয় ভস্মীভূত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই নবকুমার দেখিয়াছিলেন যে, কপাল-কুণ্ডলা কোন কোন বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইয়াছেন। বিশেষ কপালকুণ্ডলা তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে একাকিনী যাইতেন; যাহার তাহার সহিত যথেচ্ছ আচরণ করিতেন; অধিকন্তু তাঁহার বাক্য হেলন করিয়া নিশীথে একাকিনী বনভ্রমণ করিতেন। আর কেহ ইহাতে সন্দিহান হইত, কিন্তু নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহ উত্থাপিত হইলে চিরানিবার্য্য বৃশ্চিক-দংশনবৎ হইবে জানিয়া, তিনি একদিনের তরে সন্দেহকে স্থানদান করেন নাই। অদ্যও সন্দেহকে স্থান দিতেন না, কিন্তু অদ্য সন্দেহ নহে, প্রতীতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

যন্ত্রণার প্রথম বেগের শমতা হইলে, নবকুমার নীরবে বসিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। রোদন করিয়া কিছু সুস্থির হইলেন। তখন তিনি কিংকর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। আজ তিনি কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না। কপালকুণ্ডলা যখন সন্ধ্যার সময় বনাভিমুখে যাত্রা করিবেন, তখন গোপনে তাঁহার অনুসরণ করিবেন, কপালকুণ্ডলার মহাপাপ প্রত্যক্ষীভূত করিবেন, তাহার পর এ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না; আপনার প্রাণসংহার করিবেন। না করিয়া কি করিবেন?—এ জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহিতে তাঁহার শক্তি হইবে না।

এই স্থির করিয়া কপালকুণ্ডলার বহির্গমনপ্রতীক্ষায় তিনি খড়কীদ্বারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। কপালকুণ্ডলা বহির্গতা হইয়া কিছু দূরে গেলে নবকুমারও বহির্গত হইতেছিলেন; এমন সময়ে কপালকুণ্ডলা লিপির জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, দেখিয়া নবকুমারও সরিয়া গেলেন। শেষে কপালকুণ্ডলা পুনর্ব্বার বাহির হইয়া কিছুদূর গমন করিলে নবকুমার আবার তদনুগমনে বাহির হইতেছিলেন এমত সময়ে দেখিলেন, দ্বারদেশ আবৃত করিয়া এক দীর্ঘাকার পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

কে সে ব্যক্তি, কেন দাঁড়াইয়া, জানিতে নবকুমারের কিছুমাত্র ইচ্ছা হইল না। তাহার প্রতি চাহিয়াও দেখিলেন না। কেবল কপালকুণ্ডলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য ব্যস্ত। অতএব পথমুক্তির জন্য আগন্তুকের বক্ষে হস্ত দিয়া তাড়িত করিলেন; কিন্তু তাহাকে সরাইতে পারিলেন না।

নবকুমার কহিলেন, "কে তুমি? দূর হও—আমার পথ ছাড়।"

আগন্তুক কহিল, "কে আমি, তুমি কি চেন না ?"

শব্দ সমুদ্রনাদবৎ কর্ণে লাগিল। নবকুমার চাহিয়া দেখিলেন ; দেখিলেন, সে পূর্ব্বপরিচিত জটাজূটধারী কাপালিক।

নবকুমার চমকিয়া উঠিলেন ; কিন্তু ভীত হইলেন না। সহসা তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল—কহিলেন,

"কপালকুণ্ডলা কি তোমার সহিত সাক্ষাতে যাইতেছে ?"

কাপালিক কহিল, "না।"

জ্বালিতমাত্র আশার প্রদীপ তখনই নির্ব্বাণ হওয়াতে নবকুমারের দুঃখ পূর্ব্ববৎ মেঘময় অন্ধকারাবিষ্ট হইল। কহিলেন, "তবে তুমি পথ মুক্ত কর।"

কাপালিক কহিল, "পথ মুক্ত করিতেছি, কিন্তু তোমার সহিত আমার কিছু কথা আছে—অগ্রে শ্রবণ কর।

নবকুমার কহিলেন, "তোমার সহিত আমার কি কথা ? তুমি আবার আমার প্রাণনাশের জন্য আসিয়াছ ? প্রাণ গ্রহণ কর, আমি এবার কোন ব্যাঘাত করিব না। তুমি এক্ষণে অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি। কেন আমি দেবতুষ্টির জন্য শরীর না দিলাম ? এক্ষণে তাহার ফলভোগ করিলাম। যে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, সেই আমাকে নষ্ট করিল ! কাপালিক ! আমাকে এবার অবিশ্বাস করিও না। আমি এখনই আসিয়া তোমাকে আত্মসমর্পণ করিব।"

কাপালিক কহিল, "আমি তোমার প্রাণবধার্থ আসি নাই। ভবানীর তাহা ইচ্ছা নহে। আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা তোমার অনুমোদিত হইবে। বাটীর ভিতরে চল, আমি যাহা বলি তাহা শ্রবণ কর।"

নবকুমার কহিলেন, "এক্ষণে নহে। সময়ান্তরে তাহা শ্রবণ করিব, তুমি এখন অপেক্ষা কর ; আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে—সাধন করিয়া আসিতেছি।"

কাপালিক কহিল, "বৎস ! আমি সকলই অবগত আছি, তুমি সেই পাপিষ্ঠার অনুসরণ করিবে ; সে যথায় যাইবে, আমি তাহা অবগত আছি। আমি তোমাকে সেস্থানে সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া যাইব। যাহা দেখিতে চাহ দেখাইব—এক্ষণে আমার কথা শ্রবণ কর। কোন ভয় করিও না।"

নবকুমার কহিলেন, "আর তোমাকে আমার কোন ভয় নাই। আইস।"

এই বলিয়া নবকুমার কাপালিককে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া আসন দিলেন এবং স্বয়ং উপবেশন করিয়া বলিলেন, "বল।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুনরালাপে

"তদ্‌গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যম্।"

—কুমারসম্ভব।

কাপালিক আসন গ্রহণ করিয়া দুই বাহু নবকুমারকে দেখাইলেন। নবকুমার দেখিলেন, উভয় বাহু ভগ্ন।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, যে রাত্রে কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমার সমুদ্রতীর হইতে পলায়ন করেন, সেই রাত্রে তাঁহাদিগের অন্বেষণ করিতে করিতে কাপালিক বালিয়াড়ির শিখরচ্যুত হইয়া পড়িয়া যান। পতনকালে দুই হস্তে ভূমি ধারণ করিয়া শরীর রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহাতে শরীর রক্ষা হইল বটে, কিন্তু দুইটী হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। কাপালিক এ সকল বৃত্তান্ত নবকুমারের নিকট বিবরিত করিয়া কহিলেন, "বাহুদ্বারা নিত্যক্রিয়া সকল নির্বাহের কোন বিশেষ বিঘ্ন হয় না। কিন্তু ইহাতে আর কিছুমাত্র বল নাই। এমন কি, ইহার দ্বারা কাষ্ঠাহরণে কষ্ট হয়।"

পরে কহিতে লাগিলেন, "ভূপতিত হইয়াই আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আমার করদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে, আর আর অঙ্গ অভগ্ন আছে, এমত নহে, আমি পতনমাত্র মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। প্রথমে অবিচ্ছেদে অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম। পরে ক্ষণে সজ্ঞান, ক্ষণে অজ্ঞান রহিলাম। কয়দিন যে আমি এ অবস্থায় রহিলাম, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় দুই রাত্রি একদিন হইবে। প্রভাতকালে আমার সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পুনরাবির্ভূত হইল। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমি এক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। যেন ভবানী—" বলিতে বলিতে কাপালিকের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। "যেন ভবানী আসিয়া আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন। ভ্রূকুটি করিয়া আমায় তাড়না করিতেছেন; কহিতেছেন, 'রে দুরাচার! তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পূজার এ বিঘ্ন জন্মাইয়াছে; তুই এ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এতদিন আমার পূজা করিস্ নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তোর পূর্ব্বকৃত্যফল বিনষ্ট হইল। আমি তোর নিকট আর কখন পূজা গ্রহণ করিব না।' তখন আমি রোদন করিয়া জননীর চরণে লুণ্ঠিত হইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, 'ভদ্র! ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে। যতদিন না পার, আমার পূজা করিও না।'

"কতদিনে বা কি প্রকারে আমি আরোগ্য প্রাপ্ত হইলাম, তাহা আমার বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। কালে আরোগ্য পাইয়া দেবীর আজ্ঞা পালন করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম যে, এই বাহুদ্বয়ে শিশুর বলও নাই। বাহুবল ব্যতীত যত্ন সফল হইবার নহে। অতএব ইহাতে একজন সহকারী আবশ্যক হইল। কিন্তু মনুষ্যবর্গ ধর্ম্মে অল্পমতি—বিশেষ কলির প্রাবল্যে যবন রাজা, পাপাত্মক রাজশাসনের ভয়ে কেহই এমত কার্য্যে সহচর হয় না। বহু সন্ধানে আমি পাপীয়সীর আবাসস্থান জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু বাহুবলের অভাব হেতু ভবানীর আজ্ঞা পালন করিতে পারি নাই। কেবল মানসসিদ্ধির জন্য তন্ত্রের বিধানানুসারে ক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকি মাত্র। কল্য রাত্রে নিকটস্থ বনে হোম করিতেছিলাম, স্বচক্ষে দেখিলাম কপালকুণ্ডলার সহিত ব্রাহ্মণকুমারের মিলন হইল। অদ্যও সে তাহার সাক্ষাতে যাইতেছে! দেখিতে চাও, আমার সহিত আইস, দেখাইব।

"বৎস! কপালকুণ্ডলা বধযোগ্যা—আমি ভবানীর আজ্ঞাক্রমে তাহাকে বধ করিব। সে-ও তোমার নিকট বিশ্বাসঘাতিনী—তোমারও বধযোগ্যা, অতএব তুমি আমাকে সাহায্য প্রদান কর।" এই অবিশ্বাসিনীকে ধৃত করিয়া আমার সহিত যজ্ঞস্থানে লইয়া চল। তথায় স্বহস্তে ইহাকে বলিদান কর। ইহাতে ঈশ্বরীর সমীপে যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার মার্জ্জনা হইবে; পবিত্র কর্ম্মে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হইবে, বিশ্বাসঘাতিনীর দণ্ড হইবে; প্রতিশোধের চরম হইবে।"

কাপালিক বাক্য সমাপ্ত করিলেন। নবকুমার কিছুরই উত্তর করিলেন না। কাপালিক তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে যাহা দেখাইব বলিয়াছিলাম, তাহা দেখিবে চল।"

নবকুমার ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া কাপালিকের সঙ্গে চলিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সপত্নীসম্ভাষে

"Be at peace ; it is your sister that addresses you. Requite Lucretia's love."

—*Lucretia.*

কপালকুণ্ডলা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে ভগ্নগৃহমধ্যে গেলেন। তথায় ব্রাহ্মণকে দেখিলেন। যদি দিনমান হইত, তবে দেখিতে পাইতেন যে, তাঁহার মুখকান্তি অতি মলিন হইয়াছে। ব্রাহ্মণবেশী

কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন যে, "এখানে কাপালিক আসিতে পারে, এখানে কোন কথা অবিধি। স্থানান্তরে আইস।" বনমধ্যে একটী অল্লায়তস্থান ছিল, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষরাজি ; মধ্যে পরিষ্কার ; তথা হইতে একটী পথ বাহির হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণবেশী, কপালকুণ্ডলাকে তথায় লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে ব্রাহ্মণবেশী কহিলেন,

"প্রথমতঃ আত্মপরিচয় দিই। কত দূর আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য, তাহা তুমি বিবেচনা করিয়া লইতে পারিবে। যখন তুমি স্বামীর সঙ্গে হিজলী প্রদেশ হইতে আসিতেছিলে, তখন পথিমধ্যে রজনীযোগে এক যবনকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তোমার কি তাহা মনে পড়ে ?"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "যিনি আমাকে অলঙ্কার দিয়াছিলেন ?"

ব্রাহ্মণবেশধারিণী কহিলেন, "আমিই সেই।"

কপালকুণ্ডলা অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার বিস্ময় দেখিয়া কহিলেন, "আরও বিস্ময়ের বিষয় আছে—আমি তোমার সপত্নী।"

কপালকুণ্ডলা চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "সে কি ?"

লুৎফ-উন্নিসা তখন আনুপূর্ব্বিক আত্মপরিচয় দিতে লাগিলেন। বিবাহ, জাতিভ্রংশ, স্বামী কর্ত্তৃক ত্যাগ, ঢাকা, আগ্রা, জাহাঁগীর, মেহের-উন্নিসা, আগ্রাত্যাগ, সপ্তগ্রামে বাস, নবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ, নবকুমারের ব্যবহার, গত দিবস প্রদোষে ছদ্মবেশে কাননে আগমন, হোমকারীর সহিত সাক্ষাৎ—সকলেই বলিলেন। এই সময় কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাদিগের বাটীতে ছদ্মবেশে আসিতে বাসনা করিয়াছিলে ?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "তোমার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে।"

কপালকুণ্ডলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "তাহা কি প্রকারে সিদ্ধ করিতে ?"

লুৎফ-উন্নিসা। আপাততঃ তোমার সতীত্বের প্রতি স্বামীর সংশয় জন্মাইয়া দিতাম। কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি, সে পথ ত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে যদি তুমি আমার পরামর্শমতে কাজ কর, তবে তোমা হইতেই আমার কামনা সিদ্ধ হইবে—অথচ তোমার মঙ্গলসাধন হইবে।

কপা। হোমকারীর মুখে তুমি কাহার নাম শুনিয়াছিলে ?

লু। তোমারই নাম। তিনি তোমার মঙ্গল বা অমঙ্গল কামনায় হোম করেন, ইহা জানিবার জন্য প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। যতক্ষণ না তাঁহার ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, ততক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলাম। হোমান্তে তোমার নামসংযুক্ত হোমের অভিপ্রায় ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তোমার অমঙ্গলসাধনই হোমের প্রয়োজন। আমারও সেই প্রয়োজন। ইহাও তাঁহাকে জানাইলাম। তৎক্ষণাৎ পরস্পরের সহায়তা করিতে বাধ্য হইলাম। বিশেষ পরামর্শ জন্য তিনি আমাকে ভগ্নগৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তোমার মৃত্যুই তাঁহার অভীষ্ট। তাহাতে আমার কোন ইষ্ট নাই। আমি ইহজন্মে কেবল পাপই করিয়াছি, কিন্তু পাপের পথে আমার এতদূর অধঃপাত হয় নাই যে, আমি নিরপরাধা বালিকার মৃত্যুসাধন করি। আমি তাহাতে সম্মতি দিলাম না। এই সময়ে তুমি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলে। বোধ করি, কিছু শুনিয়া থাকিবে।

কপা। আমি ঐরূপ বিতর্কই শুনিয়াছিলাম।

লু। সে ব্যক্তি আমাকে অবোধ অজ্ঞান বিবেচনা করিয়া কিছু উপদেশ দিতে চাহিল। শেষটা কি দাঁড়ায়, ইহা জানিয়া তোমায় উচিত সংবাদ দিব বলিয়া তোমাকে বনমধ্যে অন্তরালে রাখিয়া গেলাম।

কপা। তারপর আর ফিরিয়া আসিলে না কেন?

লু। তিনি অনেক কথা বলিলেন, বাহুল্যবৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে বিলম্ব হইল। তুমি সে ব্যক্তিকে বিশেষ জান। কে সে অনুভব করিতে পারিতেছ?

কপা। আমার পূর্ব্বপালক কাপালিক।

লু। সেই বটে, কাপালিক প্রথমে তোমাকে সমুদ্রতীরে প্রাপ্তি, তথায় প্রতিপালন, নবকুমারের আগমন, তৎসহিত তোমার পলায়ন এ সমুদয় পরিচয় দিলেন। তোমার পলায়নের পর যাহা যাহা হইয়াছিল, তাহাও বিবরিত করিলেন। সে সকল বৃত্তান্ত তুমি জান না। তাহা তোমার গোচরার্থ বিস্তারিত বলিতেছি।

এই বলিয়া লুৎফ-উন্নিসা কাপালিকের শিখরচ্যুতি, হস্তভঙ্গ, স্বপ্ন, সকল বলিলেন। স্বপ্ন শুনিয়া কপালকুণ্ডলা চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—চিত্ত-মধ্যে বিদ্যুচ্চঞ্চলা হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা বলিতে লাগিলেন,

"কাপালিকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ভবানীর আজ্ঞা প্রতিপালন। বাহু বলহীন, এইজন্য সহকারী প্রয়োজন। আমাকে ব্রাহ্মণতনয় বিবেচনা করিয়া সহায় করিবার প্রত্যাশায় সকল বৃত্তান্ত বলিল। আমি এ পর্য্যন্ত দুষ্কর্ম্মে স্বীকৃত হই নাই। এ দুর্ব্বৃত্ত চিত্তের

কথা বলিতে পারি না, কিন্তু ভরসা করি যে, কখনই স্বীকৃত হইব না। বরং এ সঙ্কল্পের প্রতিকূলতাচরণ করিব, এই অভিপ্রায়; সেই অভিপ্রায়েই আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কিন্তু এ কার্য্য নিতান্ত অস্বার্থপর হইয়া করি নাই। তোমার প্রাণদান দিতেছি। তুমি আমার জন্য কিছু কর।"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "কি করিব?"

লু। আমারও প্রাণদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর।

কপালকুণ্ডলা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণের পর কহিলেন, "স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?"

লু। বিদেশে—বহুদূরে তোমাকে অট্টালিকা দিব—ধন দিব—দাসদাসী দিব, রাণীর ন্যায় থাকিবে।

কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন,

"তুমি আমার উপকার করিয়াছ কি না, তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন, সম্পত্তি, দাসদাসীর প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।"

লুৎফ-উন্নিসা চমৎকৃত হইলেন, এরূপ আশু স্বীকারের কোন প্রত্যাশা করেন নাই। মোহিত হইয়া কহিলেন, "ভগিনি—তুমি চিরায়ুষ্মতী হও, আমার জীবনদান করিলে। কিন্তু আমি তোমাকে অনাথা হইয়া যাইতে দিব না। কল্য প্রাতে তোমার নিকট আমার একজন বিশ্বাসযোগ্যা চতুরা দাসী পাঠাইব। তাহার সঙ্গে যাইও। বর্দ্ধমানে কোন অতিপ্রধানা স্ত্রীলোক আমার সুহৃৎ—তিনি তোমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিবেন।"

লুৎফ-উন্নিসা এবং কপালকুণ্ডলা এরূপ মনসংযোগ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন যে, সম্মুখবিঘ্ন কিছুই দেখিতে পান নাই। যে বন্যপথ তাঁহাদিগের আশ্রয়স্থান হইতে বাহির হইয়াছিল, সে বনপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কাপালিক ও নবকুমার তাঁহাদিগের প্রতি যে করাল দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাহা কিছুই দেখিতে পান নাই।

নবকুমার ও কাপালিক ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তত দূর হইতে তাহাদিগের কথোপকথনের মধ্যে কিছুই তদুভয়ের শ্রুতিগোচর

হইল না। মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ যদি সমদূরগামী হইত, তবে মনুষ্যের দুঃখস্রোত শমিত কি বর্দ্ধিত হইত, তাহা কে বলিবে? লোকে বলিয়া থাকে, সংসাররচনা অপূর্ব্ব কৌশলময়।

নবকুমার দেখিলেন, কপালকুণ্ডলা আলুলায়িতকুন্তলা। যখন কপালকুণ্ডলা তাঁহার হয় নাই, তখনই সে কুন্তল বাঁধিত না। আবার দেখিলেন যে, সেই কুন্তলরাশি আসিয়া ব্রাহ্মণকুমারের পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া তাঁহার অংসসংবিলম্বী কেশদামের সহিত মিশিয়াছে। কপালকুণ্ডলার কেশরাশি ঈদৃশ আয়তনশালী এবং লঘু স্বরে কথোপকথনের প্রয়োজনে উভয়ে এরূপ সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বসিয়াছিলেন যে, লুৎফ-উন্নিসার পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কপালকুণ্ডলার কেশের সম্প্রসারণ হইয়াছিল। তাহা তাঁহারা দেখিতে পান নাই। দেখিয়া নবকুমার ধীরে ধীরে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।

কাপালিক ইহা দেখিয়া নিজ কটিবিলম্বী এক নারিকেল পাত্র বিমুক্ত করিয়া কহিল, "বৎস! বল হারাইতেছ, এই মহৌষধ পান কর, ইহা ভবানীর প্রসাদ। পান করিয়া বল পাইবে।"

কাপালিক নবকুমারের মুখের নিকট পাত্র ধরিল। তিনি অন্যমনে পান করিয়া দারুণ তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। নবকুমার জানিতেন না যে, এই সুস্বাদু পেয় কাপালিকের স্বহস্তপ্রস্তুত প্রচণ্ড তেজস্বিনী সুরা। পান করিবামাত্র সবল হইলেন।

এদিকে লুৎফ-উন্নিসা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে কপালকুণ্ডলাকে কহিতে লাগিলেন,

"ভগিনি! তুমি যে কার্য্য করিলে, তাহার প্রতিশোধ করিবার আমার ক্ষমতা নাই; তবু যদি আমি চিরদিন তোমার মনে থাকি, সে-ও আমার সুখ। যে অলঙ্কারগুলি দিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়াছি, তুমি দরিদ্রকে বিতরণ করিয়াছ। এক্ষণে নিকটে কিছুই নাই। কল্যকার অন্য প্রয়োজন ভাবিয়া কেশমধ্যে একটী অঙ্গুরীয় আনিয়াছিলাম, জগদীশ্বরের কৃপায় সে পাপ প্রয়োজনসিদ্ধির আবশ্যক হইল না। এই অঙ্গুরীয়টী তুমি রাখ। ইহার পরে অঙ্গুরীয় দেখিয়া যবনী ভগিনীকে মনে করিও। আজি যদি স্বামী জিজ্ঞাসা করেন, "অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে, কহিও লুৎফ-উন্নিসা দিয়াছে।" ইহা কহিয়া লুৎফ-উন্নিসা আপন অঙ্গুলি হইতে বহুধনে ক্রীত এক অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া কপালকুণ্ডলার হস্তে দিলেন। নবকুমার তাহাও দেখিতে পাইলেন; কাপালিক তাঁহাকে ধরিয়াছিলেন, আবার তাঁহাকে কম্পমান দেখিয়া পুনরপি মদিরা সেবন করাইলেন। মদিরা নবকুমারের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রকৃতি সংহার করিতে লাগিল, স্নেহের অঙ্কুর পর্য্যন্ত উন্মূলিত করিতে লাগিল।

কপালকুণ্ডলা লুৎফ-উন্নিসার নিকট বিদায় হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। তখন নবকুমার ও কাপালিক লুৎফ-উন্নিসার অদৃশ্যপথে কপালকুণ্ডলার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গৃহাভিমুখে

"No spectre greets me vain shadow this."

—*Wordsworth.*

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। অতি ধীরে ধীরে অতি মৃদু মৃদু চলিলেন। তাহার কারণ, তিনি অতি গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া যাইতেছিলেন। লুৎফ-উন্নিসার সংবাদে কপালকুণ্ডলার একেবারে চিত্তভাব পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন। আত্মবিসর্জ্জন কি জন্য? লুৎফ-উন্নিসার জন্য? তাহা নহে।

কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান; তান্ত্রিক যেরূপ কালিকা-প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণসংহারে সঙ্কোচশূন্য, কপালকুণ্ডলাও সেই আকাঙ্ক্ষায় আত্মজীবন বিসর্জ্জনে তদ্রূপ। কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া শক্তিপ্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তথাপি অহর্নিশ শক্তিভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল। ভৈরবী যে সৃষ্টিশাসনকর্ত্রী মুক্তিদাত্রী, ইহা বিশেষ মতে প্রতীত হইয়াছিল। কালিকার পূজাভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাঁহার পরদুঃখদুঃখিত হৃদয়ে সহিত না, কিন্তু আর কোন কার্য্যে ভক্তি প্রদর্শনের ক্রটি ছিল না। এখন সেই বিশ্বশাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী, কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবনসমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই বা কপালকুণ্ডলা সে আদেশ পালন না করিবেন?

তুমি আমি প্রাণত্যাগ করিতে চাহি না। রাগ করিয়া যাহা বলি, এ সংসার সুখময়। সুখের প্রত্যাশাতেই বর্ত্তুলবৎ সংসার মধ্যে ঘুরিতেছি—দুঃখের প্রত্যাশায় নহে। কদাচিৎ যদি আত্মকর্ম্মদোষে সেই প্রত্যাশা সফলীকৃত না হয়, তবেই দুঃখ

বলিয়া উচ্চ কলরব আরম্ভ করি। তবেই দুঃখ নিয়ম নহে, সিদ্ধান্ত হইল; নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। তোমার আমার সর্ব্বত্র সুখ। সেই সুখে আমরা সংসারমধ্যে বদ্ধমূল; ছাড়িতে চাহি না। কিন্তু এ সংসারবন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—কোন বন্ধনই ছিল না তবে কপালকুণ্ডলাকে কে রাখে?

যাহার বন্ধন নাই, তাহারই অপ্রতিহত বেগ। গিরিশিখর হইতে নির্ঝরিণী নামিলে, কে তাহার প্রতিরোধ করে? একবার বায়ুতাড়িত হইলে কে তাহার সঞ্চারণ নিবারণ করে? কপালকুণ্ডলার চিত্ত চঞ্চল হইলে কে তাহার স্থিতিস্থাপন করিবে? নবীন করিকরভ মাতিলে কে তাহাকে শান্ত করিবে?

কপালকুণ্ডলা আপন চিত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনই বা এ শরীর জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ না করিব? পঞ্চভূত লইয়া কি হইবে? প্রশ্ন করিতেছিলেন, অথচ কোন নিশ্চিত উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। সংসার অন্য কোন বন্ধন না থাকিলেও পঞ্চভূতের এক বন্ধন আছে।

কপালকুণ্ডলা অধোবদনে চলিতে লাগিলেন। যখন মনুষ্যহৃদয় কোন উৎকটভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্যসৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়। কপালকুণ্ডলার সেই অবস্থা হইয়াছিল।

যেন ঊর্দ্ধ হইতে তাঁহার কর্ণকুহরে এই শব্দ প্রবেশ করিল, "বৎসে!—আমি পথ দেখাইতেছি।" কপালকুণ্ডলা চকিতের ন্যায় ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, যেন আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত মূর্ত্তি। গলবিলম্বিত নরকপালমালা হইতে শোণিত-স্রুতি হইতেছে; কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকররাজি দুলিতেছে—বাম করে নরকপাল—অঙ্গে রুধিরধারা, ললাটে বিষমোজ্জ্বলজ্বালাবিভাসিতলোচনপ্রান্তে বালশশী সুশোভিত। যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।

কপালকুণ্ডলা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া চলিলেন। সেই নবকাদম্বিনীসন্নিভ রূপ আকাশ-মার্গে তাঁহার আগে আগে চলিল। কখন কপালমালিনীর অবয়ব মেঘে লুক্কায়িত হয়, কখনও নয়নপথে স্পষ্ট বিকশিত হয়। কপালকুণ্ডলা তাঁহার প্রতি চাহিয়া চলিলেন।

নবকুমার বা কাপালিক এ সব কিছুই দেখেন নাই। নবকুমার সুরাগরল-প্রজ্বলিতহৃদয়—কপালকুণ্ডলার ধীরপদক্ষেপে অসহিষ্ণু হইয়া সঙ্গীকে কহিলেন, "কাপালিক!"

কাপালিক কহিল, "কি?"

"পানীয়ং দেহি মে।"

কাপালিক পুনরপি তাঁহাকে সুরা পান করাইল।

নবকুমার কহিলেন, "আর বিলম্ব কি?"

কাপালিক উত্তর করিল, "আর বিলম্ব কি?"

নবকুমার ভীমনাদে ডাকিলেন, "কপালকুণ্ডলা!"

কপালকুণ্ডলা শুনিয়া চমকিত হইলেন। ইদানীন্তন কেহ তাঁহাকে কপালকুণ্ডলা বলিয়া ডাকিত না। তিনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। নবকুমার ও কাপালিক তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। কপালকুণ্ডলা প্রথমে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না—কহিলেন,

"তোমরা কে? যমদূত?"

পরক্ষণেই চিনিতে পারিয়া কহিলেন, "না না, পিতা, তুমি কি আমায় বলি দিতে আসিয়াছ?"

নবকুমার দৃঢ়মুষ্টিতে কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ করিলেন। কাপালিক করুণার্দ্র, মধুময় স্বরে কাহলেন,

"বৎসে, আমাদিগের সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া কাপালিক শ্মশানাভিমুখে পথ দেখাইয়া চলিলেন।

কপালকুণ্ডলা আকাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; যথায় গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, সেইদিকে চাহিলেন; দেখিলেন, রণরঙ্গিণী খলখল হাসিতেছে; এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিকগত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে। কপাল-কুণ্ডলা অদৃষ্টাবিমূঢার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন। নবকুমার পূর্ব্ববৎ দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া চলিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রেতভূমে

"বপুষা করণোজ্‌ঝিতেন সা নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈলনিষেকবিন্দুনা সহ দীপ্তার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীম্॥"

—রঘুবংশ।

চন্দ্রমা অস্তমিত হইল। বিশ্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। কাপালিক যথায় আপন পূজাস্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় কপালকুণ্ডলাকে লইয়া গেলেন।

সে গঙ্গাতীরে এক বৃহৎ সৈকতভূমি। তাহারই সম্মুখে আর বৃহত্তর দ্বিতীয় এক-খণ্ড সিকতাময় স্থান। সেই সৈকতে শ্মশানভূমি। উভয় সৈকতমধ্যে জলোচ্ছ্বাসকালে অল্প জল থাকে, ভাটার সময় জল থাকে না, এক্ষণে জল ছিল না। শ্মশানভূমির যে মুখ গঙ্গাসম্মুখীন, সেই মুখ অত্যুচ্চ, জলে অবতরণ করিতে গেলে একেবারে উচ্চ হইতে অগাধ জলে পড়িতে হয়। তাহাতে আবার অবিরত বায়ু-তাড়িত তরঙ্গাভিঘাতে উপকূলতল ক্ষয়িত হইয়াছিল ; কখন কখন মৃত্তিকাখণ্ড স্থানচ্যুত হইয়া অগাধ জলে পড়িয়া যাইত। পূজাস্থানে দীপ নাই—কাষ্ঠখণ্ডমাত্রে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তদালোকে অতি অস্পষ্টদৃষ্ট শ্মশানভূমি আরও ভীষণ দেখাইতে-ছিল। নিকটে পূজা, হোম, বলি প্রভৃতির সমগ্র আয়োজন ছিল। বিশাল তরঙ্গিণীহৃদয় অন্ধকারে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। চৈত্রমাসের বায়ু অপ্রতিহত বেগে গঙ্গাহৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছিল ; তাহার কারণে তরঙ্গাভিঘাতজনিত কলকল রব গগন ব্যাপ্ত করিতেছিল ; শ্মশানভূমিতে শবভুক্ পশুগণ কর্কশকণ্ঠে ক্বচিৎ ধ্বনি করিতেছিল।

কাপালিক, নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে উপযুক্ত স্থানে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া তন্ত্রাদির বিধানানুসারে পূজারম্ভ করিলেন। উপযুক্ত সময়ে নবকুমারের প্রতি আদেশ করিলেন যে, কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আন। নবকুমার কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া স্নান করাইতে লইয়া চলিলেন। তাঁহাদিগের চরণে অস্থি ফুটিতে লাগিল। নবকুমারের পদের আঘাতে একটা জলপূর্ণ শ্মশান-কলস ভগ্ন হইয়া গেল। তাহার নিকটেই শব পড়িয়াছিল—হতভাগার কেহ সৎকার করে নাই। দুইজনেরই তাহাতে পদস্পর্শ হইল। কপালকুণ্ডলা তাহাকে বেড়িয়া গেলেন, নবকুমার তাহাকে চরণে দলিত করিয়া গেলেন। চতুর্দ্দিক বেড়িয়া শবমাংসভুক্ পশুসকল ফিরিতেছিল। মনুষ্য দুইজনের আগমনে উচ্চকণ্ঠে রব করিতে লাগিল, কেহ আক্রমণ করিতে আসিল, কেহ বা পদশব্দ করিয়া চলিয়া গেল। কপালকুণ্ডলা দেখিলেন, নবকুমারের হস্ত কাঁপিতেছে ; কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নির্ভীক নিষ্কম্প।

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভয় পাইতেছ ?"

নবকুমারের মদিরার মোহ ক্রমে শক্তিহীন হইয়া আসিতেছে। অতি গম্ভীর স্বরে নবকুমার উত্তর করিলেন,

"ভয়ে, মৃন্ময়ি ? তাহা নহে।"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কাঁপিতেছ কেন—"

এই প্রশ্ন কপালকুণ্ডলা যে স্বরে করিলেন, তাহা কেবল রমণীকণ্ঠেই সম্ভবে। যখন রমণী পরদুঃখে গলিয়া যায়, কেবল তখনই রমণীকণ্ঠে সে স্বর সম্ভবে। কে জানিত যে, আসন্নকালে শ্মশানে আসিয়া কপালকুণ্ডলার কণ্ঠ হইতে এ স্বর নির্গত হইবে?

নবকুমার কহিলেন, "ভয়ে নহে। কাঁদিতে পারিতেছি না, এই ক্রোধে কাঁপিতেছি।"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসিলেন, "কাঁদিবে কেন?"

আবার সেই কণ্ঠ!

নবকুমার কহিলেন, "কাঁদিব কেন? তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ি! তুমি ত কখনও রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই"—বলিতে বলিতে নবকুমারের কণ্ঠস্বর যাতনায় রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। "তুমি ত কখন আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই!" এই বলিয়া সহসা নবকুমার চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন।

"মৃন্ময়ি!—কপালকুণ্ডলে! আমায় ক্ষমা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।"

কপালকুণ্ডলা হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন—মৃদুস্বরে কহিলেন, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই!"

যখন এই কথা হইল, তখন উভয়ে একেবারে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; কপালকুণ্ডলা অগ্রে, নদীর দিকে পশ্চাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহার পশ্চাতে একপদ পরেই জল। এখন জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইয়াছিল, কপালকুণ্ডলা একটা আড়রির উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই!"

নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিলেন, "চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব—বল মৃন্ময়ি! বল—বল—বল—আমায় রাখ।—গৃহে চল!"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিব। আজি যাহাকে দেখিয়াছ—সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি। এ কথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।"

"না—মৃন্ময়ি!—না!—" এইরূপ উচ্চ শব্দ করিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন; কপালকুণ্ডলাকে আর পাইলেন না। চৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল; অমনি তটমৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলার সহিত ঘোররবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল। নবকুমার তীরভঙ্গের শব্দ শুনিলেন, অন্তর্হিত হইল দেখিলেন। অমনি তৎপশ্চাৎ লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন। নবকুমার সন্তরণে অক্ষম ছিলেন না। কিছু সাঁতার দিয়া কপালকুণ্ডলার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।

সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?

সম্পূর্ণ

সংক্ষিপ্ত টীকা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

গঙ্গাসাগরে স্নান সারিয়া একটি যাত্রীনৌকা মাঘ মাসের রাত্রিশেষে ফিরিতেছিল। চারিদিক কুয়াশায় ব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মাঝিরা দিক্ নিরূপণ করিতে পারে নাই। নৌকা স্রোতে চলিতেছিল। কোন্ দিকে চলিতেছিল তাহা কেহই বুঝিতে পারে পাই। নৌকা চলিতে চলিতে যদি সমুদ্রে গিয়া পড়ে তবে সকলেই মারা যাইবে। নৌকার আরোহী স্ত্রীপুরুষ সকলেই ভয়ে উৎকণ্ঠিত, কেবল নবকুমার সকলকে সাহস দিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সূর্যোদয় হইল, রৌদ্রের তেজ প্রখর হইলে কুয়াশা কাটিয়া গেল। সকলেই দেখিল নৌকা রসুলপুরের মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। একদিকে কূল অতি নিকটে, অপর দিকে কূলের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।

সেক্সপীয়ারের Comedy of Errors নাটকের উদ্ধৃত পংক্তিটি যে দৃশ্যটি মনে করাইয়া দেয়, তাহার সঙ্গে নৌকার বাহন বন্ধ করিয়া স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাওয়ার সাদৃশ্য আছে। Syracuse-এর বণিক Aegion আপনাকে জাহাজের ভাঙ্গা মাস্তলের সঙ্গে বাঁধিয়া Corinth-এর দিকে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি কোন্ দিকে যাইতেছেন। নবকুমারের পরামর্শে মাঝিরা বাহন বন্ধ করিয়া দিলে নৌকা স্রোতে যে কোথায় যাইতেছিল তাহা মাঝি বা যাত্রী কেহই বুঝিতে পারে নাই।

প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে-বর্ণিত একাধিক চরিত্রের ভাগ্য সম্রাট্ আকবরের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত। গ্রন্থে আকবরের মৃত্যুর উল্লেখ আছে। উপন্যাসের ঘটনাবলী আকবরের মৃত্যুর সামান্য কিছু পূর্ব হইতে মৃত্যুর সামান্য কিছু পর পর্যন্ত ঘটিয়াছে। আকবর শাহ্ লোকান্তরিত হইয়াছেন ১৬০৫ সালে। কাব্যসম্পদে সমৃদ্ধ রোমান্সধর্মী এই উপন্যাস-খানির ঘটনাসংস্থান যেমন সাগরসঙ্গমে, উপকূলে, নিবিড় বনানীতে, তেমনি কালের দিক্ হইতেও বঙ্কিমচন্দ্র আড়াই শত বৎসর পূর্বের পটভূমিকা ব্যবহার করিয়াছেন। রোমান্সের পথে খানিকটা অপরিচয়, বাস্তব জীবনের সঙ্গে কিছুটা ব্যবধান নিতান্তই

প্রয়োজন। ইহাতে কল্পনাকুশলী লেখক কল্পনা শক্তিবিকাশের উপযোগী ক্ষেত্র ও সুযোগ পাইয়া থাকেন।

গঙ্গাসাগর—গঙ্গা যেখানে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে; এখানে পৌষ-সংক্রান্তিতে মেলা হয়। সাগরস্নানের জন্য বহুযাত্রী এখানে পূর্বেও আসিত, এখনও আসে।

বহর—জলদস্যুর ভয়ে নৌকাগুলি একসঙ্গে দলবদ্ধ থাকিত । হইয়া নৌকাগুলির এই সমষ্টির নাম 'বহর'। সমুদ্র দেখিব—নবকুমার পুণ্যলোভে গঙ্গাসাগরে আসেন নাই, আসিয়াছেন সমুদ্র দেখিবার জন্য, প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখিবার জন্য। নবকুমারকে প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা চিনিয়া লইলাম, তাঁহার রসবোধ ও সৌন্দর্যপ্রীতির পরিচয় পাওয়া গেল, একটু পরেই তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। নবকুমারের মুখে রঘুবংশের শ্লোক বেমানান হয় নাই। বারদরিয়া—বাহির সমুদ্র।

সেই কেবল কাঁদিল না—আসন্ন বিপদের সম্মুখে অনেকগুলি ক্রন্দনরত স্ত্রীলোকের মধ্যে এই নারীটির ছবি একটি কথায় কি চমৎকার ফুটিয়াছে। কোলের ছেলেকে যে সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিয়াছে, তাহার আর সংসারে বাঁচিয়া থাকিবার সাধ নাই। মানুষ সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে চায় বলিয়াই সে মৃত্যুকে ভয় করে। যে বাঁচিয়া থাকাকেই অর্থহীন বিড়ম্বনা মনে করে সে সম্মুখে মৃত্যু দেখিয়াও ভীত হয় না, বরং ভাবে এখন যদি জীবনের অবসান হইয়া যায় তবে মন্দ হয় না।

কলধৌত প্রবাহবৎ—গলিত রৌপ্যপ্রবাহের ন্যায়। কলধৌত অর্থে স্বর্ণও হয়। মাঘমাসে নদীর জল অত্যন্ত ঘোলা হওয়া স্বাভাবিক নয়, সুতরাং এখানে কলধৌত অর্থ রৌপ্য ধরিয়া লওয়া শ্রেয়ঃ।

দরিয়ার পাঁচপীর—পাঁচজন ফকির পৃথিবীর সমস্ত জলভাগ রক্ষা করেন, সুতরাং নৌকা বিপন্ন হইলে এই পাঁচজনের নামোচ্চারণ করিয়া ইঁহাদিগকে ডাকিতে হয়—মাঝিদের এইরূপ বিশ্বাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জোয়ার না আসিলে নৌকা ছাড়া যাইবে না, কিন্তু জোয়ারের বিলম্ব আছে। সকলে ঠিক করিল নিকটস্থ তীরে নৌকা লাগাইয়া স্নানাহার সারিয়া লওয়া ভাল। কিন্তু নৌকায় রন্ধনের কাঠ নাই, কিন্তু সম্মুখের বন হইতে কাঠ সংগ্রহ করা কঠিন নয়। কিন্তু বাঘের ভয়ে কেহই কাঠ আনিতে যাইতে সাহস পায় না। নবকুমার

কাষ্ঠান্বেষণে চলিলেন। কাঠ কটিয়া কাঠ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া নবকুমার দেখিলেন নৌকা নাই। জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস নৌকাকে রসুলপুর নদীর মধ্যে বহুদূর লইয়া গিয়াছে। মাঝিরা ফিরিতে চাহিল না। আর ফিরিয়াই বা কি হইবে! নবকুমারকে নিশ্চয়ই বাঘে খাইয়াছে। নবকুমারকে নির্জন সমুদ্রতটে ফেলিয়া সকলে চলিয়া গেল।

সেক্সপীয়ারের King Lear নামক সুবিখ্যাত নাটক হইতে যে পংক্তিটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে রাজা লীয়রের কন্যাগণের চরম বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলা হইয়াছে। নবকুমারের প্রতি তাঁহার স্বগ্রামবাসী যাত্রিগণ যে বিশ্বাসঘাতকতা দেখাইল তাহার কথা লীয়রের কন্যাগণকেই মনে করাইয়া দেয়। সকলের উপবাস নিবারণের জন্য যিনি কাঠ আনিতে গেলেন, তাঁহাকেই সকলে জনশূন্য উপকূলে পরিত্যাগ করিয়া গেল!

প্রাগুক্ত—প্রাক্+উক্ত; পূর্বকথিত। স্বেদস্রুতি—ঘর্ম নির্গমন। সম্ভাব্য কাল —যে সময়ের মধ্যে নবকুমারের কাঠ লইয়া ফিরিয়া আসা উচিত সে সময়। একজন আরোহী কহিল—'নবকুমার রহিল যে?'—এই ক্ষুদ্র উক্তিটি নবকুমারের পক্ষে একটা ক্ষীণ আশ্রয়। 'কিন্তু তোর নবকুমার কি আছে?'—মাঝির এই নিঃসংশয় উক্তির নিকট এই প্রতিবাদ বড়ই দুর্বল। আরোহী ও মাঝির এই কথা দুইটি ভাবী ঘটনার জন্য আমাদের মনকে প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। নবকুমারের নির্বাসন যত বেদনাদায়ক হউক না কেন, এই অবস্থায় তাহা যে অস্বাভাবিক নয় এই কথা হইতে তাহা বুঝা যায়।

তুমি অধম—পরিচ্ছেদের শেষে গ্রন্থকার একটু উপদেশ দিয়াছেন। অনেকে এইজন্য গ্রন্থকারের উপর বিরক্ত হন—শিল্পের দিক্ হইতে ইহাতে নাকি দোষ ঘটে। আমরা তো মনে করি নাট্যকারের মত উপন্যাসকার এতটা পরাধীন নহেন। ঘটনার উল্লেখ বা বিবৃতি দিয়া তিনি বিশ্লেষণ করিতে পারেন, বিচার ও সমালোচনা করিতে পারেন, সুযোগ পাইলে দুই-একটা নীতি কথাও বলিতে পারেন, রসিকতাও করিতে পারেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যেস্থানে নবকুমার পরিত্যক্ত হইলেন সেস্থানে মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন ছিল না। কেবল অরণ্য ও মধ্যে মধ্যে বালুকাস্তূপ। তিনি নৌকা দেখিতে না পাইয়াও একথা মনে করেন নাই যে, সঙ্গিগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তিনি ভাবিলেন জোয়ারের বেগে নৌকা অন্যত্র গিয়াছে, কিছুক্ষণ পরেই আসিবে। তিনি তীর দিয়া হাঁটিয়া নৌকার অনুসন্ধান করিলেন। পরে ভাবিলেন যে, জোয়ার

চলিয়া গেলে ও ভাটা আরম্ভ হইলে নৌকা আসিবে। জোয়ার শেষ হইল, ভাটা আসিল, সূর্য ডুবিয়া গেল কিন্তু নৌকা আসিল না। একবার নবকুমার ভাবিলেন নৌকা হয়তো জলমগ্ন হইয়াছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পরিশ্রমে শীতে তিনি ক্রমেই কাতর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। রাত্রি হইলে তিনি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তারপর এক সময়ে শারীরিক ও মানসিক অবসাদে ক্লান্ত হইয়া একটা বালিয়াড়ির পাশে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কবি বায়রণের 'ডনজুয়ান' হইতে উদ্ধৃত ছত্র কয়টির সাহায্যে নবকুমারের তৎকালীন নিরাশা ও বিষাদ প্রকাশ করা হইয়াছে।

অনুদ্ঘাতিনী—সমতল। অধোভাগমণ্ডনকারী—বালুকাস্তূপের নীচে সজ্জিত হইয়া আছে যে সমস্ত ছোট ছোট গাছ।

গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত নাই—নবকুমার কাঠের সন্ধানে নৌকা হইতে নামিয়াছিলেন। দিনের বেলায় দুই এক দণ্ডের মধ্যেই কাজ সারিয়া ফিরিবেন মনে করিয়া গায়ে দিবার জন্য কিছুই লয়েন নাই।

প্রাণনাশই নিশ্চিত—এই নিদারুণ মাঘের শীতে মুক্ত আকাশের তলে খালি গায়ে শয়ন করিলে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, কিন্তু তাহাতেও যদি প্রাণ বাঁচে তবে বাঘ-ভালুকের হাতে পড়িয়া আর কিছুতেই রক্ষা নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গভীর রাত্রিতে নবকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। এখনও তিনি বাঁচিয়া আছেন, এখনও তাঁহাকে বাঘে খায় নাই দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। দূরে একটি আলোক দেখিতে পাইয়া তিনি জীবনের আশা ফিরিয়া পাইলেন। আলোক যখন আছে তখন মানুষও নিশ্চয়ই আছে। তিনি আলোক লক্ষ্য করিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। আলোকের কাছাকাছি উপস্থিত হইয়া দেখিলেন স্তূপশিখরে একটি মনুষ্যমূর্তি—আরও নিকটবর্তী হইয়া মানুষটিকে দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন। নবকুমার দেখিলেন এক ভীষণদর্শন কাপালিক ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। নবকুমারকে দেখিয়া কাপালিক প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, আগন্তুক ব্রাহ্মণ এবং নবকুমারকে লইয়া তাঁহার কেয়াপাতার কুটীরে লইয়া আসিলেন। কিছু ফলমূল খাইয়া ও জলপান করিয়া নবকুমার পরিতুষ্ট হইলেন ও গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কাপালিক বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত নবকুমার যেন কুটীর ত্যাগ না করেন।

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের পঞ্চম সর্গ হইতে উদ্ধৃত অংশটিতে লক্ষ্মণ চণ্ডীপূজা

করিতে যাইবার সময় যে রুদ্র ভৈরবের মূর্তি দেখিয়াছিলেন সেই কথা বলা হইয়াছে। ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিয়া শূলপাণি মহাদেব লক্ষ্মণের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বালুকাস্তূপের উপর উপবিষ্ট ভীষণদর্শন কাপালিককে দেখিয়া শ্মশানচারী ভৈরব বলিয়াই মনে হয়।

অশিথিলীকৃত বেগে—গতিবেগ শিথিল বা মন্দীভূত না করিয়া। নরকপাল—মৃত নরের মাথার খুলি ; এই খুলিতে উগ্র সুরা থাকে। কাপালিক—"এক শ্রেণীর তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। নরকপালধারী, সর্বাঙ্গে চিতাভস্ম মাখিয়া বাঘছাল পরিয়া নরখর্পর হাতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে ; সর্বদা ঘণ্টাধ্বনি, মুখে কালী নাম উচ্চারণ করে। ইহারা এক সময়ে নরবলি দিত।" [জ্ঞানভারতী]।

কস্ত্বম্—তুমি কে ? কাপালিকের মুখে সংস্কৃত কথা এই অবস্থায় খুবই উপযোগী হইয়াছে।

ভৈরবীপ্রেরিতোঽসি—তুমি ভৈরবীপ্রেরিত। সুস্থ সবল সুদর্শন ব্রাহ্মণ নবকুমার কাপালিকের পূজার বলি হইবার জন্য অপ্রত্যাশিতভাবে এই যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ইহার মধ্যে কাপালিক তাহার উপাস্য ভৈরবীর ইঙ্গিত দেখিতে পাইতেছে। কাপালিকের এই বিশ্বাস আন্তরিক।

নবকুমারের অবোধগম্য কোন উপায়ে—গ্রন্থকার কাপালিককে অতিমানুষ রূপে বর্ণনা করিতেছেন। কাপালিক যে কি করিয়া আগুন জ্বালিল নবকুমার তাহা নিকটে থাকিয়াও বুঝিতে পারিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালে উঠিয়া নবকুমার বাড়ী যাওয়ার উপায় করিতে ব্যস্ত হইলেন। কাপালিকের নিকট আর থাকা উচিত নয়। কিন্তু পথহীন বনে পথ চিনিয়া বাহির হইবেন কিরূপে ? কাপালিক পথ বলিয়া দিবেন না কি ? কাপালিক এ পর্যন্ত কোন মন্দ ব্যবহার করেন নাই। তবে অনর্থক তাঁহার অবাধ্য হইয়া লাভ কি ? কিন্তু সারাদিন কুটীরে অনাহারে বাস করিলেও নবকুমার কাপালিকের দেখা পাইলেন না। কিছু বেলা থাকিতে ফল অন্বেষণে তিনি কুটীর হইতে বাহির হইলেন। বাহির হইয়া কিছু বাদাম খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি পথ ভুলিলেন। কুটীরে ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না। তরঙ্গগর্জন শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন নিকটেই সমুদ্র—বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন বাস্তবিকই তাঁহার সম্মুখে সমুদ্র। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি ঐখানে বসিয়া নানাকথা চিন্তা

করিতে লাগিলেন। কাপালিকের আশ্রমে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া তিনি যখন দাঁড়াইলেন তখন এক অপূর্ব রমণীমূর্তি তাঁহার চোখে পড়িল। সেই রমণী তাঁহাকে বলিল, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ' এবং 'আইস' বলিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া কাপালিকের কুটীরে পৌঁছাইয়া দিল। নবকুমার যন্ত্রচালিতের মত তাহার অনুসরণ করিলেন এবং কুটীরে পৌঁছিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

এই পরিচ্ছেদেই নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার প্রথম সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলার চরিত্র কেবল নবকুমারের নিকট নহে, আমাদের নিকটও রহস্যময়। নিখিল রহস্যের মধ্যগতা করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র এই রহস্যময়ীর প্রথম পরিচয় দিয়াছেন। নিবিড় রহস্যময় মহারণ্য, অনন্ত রহস্যের আধার মহাসমুদ্র, সমুদ্রে ও অরণ্যে লঘুপদ-সঞ্চারে ধূসর সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছে—চারিদিকের এই রহস্যময় প্রতিবেশে আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেন। এই পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিত্ব ও সাঙ্কেতিকতা যথার্থ-ই অপূর্ব।

পরিমাণ-বোধ-রহিত—সাগরের শোভা দেখিতে দেখিতে নবকুমার আত্মমগ্ন হইয়া পড়িলেন, কতকক্ষণ আসিয়াছেন, কতটা সময় অতিক্রান্ত হইল, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিলে তাঁহার চেতনা হইল, এখন পথ খুঁজিয়া আশ্রমে ফিরিতে হইবে। উপর্যুপরি যে ঘটনা সংঘাত তাঁহার জীবনে যাইতেছে তাহা নবকুমারকে খানিকটা বিহ্বল ও অন্যমনস্ক করিয়া দিয়াছে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গত্রোত্থান করিলেন—গ্রন্থকার নবকুমারের দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিবার কারণ সঠিকভাবে কিছু বলেন নাই, কেবল অনুমান করিয়াছেন। প্রকৃতির এই রমণীয় শোভা ত্যাগ করিয়া আবার ভয়ঙ্কর কাপালিকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে, কেবল এজন্য নবকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন নাই, হয়তো নির্জন সমুদ্রতীরে বসিরা বসিয়া বিগত জীবনের কোন সুখের স্মৃতির কথা আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সুখস্মৃতি হয় তো তাঁহার বিবাহিত জীবনের কথা, পদ্মাবতীর কথা। স্বপ্নাবিষ্টের মত তিনি সেই সুখস্মৃতির ধ্যান করিতেছিলেন। সেই সুখস্বপ্ন ছাড়িয়া উঠিতে হইতেছে বলিয়া হয়তো নবকুমারের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

অবেণীসংবদ্ধ—আলুলায়িত। সংসর্পিত—কুঞ্চিত। যেন চিত্রপটের উপর চিত্র—চিত্রের পটভূমিকা ভাল না হইলে চিত্র শোভা পায় না। সুপ্রচুর কালো কেশের রাশি যেন একখানা পট আর তাহাতে গৌরকান্তি বনদুহিতা কপালকুণ্ডলার দেহখানি যেন একখানা উজ্জ্বল চিত্র।

মেঘ-বিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায়—কৃষ্ণকেশগুচ্ছের প্রাচুর্যে ও কেশভার

আলুলায়িত থাকায় মুখের সমস্তটা প্রকাশিত হয় নাই, চূর্ণকুন্তল মুখের খানিকটা আবৃত করিয়াছিল। দেখিলে মনে হয় যেন কালো মেঘের অন্তরাল হইতে চন্দ্ররশ্মি বাহির হইতেছে।

নিস্পন্দ শরীর—অপ্রত্যাশিতভাবে এই অপূর্ব সুন্দরী তরুণীকে দেখিতে পাইয়া নবকুমার বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার বিস্ময় এত গভীর যে, তিনি প্রস্তরমূর্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই—নবকুমারকে দেখিয়া কপালকুণ্ডলা চমকিত হয় নাই। কি করিয়া কাপালিকের হাত হইতে অপরিচিত পথহারা পথিককে রক্ষা করিতে পারা যায় কপালকুণ্ডলা নবকুমারের দিকে অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া তাহাই চিন্তা করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার অনেকক্ষণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এই অবস্থায় তরুণ-তরুণীর প্রথম সাক্ষাতে যে হৃদয়চাঞ্চল্য, যে সলজ্জ সপ্রতিভ ভাব জন্মে, কপালকুণ্ডলার তাহা একেবারেই জন্মে নাই।

অপরিচিত স্ত্রীপুরুষ সাক্ষাৎ হইলে পুরুষই আগে কথা বলে, স্ত্রীলোক লজ্জাবশে কখনই আগে কথা বলে না। কৌতূহল ও বিস্ময়ের সঙ্গে করুণা ব্যতীত অন্য কোন ভাব তাহার চিত্তে জন্মে নাই, জন্মিলে কখনই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কপালকুণ্ডলা প্রথম কথা বলিতে পারিত না।

একটি রমণীকণ্ঠসম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়—মানুষের জীবনের দুঃখতাপ জুড়াইতে, তাহার ছন্দোহীন জীবনে সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে নারীর স্নেহ, তাহার সহানুভূতিসিক্ত কণ্ঠস্বরের শক্তি অসীম। পদ্মাবতীকে হারাইয়া নবকুমার হৃদয়ে নিরন্তর একটা শূন্যতা অনুভব করিতেছিলেন, সঙ্গিগণের নির্মম ব্যবহার জীবনকে আরও অর্থহীন করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে বনদুহিতার কণ্ঠস্বর তাঁহার জীবনকে আবার সুধাসিক্ত করিয়া তুলিল।

হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যে লয় মিলিতে লাগিল—কপালকুণ্ডলার আকৃতি ও রূপ নবকুমারকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিল, কিন্তু তাহার মধুর কণ্ঠ তাঁহাকে একেবারে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। হৃদয়ে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের শিহরণ খেলিয়া গেল, নবকুমারের চোখে যেন সৌন্দর্যের অঞ্জন পরাইয়া দিল ; এইরূপ মন ও এইরূপ চক্ষু লইয়া তিনি যাহা কিছু দেখিতেছেন সবই সুন্দর, সবই তুলনাহীন। আকাশে,

বাতাসে, পত্রের মর্মরে ও সমুদ্রের কলতানে কপালকুণ্ডলার মধুর কণ্ঠ যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কোন উত্তর না পাইয়া—নবকুমার এত অভিভূত যে, তাঁহার কথা বলিবার শক্তি ছিল না। কলের পুতুলের ন্যায়—কোন বাক্যব্যয় না করিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে অনুসরণ করিলেন। কোন দ্বিধাসংশয় মনে জাগে নাই, বরং নিজের ভাগ্য এই অপরিচিতার হাতে সঁপিয়া দিয়া যেন নবকুমার নিশ্চিত হইতে পারিলে রক্ষা পান।

আর সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন না—কপালকুণ্ডলার আবির্ভাবও যেমন, অন্তর্ধানও তেমনি আকস্মিক ও রহস্যময়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নবকুমার কুটীরে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন যে, যাহাকে তিনি দেখিলেন সে কি দেবী না মানবী? কুটীরে রন্ধনের সামগ্রী ছিল, রন্ধন করিয়া তিনি রাত্রের আহার সারিয়া লইলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সমুদ্রতীরে ছুটিলেন। কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইবেন এই আশায় সন্ধ্যা পর্যন্ত সমুদ্রতীরে ঘুরিলেন। কিন্তু কাহারও সাক্ষাৎ পাইলেন না। সন্ধ্যান কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন কাপালিক বসিয়া আছেন। কাপালিক নবকুমারকে লইয়া বাহির হইলেন, কাপালিক আগে যাইতেছেন, নবকুমার পিছনে চলিতেছেন। হঠাৎ নবকুমারের পিঠে কোমল করস্পর্শ হইল। নবকুমার ফিরিয়া দেখিলেন সেই রমণী তাঁহাকে অস্ফুট স্বরে সত্বর পলায়ন করিবার নির্দেশ দিয়া অন্তর্হিত হইল। নবকুমার পলাইবেন কিনা চিন্তা করিতেছিলেন। ক্রমে চলিতে চলিতে সমুদ্রতীরে উপনীত হইলেন। রমণী পুনর্বার দেখা দিয়া বলিয়া গেল, নরমাংস না হইলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না। এইবার নবকুমার বুঝিতে পারিলেন, তিনি কাপালিকের কবলে পড়িয়াছেন, তাঁহাকে পূজার স্থানে বধ করা হইবে। নবকুমার বলপ্রয়োগ করিয়াও কাপালিকের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। কাপালিক নবকুমারকে শুষ্কলতায় দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। পূজা শেষ করিয়া বলির জন্য খড়্গ আনিতে গিয়া কাপালিক খড়্গ পাইলেন না। কাপালিক চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কপালকুণ্ডলা খড়্গ-দ্বারা লতাবন্ধন ছেদন করিয়া চক্ষের নিমেষে নবকুমারকে লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

দ্বার সংযোজনপূর্ব্বক করতলে মস্তক দিয়া—নবকুমার নির্জনে কপালকুণ্ডলার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। যাহা দেখিয়াছেন তাহা রহস্যময়; এ রহস্যের পার পাওয়

যায় কিনা, এই নির্জন বনভূমিতে, ভীষণদর্শন কাপালিকের আশ্রমে এই অপূর্ব নারীর আবির্ভাব কি করিয়া সম্ভব, এই কথা অনন্যচিত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এ কি দেবী—মানুষী—না কাপালিকের মায়াগাত্র—বিস্ময়ের প্রথম চমক কাটিয়া গিয়াছে। এই রহস্যময়ী কি তাঁহাকে ত্রাণ করিবার জন্যই দেখা দিয়াছে, এ কি কোন স্বর্গের দেবী? এই নারী কি সাধারণ রক্তমাংসের কোন মানবী? না অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কাপালিকের কোনও অভিনব ছলনার রূপ ধরিয়া রহস্যময়ী নবকুমারকে মোহিনীমূর্তিতে মুগ্ধ করিয়া তাহার সর্বনাশ সাধন করিবে? নবকুমার মনে মনে যতই আলোচনা করেন, রহস্য ততই আরো নিবিড় হইয়া উঠে, নিঃসংশয়িত চিত্তে কোনও কিছুই তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না।

পূর্ব্বদৃষ্টা মায়াবিনী পুনর্ব্বার সে স্থলে যে আসিবেন—কপালকুণ্ডলাকে একবার দেখিয়াই নবকুমার এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, এই বালিকার পরিচয় বা আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কিছুমাত্র না বুঝিয়াও, আবার তাহাকে দেখিবার আশায় সেই সমুদ্রসৈকতে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরিয়া কাটাইলেন। নবকুমারের এই মোহ কখনই কাটে নাই। ইহাই নবকুমার চরিত্রের কেন্দ্রীয় দুর্বলতা এবং এই দুর্বলতাই তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত শোচনীয় পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছে। কাহার কোমল করস্পর্শ হইল—অপরিচিত পুরুষের দেহ স্পর্শ করায় কপালকুণ্ডলার সরলতা ও সামাজিক রীতিবিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশিত হইতেছে।

এখনও পালাও—নবকুমারকে পুনরায় সাবধান করিয়া দিল এবং বিপদের কথা স্পষ্টভাবে বলিয়া গেল। এইবার নবকুমার বুঝিতে পারিলেন, কাপালিক তাঁহাকে বলির জন্য লইয়া যাইতেছে এবং এই রহস্যময়ী নারী তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্যই চেষ্টা করিতেছে।

হস্তধারণ করিল—কাপালিক দেখিল কপালকুণ্ডলা সবই বলিয়া দিয়াছে। সুতরাং নবকুমার যাহাতে হাতছাড়া হইতে না পারে সেজন্য তাহার হাত ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিতেছে। এখন আর কাপালিক নবকুমারের নিকট তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে দ্বিধা করিল না, সে স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিল যে, তাহাকে বধার্থ পূজার স্থানে লইয়া যাইতেছে।

তোমার জন্ম সার্থক হইল—কাপালিক তাহার দৃঢ় বিশ্বাসবলেই এ কথা বলিতেছে। কাপালিক যতই ক্রূরকর্মা ও ভীষণ হউক তান্ত্রিক সাধনপ্রণালীতে সে বিশ্বাসী।

একবার জন্মভূমি মনে পড়িল—নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়া অপরিচিত

স্থানে অবাঞ্ছিত মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া নবকুমারের নিজের বাড়ীর কথা মনে হইলে, মৃত পিতামাতার মুখ মনে পড়িল। ইহা অতি স্বাভাবিক।

চুরি করিয়া রাখিয়াছি—কপালকুণ্ডলার কোমল হৃদয়ের পরিচয় আমরা পূর্বেই পাইয়াছি, তাহার বুদ্ধি, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কাপালিক নবকুমারকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ভাল করিয়া চারিদিক দেখিবার অভিপ্রায়ে কাপালিক এক উচ্চ বালিয়াড়ির শিখরে উঠিল। বর্ষার জল-প্রবাহে বালিয়াড়ির নীচের অংশ ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল। স্তূপ ভাঙ্গিয়া কাপালিককে লইয়া ভীষণ শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।

কাপালিকের পতন তুলনা করিবার জন্য মেকলের 'Lays of Ancient Rome' হইতে একজন মহাবীরের পতনের তুলনা করা হইয়াছে। ঐখানে বলা হইয়াছে বজ্রাহত হইয়া যেমন প্রকাণ্ড ওক্ গাছ পাহাড়ের উপর পড়িয়া যায়, মর্মান্তিক আঘাতে লুনার অধীশ্বর সেইভাবে পড়িয়া গেলেন।

না খড়্গ না কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইয়া—খড়্গ কিংবা কপালকুণ্ডলা কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া। ইংরাজী ভাষার প্রভাব বাক্যাংশটির উপর পড়িয়াছ। ছিন্ন লতাবন্ধনের উপর দৃষ্টি পড়িল—বলি দিবার খড়্গ আনিতে গিয়া কাপালিক খড়্গ খুঁজিয়া পাইল না, অথচ খড়্গ পূজার স্থানে কাপালিক পূর্ব হইতে রাখিয়া গিয়াছিল। লতাবন্ধনে আবদ্ধ নবকুমারকে পূজার স্থানে রাখিয়া কাপালিক খড়্গের সন্ধানে গেল, কিন্তু খড়্গ পাইল না, কপালকুণ্ডলাকেও দেখিল না। ফিরিয়া আসিয়া দেখে নবকুমার নাই, লতাবন্ধন কর্তিত হইয়া পড়িয়া আছে। সুতরাং কপালকুণ্ডলা যে পূর্ব হইতে নবকুমারকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত ছিল, খড়্গ যে সে-ই লুকাইয়া রাখিয়াছিল এবং বন্ধন খড়্গদ্বারা কাটিয়া সে-ই নবকুমারকে মুক্ত করিয়াছে এবং নিরাপদ স্থানে যে সেই নবকুমারকে লইয়া চলিতেছে এই সমস্ত কথা কাপালিকের নিকট এখন অতি সহজবোধ্য হইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে লইয়া অন্ধকার রাত্রিতে বহু পথ অতিক্রম করিয়া রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় কালীসাধক অধিকারীর নিকট উপস্থিত হইল। অধিকারী সমস্ত শুনিয়া গম্ভীর হইলেন, কাপালিকের কোপ হইতে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে

রক্ষা করিতেই হইবে। নবকুমারকে মেদিনীপুরের রাস্তায় রাখিয়া আসা কঠিন হইবে না, কিন্তু কপালকুণ্ডলা কাপালিকের নিকট ফিরিয়া গেলে তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। নবকুমারের সঙ্গে যদি কপালকুণ্ডলার বিবাহ হয় ও বিবাহিতা স্ত্রী লইয়া নবকুমার যদি দেশে ফিরিয়া যান তবেই সকল দিক রক্ষা হইতে পারে। অধিকারী প্রথমে কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ কি তাহা বুঝাইলেন এবং নবকুমারের সহিত বিবাহে তাহাকে রাজী করাইলেন। তারপর নবকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বিবাহের কথা পাড়িলেন। নানা কৌশলে অধিকারী নবকুমারকে বুঝাইলেন, নবকুমার যদি কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিয়া দেশে লইয়া যান তবেই বালিকার প্রাণ রক্ষা পায়, নতুবা কাপালিক কিছুতেই কপালকুণ্ডলাকে ক্ষমা করিবেন না। কাপালিকের হাতে নবকুমারের যে দশা হইতেছিল, কপালকুণ্ডলার ভাগ্যেও তাহাই হইবে। নবকুমার নিজের প্রাণ দিয়াও এই বালিকাকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত—কারণ এই বালিকাই তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। কিন্তু নবকুমার উৎকণ্ঠিত ও বিহ্বল-ভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন, তৎক্ষণাৎ বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারিলেন না।

সেক্সপীয়ারের 'রোমিও ও জুলিয়েট' নাটকের এই ছত্রটি উদ্ধৃত করিয়া ইহার সহিত কপালকুণ্ডলাকে লইয়া নবকুমারের সপ্তগ্রাম যাত্রার সম্ভাবনার সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে।

তদ্বর্ত্মসংবর্তী হওয়া—কপালকুণ্ডলা যে-পথ দিয়া চলিতেছে সেই পথেই পিছনে পিছনে চলা।

আমার অঞ্চল ধর—সামাজিক কোন জ্ঞান বা নারীসুলভ কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ থাকিলে কপালকুণ্ডলা এই কথা বলিতে পারিত না। করতললগ্নশীর্ষ হইয়া—হাতের উপর মাথা রাখিয়া। অধিকারীর অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত ভাবের দ্যোতক। কেবল নবকুমারের প্রাণরক্ষা নয়, কাপালিকের ক্রোধ হইতে কপালকুণ্ডলাকেও রক্ষা করিতে হইবে, কি উপায়ে সবদিক বজায় রাখিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায় এইজন্যই অধিকারীর এত চিন্তা। মহাপুরুষ—অধিকারী কাপালিকের ধর্মসাধনার প্রক্রিয়া সমর্থন না করিলেও কাপালিককে অলৌকিক শক্তিশালী পুরুষ বলিয়া বেশ ভয় ও খানিকটা ভক্তিও করে।

অধিকারীর সঙ্গে কপালকুণ্ডলার কথায় কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নির্ণীত হইল। গ্রন্থি এইভাবে পড়ে, জটিলতা এইভাবে বর্ধিত হয়। পরের উপকার করিতে গিয়া নবকুমার পরিত্যক্ত হইল। বিপন্ন নবকুমারের প্রাণরক্ষা করিতে

গিয়া অরণ্যপালিতা নবকুমারের সান্নিধ্যে আসিল। কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের রোষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্নেহপ্রবণ অধিকারী কপালকুণ্ডলার বিবাহের প্রস্তাব করিতেছে। পূর্বে কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইয়া রাজী করিয়া পরে নবকুমারের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছে।

এখন যাইতে বল কেন ?—কাপালিকের কবল হইতে পরিত্রাণের সহজ উপায় নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার দেশান্তরে গমন. কিন্তু কপালকুণ্ডলা অধিকারীর মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া চিন্তাগ্রস্ত হইল। অধিকারীর যখন এক যুবকশিষ্য আশ্রমে আসিয়াছিল তখন অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে তাহার সহিত মিশিতে বারণ করিয়াছিল, কপালকুণ্ডলার এই কথাটি মনে আছে। সেইজন্য সে বুঝিতে পারিতেছে না, অধিকারী আবার নবকুমারের সঙ্গে তাহাকে কেন যাইতে বলিতেছে।

দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন—অধিকারী স্বহস্তে প্রত্যহ দেবীর পূজা করে, সংসারের সমস্ত কর্মে দেবীর আশীর্বাদ ও অনুমোদন প্রার্থনা করে। বিল্বপত্র যখন দেবীর চরণ হইতে পড়িয়া গেল না,তখন দেবী প্রসন্নমনে উহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে অভিলাষ বা প্রার্থনা লইয়া বিল্বপত্র অর্পিত হইয়াছে তাহা সিদ্ধ বা শুভ হইবে। এই অদৃষ্টবাদিতা, অলৌকিক বিশ্বাস কপালকুণ্ডলার চরিত্রেও সংক্রামিত হইয়াছিল।

অধিকারী ঈষন্মাত্র হাস্য করিয়া—ষোল বৎসরে বাঙ্গালীর মেয়েকে বিবাহ কাহাকে বলে তাহাও বুঝাইয়া বলিতে হইতেছে, এইজন্য মনের এই অবস্থায়ও অধিকারীর একটু হাসি পাইল। বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া কপালকুণ্ডলার 'কি করিতে হইবে' প্রশ্নে হাসি পাওয়াটাই স্বাভাবিক।

জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা—অরণ্যজীবনে কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে যৌবনোচিত কোনও ভাবের বিকাশ হয় নাই, সামাজিক জীবনের কোনও অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না। সমাজে ক্ষুদ্র শিশুও বিবাহ কি বুঝিতে পারে। কিন্তু কাপালিক ও অধিকারীর সান্নিধ্যে শৈশব হইতেই তাহার মনে একটা প্রবল ধর্মভাব ছিল, অধিকারী তাহা জানিতেন বলিয়াই তিনি ঠিক স্থানে আঘাত করিয়াছিলেন। ভবানী-ভক্তি-পরায়ণার পক্ষে ইহার বেশী জানিবার প্রয়োজন নাই, বিবাহ যখন স্ত্রীলোকের ধর্ম, স্বয়ং জগন্মাতা কালীও যখন শিবের বিবাহিতা, তখন বিবাহে আর বাধা কি ?

অধিকারী মনে করিলেন সকলেই বুঝাইলেন—এক কথায় বিবাহের মত জটিল ব্যাপার সহজে বুঝাইয়া অধিকারী নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু যাহার কোন সামাজিক

জ্ঞান জন্মে নাই তাহাকে সব কথা, বিবাহের অপরিসীম দায়িত্ব কি করিয়া বুঝান যাইবে ?

কপালকুণ্ডলাও মনে করিলেন সকলই বুঝিলেন—বিবাহ যে একটা সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপার, ইহা যে কেবল একটি ধর্ম অনুষ্ঠান মাত্র নয়, ইহা কপালকুণ্ডলা বুঝিলেন না।

তিনি যে এতদিন আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন—কপালকুণ্ডলার বুদ্ধি, সাহস, চতুরতা ও করুণার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই কথায় তাহার যে একটা কর্তব্যজ্ঞান ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে। কাপালিক যত মন্দই হউক সে তাহাকে এতদিন পালন করিয়াছে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত নয় এই উক্তিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে।

অধিকারীর ঘটনাবলীর বর্ণনা বড়ই উপভোগ্য।

অধিকারী প্রথমে কপালকুণ্ডলার বিপদের কথা পাড়িলেন। কাপালিকের আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাওয়া ভিন্ন বাঁচিবার আর উপায় নাই। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের জীবন রক্ষা করিয়াছে, স্থতরাং তাহার উপকারের জন্ম নবকুমার নিজের প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে একথা অধিকারী জানিতেন। কিন্তু সহজভাবে বিবাহের কথা তুলিয়া প্রস্তাব করিলে নবকুমার এক কথায় যদি তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া দেন, এই ভয়ে নানাভাবে গৌরচন্দ্রিকা করিয়া পরে আসল ব্যাপারটার উল্লেখ করিতেছেন। নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার এস্থান হইতে পলায়ন প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়, কিন্তু উহা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কপালকুণ্ডলার পরিচয় বিশেষভাবে না জানিয়া নবকুমার কি কপালকুণ্ডলাকে সঙ্গিনী করিয়া লইবেন ? সঙ্গিনী করিয়া লইলেও নিজগৃহে কি এই অপরিচিতাকে আশ্রয় দিবেন ? আশ্রয় দিলে নবকুমারের আত্মীয়স্বজনই বা কি মনে করিবে ? আর এতদিনের পথ অধিকারীই বা নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলাকে পাঠাইবে কি করিয়া ? এত কথা বলিয়া এবং প্রতি কথায়ই কপালকুণ্ডলার উপকার করিতে নবকুমারকে উৎস্থক দেখিয়া অবশেষে বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন।

এই প্রসঙ্গে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ' নামক প্রবন্ধে বীরেশ্বর পাঁড়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন—নবকুমারের সঙ্গে যাওয়া ভিন্ন তাঁহার (কপালকুণ্ডলার) প্রাণরক্ষার আর কোন উপায়ই নাই ; কিন্তু অপরিচিত যুবকের সহিত যুবতী কপালকুণ্ডলার যাওয়াও ত উচিত নয়। স্থতরাং সে সময় উহাদের পরস্পরের বিবাহ ভিন্ন কপালকুণ্ডলার ধর্ম ও প্রাণরক্ষার আর কোন উপায় ছিল না। এ অবস্থায় আধুনিক অনেক গ্রন্থকারও তাহাদের জাতির কথা

যে তুলিতেন না এবং বিবাহ যে গান্ধর্ববিধানেই সম্পন্ন করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্কিমবাবু এরূপ প্রয়োজনীয় স্থলেও তাহা করেন নাই। তিনি অধিকারীকে কন্যাকর্ত্তা করিয়া তাঁহার দ্বারা যথানিয়মে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অধিকারী অগ্রে নবকুমারের পরিচয় লইলেন; তাঁহার গাঁইগোত্র প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া যখন জানিলেন বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে তখন নবকুমারের নিকট বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। পরে অধিকারী পুঁথি দেখিয়া লগ্ন স্থির করিলেন এবং তাঁহাদের উভয়কেই যথাবিধানে উপবাসাদি করাইয়া তাহাদের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। "এ অবস্থায় যতদূর সম্ভব ততদুর যথাশাস্ত্র কার্য্য হইল।"

নবকুমার শয্যা হইতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন—উপর্যুপরি অপ্রত্যাশিত ঘটনা নবকুমারের জীবনে ঘটিতেছে, কিন্তু এ অবস্থায় কপালকুণ্ডলার সহিত বিবাহের প্রস্তাব এবং বিবাহ আগামী দিনেই হইবে ইহা নবকুমারের মত ধীরপ্রকৃতিকেও চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে।

রাঢ় দেশের ঘটকালি কি ভুলিয়া গিয়াছি না কি?—নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন এ সম্মতি তখন তখনই নবকুমারের নিকট আদায় করিতে না পারিয়া অধিকারী নিজের ক্ষমতার উপর সন্দিহান হইলেন। যে রকম সুন্দরভাবে তিনি বিবাহের পক্ষে নবকুমারের নিকট যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল নবকুমার বিবাহে রাজী হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি দিবেন। যাহারা ঘটকালি করে তাহারা কথার কৌশলে কানা ছেলেকে পদ্মলোচন প্রতীয়মান করায় ও অতি কুরূপাকেও সুন্দরী বলিয়া চালায়। ঘটকের এ অঘটন-ঘটন শক্তিও কি হ্রাস পাইয়াছে? অধিকারী পূর্বে ঘটকালী করিতেন ও এ বিষয়ে তাঁহার বেশ হাতযশ ছিল ইহা বুঝা যায়।

নবম পরিচ্ছেদ

সারা রাত্রি বিনিদ্রভাবে কাটাইয়া নবকুমার চিন্তা করিয়াছেন। অধিকারী যখন প্রভাতে নবকুমারের নিকট আসিলেন তখন তিনি দেখিলেন নবকুমার শয়ন করেন নাই। অধিকারী আসিতেই নবকুমার জানাইলেন—কপালকুণ্ডলা তাঁহার ধর্মপত্নী, তাহার জন্য যদি সংসার ত্যাগ করিতে হয় তাহাতেও নবকুমার প্রস্তুত। যাহা হউক, সেইদিনই গোধূলি লগ্নে উভয়ের বিবাহ হইল। অধিকারী কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

কাপালিকের কোন সংবাদ নাই। অধিকারী, নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে মেদিনীপুরের পথ পর্যন্ত রাখিয়া আসিবেন। যাত্রার পূর্বে কপালকুণ্ডলা দেবীমূর্তিকে

প্রণাম করিতে গেল। প্রতিমার পায়ের উপর একটি বিল্বপত্র রাখিল। কিন্তু পত্রটি পড়িয়া গেল। কপালকুণ্ডলার ধর্মসংস্কার প্রবল, সে ভীত হইল। কিন্তু অধিকারী বুঝাইলেন—চিন্তা করিয়া লাভ নাই। পতিই স্ত্রীলোকের ধর্ম, পতি শ্মশানে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীকেও শ্মশানে যাইতে হইবে। মেদিনীপুরের পথে তুলিয়া দিয়া অধিকারী বিদায় হইলেন। কিছু অর্থ সঙ্গে দিলেন, উহা দ্বারা কপালকুণ্ডলার জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা হইতে পারিবে। কপালকুণ্ডলা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল।

কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের চতুর্থ অঙ্ক হইতে শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রার সময় মহর্ষি কণ্বের যে কথাটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার অর্থ—"কাঁদিয়া কি লাভ? স্থির হও, এই দিকে পথ দেখিয়া চল।"

বাস্তবিকই কপালকুণ্ডলার কাঁদিতে কাঁদিতে বনভূমি ত্যাগের দৃশ্য শকুন্তলার তপোবন ত্যাগের দৃশ্যই মনে করাইয়া দেয়। মহর্ষি কণ্ব যেমন শকুন্তলাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, এখানেও অধিকারী তেমনি কপালকুণ্ডলাকে উপদেশ দিতেছেন।

খুঙ্গী—বাঁশ বা বেতের প্রস্তুত পুঁথিপত্র রাখিবার ঝাঁপি। গোধূলিলগ্নে—গোধূলিলগ্ন বিবাহের পক্ষে প্রশস্ত হইলেও অগ্রহায়ণ ও মাঘমাসে "গোধূলিঃ প্রাণনাশিকা"। নিয়তির গতি কিছুতেই রোধ করা যায় না, তাই অধিকারীরও মতিভ্রম হইল, দিনক্ষণ দেখিয়া এই প্রাণনাশক লগ্নেই তিনি কপালকুণ্ডলার বিবাহ দিলেন। কপালকুণ্ডলার ভাগ্যেই অধিকারীর এই ভুল হইল। ইহা যে একটা দুর্নিমিত্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

পত্রটি পড়িয়া গেল—দেবী প্রসন্নমনে অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন না, এই বিবাহে মঙ্গল হইবে না, কপালকুণ্ডলার গভীর ধর্মভাব ও সংস্কারের উপর এই বিল্বপত্রচ্যুতি সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সংসারে প্রবেশ করিয়াও হয়তো এইজন্যই সে সংসারী হইতে পারে নাই, নবকুমারের সান্নিধ্যে থাকিয়াও হয়তো এই দুর্নিমিত্ত স্মরণ করিয়াই সে অনাসক্ত বৈরাগ্যময় জীবন যাপন করিয়াছে। প্রকাণ্ড একটা আশঙ্কা বুকে লইয়া সে সংসারে বিচরণ করিয়াছে, একদিনের জন্যও সে সংসারে মন বসাইতে পারে নাই।

এখন নিরুপায়—যথাশাস্ত্র বিবাহ হইয়া গিয়াছে, নবকুমারের সঙ্গে বিবাহিতা পত্নীরূপে কপালকুণ্ডলা যাইতেছে, এখন আর ফিরিবার উপায় নাই, সর্ব অবস্থায় স্বামীর অনুগমন পত্নীর কর্তব্য।

পতি শ্মশানে গেলে তোমাকেও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে—পরম স্নেহশীল অধিকারীর মুখ হইতে হঠাৎ একি কথা বাহির হইল! কপালকুণ্ডলার ভাগ্যে এই বাণীই অতি নিষ্ঠুরভাবে ফলিয়াছিল; শেষ দৃশ্যে শ্মশানে নবকুমার যখন

কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আনিতে চলিল, কল্যাণকামী পিতৃকল্প অধিকারীর মুখ হইতে অতর্কিতে যাহা উচ্চারিত হইল, কপালকুণ্ডলার ভাগ্যে তাহাই ফলিল। ইহাই নিয়তির পরিহাস, ইহার নামই irony.

উপন্যাসের প্রথমখণ্ড নয়টি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হইল। পরোপকারী উদার-হৃদয় এক ব্রাহ্মণ যুবক নির্জন সাগরকূলে স্বজনকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ভীষণদর্শন ক্রূরকর্মা এক কাপালিকের কবলে পড়িল। এই যুবকই উপন্যাসের নায়ক। বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে পথহারা নবকুমারের সঙ্গে কাপালিকপালিতা বনবিহারিণী এক নায়িকার সাক্ষাৎ হইল। এই বালিকাই উপন্যাসের নায়িকা কপালকুণ্ডলা এবং এই উপন্যাসের মূল গল্পই এই বালিকার জীবনের পরিণতি অবলম্বন করিয়া রচিত। কপালকুণ্ডলা, কাপালিকের হাত হইতে নবকুমারকে রক্ষা করিল, প্রেমের বশবর্তী হইয়া নহে, নারীর স্বাভাবিক করুণার বশবর্তী হইয়া। কপালকুণ্ডলার সমাজসম্বন্ধে কোনও লজ্জা নাই। কোনও লজ্জা বা আড়ষ্টভাব তাহার মধ্যে দেখা যায় না। অপরিচিত যুবকের সহিত মেলামেশা করা দোষ মাত্র এইটুকুই সে জানে, কিন্তু কেন দোষ তাহা বুঝে না। বিবাহসম্বন্ধে বিশেষ কোনও স্পষ্ট ধারণা তাহার নাই। কিন্তু কাপালিক ও অধিকারীর সংস্পর্শে বাস করার ফলে তাহার মনে ধর্মভাব খুব প্রবল। কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে রক্ষা করায় কাপালিক তাহাকে বলিরূপে উৎসর্গ করিতে পারে নাই, মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লওয়াতে কাপালিকও কপালকুণ্ডলার বিরোধী হইল, এ অপরাধ সে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না, কাপালিকের রোষ হইতে কপালকুণ্ডলাকে রক্ষা করিবার উপায় কি? ইহাই কপালকুণ্ডলার জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্ত; অধিকারী এই আসন্ন সঙ্কটের সমাধান করিয়া দিলেন নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহ দিয়া। এই সঙ্কট কাটিল, কিন্তু কপালকুণ্ডলার সরল জীবনের জটিলতার সৃষ্টি হইতে লাগিল। সদ্যোবিবাহিতা বধূরূপে স্বামীর অনুগমন করিবার প্রাক্কালে কপালকুণ্ডলার স্বহস্তার্পিত বিল্বপত্র কালীপ্রতিমার চরণ হইতে পড়িয়া গেল, দেবী বিল্বপত্র গ্রহণ করিলেন না। এই ঘটনাটি নায়িকার সংসার-প্রবেশের পথে তাহার হৃদয়ে গভীরভাবে প্রবেশ করিল, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা যে তাহাকে সারাজীবন চিন্তাকুল করিয়া রাখিবে তাহা কপালকুণ্ডলার ত্রস্তবিহ্বল ভাব হইতেই বুঝা গেল। প্রতিনায়িকা মতিবিবি নবকুমারের প্রথমা স্ত্রীর পরিচয় ও উল্লেখ প্রথম খণ্ডেই প্রসঙ্গক্রমে দেওয়া হইয়াছে। অরণ্যবাসিনী অরণ্যজীবন সমাপ্ত করিয়া জটিলতাময় সামাজিক জীবনে প্রবেশ করিতে যাইতেছে। সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিবে কি-না, সমাজের বন্ধন অরণ্যপালিতা মানিয়া লইতে পারিবে কি-না এই কৌতূহল পাঠকচিত্তে জাগ্রত করিয়া উপন্যাসের প্রথম খণ্ড শেষ হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

উপন্যাসের প্রতিনায়িকা, কপালকুণ্ডলার প্রতিদ্বন্দ্বিনী মতিবিবির উল্লেখ আমরা প্রথম খণ্ডে পাইয়াছি। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা তাহার সাক্ষাৎ লাভ করি।

এই মতিবিবির চরিত্র মাত্র একটি কথাতেই বঙ্কিমচন্দ্র পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া নবকুমার অন্ধকার রাত্রিতে চটির নিকট ভগ্নশিবিকা দেখিলেন, নিকটে কেহ আছে কিনা জানিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিলেন। স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর আসিল, নবকুমারের মনে হইল বোধ হয় এ কণ্ঠ কপালকুণ্ডলার। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কপালকুণ্ডলা না কি? উত্তর আসিল, কপালকুণ্ডলা কে তা জানি না, আমি পথিক, আপাততঃ দস্যুহস্তে নিষ্কুণ্ডলা হইয়াছি। দস্যুদলের আবির্ভাবে বাহক ও দূতগণ পলায়ন করিয়াছে, দুই একজন নিহতও হইয়াছে, দস্যুরা রমণীকে বস্ত্রদ্বারা পাল্কীর সহিত দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া দেহ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় সাধারণতঃ রমণীদের সংজ্ঞা লোপ হইবারই কথা, কিন্তু একটুও বিহ্বল বা ভীত না হইয়া প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ পরিহাস করিয়া সে উত্তর দিল—'নিষ্কুণ্ডলা হইয়াছি'। দস্যুরা কান হইতে মাকড়ি ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে এই কথাটিই 'কপালকুণ্ডলা'র সহিত মিলাইয়া 'নিষ্কুণ্ডলা' শব্দ প্রয়োগ করিয়া জানাইল। উপস্থিতবুদ্ধি ও ব্যঙ্গমিশ্রিত পরিহাস করিবার ক্ষমতা তাহার অসাধারণ। বিপদে যে এরূপ নির্ভীক, কোন ভাগ্যবিপর্যয় যে তাহাকে সহজে দমাইতে পারিবে না তাহা আমরা মাত্র এইটুকু দেখিয়াই বুঝিতে পারি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কপালকুণ্ডলাকে লইয়া নবকুমার সপ্তগ্রাম চলিয়াছেন। অধিকারী যাহা দিয়াছিলেন তাহা দিয়া কপালকুণ্ডলার জন্য একখানি শিবিকা ও সঙ্গে একজন রক্ষী ও একটি পরিচারিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। শিবিকা আগে আগে যাইতেছিল, নবকুমার কয়েকদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত বলিয়া অনেকটা পিছনে পড়িয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। চটিতে কপালকুণ্ডলার শিবিকা পৌঁছিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিবে। কিন্তু চটি আর পান না। এক প্রহর রাত্রি হইল—নবকুমার দ্রুত চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার পায়ের নীচে মড়মড় শব্দে কি যেন ভাঙিয়া গেল। তিনি একটি ভাঙা পাল্কী দেখিলেন। কপালকুণ্ডলার

জন্য তিনি চিন্তিত হইলেন। একটি মৃতদেহে তাঁহার পাদস্পর্শ হইল। তারপর কাতরকণ্ঠে ডাকাডাকি করিয়া একটি রমণীর সন্ধান পাইলেন। রমণী কিছু আহত হইয়াছিল। সে নবকুমারের স্কন্ধে ভর করিয়া চটি পর্যন্ত হাঁটিয়া গেল। কপালকুণ্ডলা ঐ চটিতে পূর্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

স্ত্রীলোকটি মূঢ়ের কার্য্য করিল না—দস্যুদ্বারা প্রহৃত হইয়া রমণী অন্ধকার রাত্রিতে অপরিচিত পুরুষের কাঁধে ভর করিয়া চলিল। যে পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের পূর্বেই দিয়াছেন, তাহাতে রমণী যে মূঢ়ের কাজ করিবে না তাহা আগেই বুঝিয়াছিলাম। তাহার রসবোধ যেমন, বুদ্ধি এবং সাহসও তেমনি।

দুষ্ক্রিয়া—দস্যুতা, ডাকাতি বা লুটপাট।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবকুমার যে নারীকে লইয়া চটিতে গেলেন, সে অসামান্যা সুন্দরী। নবকুমার বিস্মিতনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন। প্রকৃতিচপলা এই নারী ("কৈষা যোষিৎ প্রকৃতিচপলা") কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়াই নবকুমারের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করিল এবং নবকুমারকে নিজের মুখরতায় সপ্রতিভ করিয়া তুলিল। নবকুমারের পত্নী সুন্দরী শুনিয়া তাহাকে দেখিবার বাসনাও ব্যক্ত করিল। এই নারী নিজেকে পশ্চিমদেশীয়া মুসলমানী বলিয়া পরিচয় দিল ও নিজের নাম বলিল 'মতি'। উত্তরে নবকুমার নিজের বাসস্থান সপ্তগ্রাম ও নিজের নাম 'নবকুমার' বলিতেই রমণী প্রদীপটি নিভাইয়া দিয়া মুখের ভাব গোপন করিল।

আসলে এই রমণী নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী।

একটু বিস্তৃতভাবে বঙ্কিমচন্দ্র মতিবিবির রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের বর্ণনার প্রভাব আছে সত্য, কিন্তু বর্ণনার মধ্য দিয়া স্বভাবচঞ্চলা এই নারীর প্রকৃতিটি চমৎকারভাবে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা এই যুবতীর সকল দেহ জুড়িয়া লাবণ্যের একটা তরঙ্গ যেন খেলিয়া যাইতেছিল। ইহার রূপের মধ্যে ছিল একটা আকর্ষণ। তাহার উজ্জ্বল নয়নে একটা স্বপ্নাবেশ, চঞ্চল কটাক্ষে একটা কামনা। ভাদ্র মাসে ভরা নদীর মত পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের একটা জোয়ার যেন সকল অঙ্গে উছলিয়া উঠিয়াছিল।

সর্ব্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব—স্ত্রীলোকের বুদ্ধি প্রখর হইলেও সকল ব্যাপারে বা সকল বিষয়ে এই বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না। অনেক ব্যাপারে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কিছুমাত্র খোলে না। কিন্তু মতিবিবির বুদ্ধির বহুমুখিতা আছে।

আত্মগরিমা—ইহা কেবল রূপের অহঙ্কার নয়। রূপ, গুণ, বুদ্ধি সকল মিলিয়া মনে একটা দৃপ্তভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। আত্মপ্রত্যয় অর্থাৎ নিজের উপর একটা সুগভীর অখণ্ড বিশ্বাস হইতেই এই ভাব জন্মে।

আপনি কি দেখিতেছেন, আমার রূপ ?—রসিকতা ও প্রগল্‌ভতা ও সাহস সবই এই নারীর চরিত্রে একসঙ্গে মিশিয়াছে। রাজধানীতে আমীর-ওমরাহ্ চরাইতে যে অভ্যস্ত সে দরিদ্র একটি গ্রাম্য যুবকের সহিত এরূপ কথাবার্তা বলিবে তাহা আর বিচিত্র কি !

আপনি কি কখনও স্ত্রীলোক দেখেন নাই—নবকুমারকে অপ্রতিভ ও নিরুত্তর দেখিয়া এই প্রগল্‌ভা নিরস্ত হইল না। এমন ভঙ্গিতে ও এমন ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসির সহিত কথা বলিল যে, ইহার পর নিতান্ত বোবা না হইলে কাহারও পক্ষে নিরুত্তর থাকা সম্ভব নয়।

অভাগিনী বাঙ্গালী নহে—ইহা হয়তো মুসলমানী কায়দায় শিষ্টাচার। মতিবিবি এখনই নিজেকে অভাগিনী কেন মনে করিবে ?

প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিল—'সপ্তগ্রাম' নাম শুনিয়াই মতিবিবির পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সম্মুখে যে যুবক দাঁড়াইয়া সে তবে কে ? নবকুমারও তো হইতে পারে। স্পষ্টভাবে যাহাতে যুবককে দেখিতে পারা যায় সেজন্য মতিবিবি প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিল।

প্রদীপ নিভিয়া গেল—প্রদীপ হঠাৎ নিভে নাই, বাতাসেও নিভে নাই। প্রদীপ নিভাইয়া দিয়াছে মতিবিবি নিজে। কিন্তু কেন ? এই প্রগল্‌ভা নিতান্ত অপরিচিতা হইয়াও নবকুমারের সঙ্গে পরিহাস করিয়াছে, কিন্তু নবকুমারকে যখন চিনিতে পারিল তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোভাব ও মুখভাবের পরিবর্তন ঘটিল। এই পরিবর্তন মতিবিবি গোপন রাখিতে চায়, নবকুমার যেন এই পরিবর্তিত মুখভাব দেখিতে না পায়, এইজন্যই মতিবিবি প্রদীপ নিভাইয়া দিয়াছে। নবকুমারের নিকট মতিবিবি মাত্র 'মুখরা বিদেশিনী' রূপেই পরিচিত হইতে চায়।

প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে নবকুমার মতিবিবিকে দেখিয়া পদ্মাবতী বলিয়া চিনিতে পারিবে এ আশঙ্কা বৃথা। কিন্তু হঠাৎ নবকুমারকে চিনিতে পারিয়া মতিবিবির মুখভাবে পরিবর্তন আসিয়াছিল, এই প্রকৃতিচপলা যেরূপ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল, পূর্বস্মৃতি তাহাকে মুহূর্তের জন্য যেরূপ উন্মনা করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে ঐ অবস্থায় মতিবিবিকে দেখিলে নবকুমারের সন্দেহ হইত। প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াই সে নিজেকে সামলাইয়া

লইয়াছে, তারপর যখন প্রদীপ আসিল তখন মতিবিবি নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। এখানকার শিল্পকৌশল লক্ষণীয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছিল। অন্য প্রদীপ জ্বালাইয়া আনা হইল। তখন মতিবিবির রক্ষী ও ভৃত্যগণ আসিয়া পড়িল। তাহারা শিবিকার পিছনে পড়িয়াছিল। শিবিকা ভগ্ন দেখিয়া তাহারা খুব ভয় পাইয়াছিল। মতিবিবি কপালকুণ্ডলাকে দেখিবে। সে নানা অলঙ্কারে নিজ দেহ সজ্জিত করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের স্ত্রী অদ্বিতীয়া রূপসীকে দেখিতে চলিল। নবকুমার বলিলেন যে, তাঁর স্ত্রীর একখানিও অলঙ্কার নাই, সুতরাং এত অলঙ্কার পরিবার প্রয়োজন ছিল না। যাহা হউক কপালকুণ্ডলা মাটির উপর যেখানে বসিয়া আছে সেখানে মতিবিবি উপস্থিত হইয়া তাহাকে দেখিল। মতি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মতি নিজের অলঙ্কারগুলি খুলিয়া কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিল। নবকুমার আপত্তি করিলেন। কিন্তু মতি নিষেধ শুনিল না। মতি অলঙ্কার পরাইয়া বলিল, এরূপ সুন্দরী রাজধানীতেও দেখা যায় না। ভগবানের কৃপায় মতির অলঙ্কারের অভাব নাই। যে অলঙ্কারগুলি মতি দিয়াছে তাহা পরাইয়া মাঝে মাঝে মুখরা বিদেশিনীকে যেন নবকুমার স্মরণ করেন।

নিজের দেহ হইতে অলঙ্কারগুলি খুলিয়া কপালকুণ্ডলার দেহে পরাইবার যে ভাব তাহার সহিত রতি দুর্গার দেহে যে অলঙ্কার পরাইয়া তাঁহার মোহিনী মূর্তি সাজাইতে ছিল তাহার আংশিক সাদৃশ্য আছে। মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করাইতে দুর্গা যোগাসন পর্বতে যাত্রা করিতেছেন। রতি দুর্গার দেহ অনুমতি লইয়া সাজাইতেছে।

মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গ হইতে উদ্ধৃতিটুকু দেওয়া হইয়াছে।

বিদেশিনী কিয়ৎকাল করলগ্নকপোলা হইয়া বসিয়া রহিলেন—মতিবিবির পূর্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল; যে এখনও ঘর বাঁধিতে পারে নাই, সারাজীবন কেবল বহুলোকের সহিত ভালবাসার অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু যথার্থভাবে একজনকেও ভালবাসিতে পারে নাই, তাহার চিত্তে বিবাহিত জীবনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। মন তাহার আলোড়িত, মথিত হইয়া উঠিতেছে।

স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া—এই ভোগৈশ্বর্যময়ী বিলাসিনীর মধ্য হইতে তাহার শাশ্বত নারীটি বোধ হয় মুহূর্তের জন্য জাগিয়া উঠিয়াছিল। বিবাহিত জীবনে স্মৃতি কত পুরাতন অস্পষ্ট মলিন, সে জীবন তাহার নিকট স্বপ্নের মত বোধ হইতেছিল।

স্বপ্ন ভাঙ্গলে যেমন মানুষ জাগিয়া উঠিয়া বাস্তব সত্যের সম্মুখীন হয়, মতিবিবির ঠিক তাই হইল।

পূর্ব্ববৎভাবে—সেই পূর্বের পরিহাস-তরল ভাষায় বা ভঙ্গিতে। মতিবিবির নিজেকে সামলাইয়া লইবার ক্ষমতা অসাধারণ। অন্তরের উদ্বেগ ও ভাবান্তর গোপন রাখিয়া একেবারে স্বাভাবিকভাবে কথা বলার জন্য যে প্রখর বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব দরকার তাহার অভাব মতিবিবির নাই।

অধর পার্শ্বে ও নয়নপ্রান্তে ঈষৎ হাসি ব্যক্ত হইল—প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে মতিবিবি কপালকুণ্ডলাকে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই। একটু দেখিয়া তাহার চোখে মুখে ব্যঙ্গের মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এই তবে অদ্বিতীয়া রূপসী?

মতির মুখ গম্ভীর হইল—কপালকুণ্ডলাকে ভাল করিয়া দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই মতি বুঝিতে পারিল ইহার সৌন্দর্য অপূর্ব। নিজের রূপের গর্ব তাহার ম্লান হইল, মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, মুখ গম্ভীর হইল।

মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা—মতিবিবির ভুল ভাঙ্গিয়াছে, রূপের গর্বে তাহাকে যে পরাজিত করিতে পারে সেই নিরাভরণা অপূর্ব সুন্দরী সে অনিমেষ-লোচনে দেখিতে লাগিল। একটা সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় লইয়াই সে কপালকুণ্ডাকে দেখিতে আসিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, যে রূপ যুবরাজের হৃদয় জয় করিতে পারে তাহা সামান্য নয়। কিন্তু বনদুহিতার স্বাভাবিক শোভার মাধুর্য দেখিয়া অহঙ্কারিণী মুগ্ধ হইয়া গেল। মতিবিবি এই পরাজয়কে অতি সুন্দরভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, নারীর স্বাভাবিক ঈর্ষ্যা বা এ ক্ষেত্রে স্বপত্নীবিদ্বেষ তাহার মনকে কপাল-কুণ্ডলার প্রতি কিছুমাত্র বিরূপ তো করেই নাই, মুগ্ধ প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে সে অন্তরের পূজা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ধন্য মনে করিয়াছে। অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া কপাল-কুণ্ডলাকে পরাইবার কারণও ইহাই।

কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা—কপালকুণ্ডলার বিস্ময়ের কারণ কি? মতিবিবির সর্বাঙ্গে অলঙ্কার দেখিয়া কি কপালকুণ্ডলার আশ্চর্য বোধ করিতেছে? আমাদের তো মনে হয় তাহারই মত একটি নারী তাহার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকাইয়া আছে, ইহাই তাহার বিস্ময়ের কারণ। তাহার মধ্যে দেখিবার জিনিষ কিছু আছে কপালকুণ্ডলার একথা কোনদিন মনে হয় নাই; নারীর অঙ্গে অলঙ্কাররাশি ঝলমল করিতেছে, ইহাও সে যেমন এখন প্রথম দেখিল, তেমনি তাহার দিকে অনিমেষলোচনে কেহ চাহিয়া থাকিতে পারে ইহাও এখন প্রথম অনুভব করিল।

আত্মশরীর হইতে অলঙ্কাররাশি মুক্ত করিয়া একে একে কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে

লাগিলেন—কপালকুণ্ডলার আভরণহীন দেহের স্বাভাবিক লাবণ্য ও শোভা দেখিয়া মুগ্ধ মতিবিবি অলঙ্কার পরাইলে ইহার সৌন্দর্য কতখানি বৃদ্ধি পায় তাহা দেখিবার জন্য নিজের অঙ্গের অলঙ্কার কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিল।

কপালকুণ্ডলা কিছু বলিলেন না—এইরূপ ছোট ছোট একটি বাক্যে কপাল-কুণ্ডলার আসল চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। একজন নারী আর একজন অপরিচিতা নারীকে নিজ দেহ হইতে বহুমূল্য অলঙ্কার খুলিয়া পরাইয়া দিতেছে ইহা মোটেই স্বাভাবিক ব্যাপার নয়; কিন্তু কপালকুণ্ডলার কাছে সমাজ জীবনের রীতি-নীতি একেবারেই অজ্ঞাত। সুতরাং কোন্‌টা স্বাভাবিক, কোন্‌টা অস্বাভাবিক এ বোধ যখন তাহার নাই, স্বর্ণালঙ্কারের মূল্যসম্বন্ধেও যখন সে কিছুমাত্র সচেতন নয়, তখন এই ব্যাপারে তাহার হর্ষ বা সঙ্কোচ কোনও ভাবই আসিতে পারে না। অর্থহীন দৃষ্টি মেলিয়া সে কেবল সমস্ত ব্যাপারটা দেখিতেছিল মাত্র।

ইহাকে পরাইয়া যদি সুখবোধ হয়—কপালকুণ্ডলার প্রতি স্বপত্নীত্ব-বোধ জাগে নাই ইহা নিশ্চিত, কিন্তু গোপন প্রদেশে নবকুমারের প্রতি একটা স্নিগ্ধ প্রীতি, একটা আকর্ষণ হয়তো জাগিয়াছে। পেষ্‌মন পরে নির্জনে যখন নবকুমারের পরিচয় জানিতে চাহিল, তখন মতিবিবি পরিচয় দিয়াছে—মেরা শৌহর। ইহা কি কেবল পরিহাস!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মতিবিবির দেওয়া সমস্ত অলঙ্কার একটি ভিক্ষুক ভিক্ষা চাহিলে কপালকুণ্ডলা তাহাকে দিয়া দিল। হাতীর দাঁতের কৌটা সহিত সমস্ত অলঙ্কার পাইয়া ভিক্ষুক অবাক। খানিকক্ষণ নির্বাক থাকিয়া পরে এদিক-ওদিক চাহিয়া ভিক্ষুক ছুটিয়া পলাইল। কপালকুণ্ডলা অলঙ্কারের মূল্য ও মর্ম জানে না, সে ভাবিল ভিক্ষুক পলাইল কেন?

এই পরিচ্ছেদে যে ছত্র কয়টি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গ হইতে গৃহীত। কথাগুলি সীতার উক্তি। কপালকুণ্ডলার অলঙ্কার খুলিয়া দেওয়া ও সীতার অলঙ্কার খুলিয়া চিহ্ন হেতু পথে পথে নিক্ষেপ করার মধ্যে মাত্র একটি বাহ্য সাদৃশ্য আছে। সীতা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেহের অলঙ্কার পথে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি অলঙ্কারের মূল্যসম্বন্ধে অচেতন ছিলেন না। কিন্তু কপালকুণ্ডলার সামাজিক কোন জ্ঞান নাই। নির্লিপ্তভাবে সে গহনাগুলি ভিক্ষুককে দিয়াছিল।

এই পরিচ্ছেদটি অতি ক্ষুদ্র। ইহাতে একটিমাত্র ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তগ্রামের দিকে শিবিকারোহণে যাওয়ার সময় কপালকুণ্ডলার নিকট এক ভিক্ষুক

ভিক্ষা চাহিল। কপালকুণ্ডলার নিকট কিছুই নাই, ভিক্ষুককে সে কি দিবে। ভিক্ষুক গায়ের অলঙ্কার দেখাইয়া বলিল, সে কি, যাহার গায়ে এত হীরা-মুক্তা, তাহার কিছু নাই ? কপালকুণ্ডলা ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা করিল গহনা পাইলে সে সন্তুষ্ট হয় কিনা। ভিক্ষুক শুনিয়াই চমকিয়া গেল—তবে বুঝি গহনাই ভিক্ষা পাওয়া যাইবে। গহনার কৌটাটি ও নিজের গায়ের অলঙ্কারগুলি কপালকুণ্ডলা ভিক্ষুককে দিয়া দিল। ভিক্ষুক প্রথমে খানিক বিস্মিত হইল, পরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলায়ন করিল। কপালকুণ্ডলা মনে মনে ভাবিতে লাগিল—তাইতো, ভিক্ষুক দৌড়িল কেন !

ঘটনা হিসাবে উপন্যাসের মধ্যে এই পরিচ্ছেদটির মূল্য কিছু নাই, কিন্তু কপাল-কুণ্ডলার চরিত্রের উপর আলোকসম্পাত করিবার জন্যই এই অলঙ্কারদান-প্রসঙ্গের অবতারণা। সামাজিক ব্যাপারে যে কপালকুণ্ডলা কতখানি অনভিজ্ঞ, সমাজের মানুষ যাহাকে মহামূল্য বলিয়া মনে করে তাহার নিকট উহা যে একেবারেই মূল্যহীন—ভিক্ষুককে অলঙ্কার দান করাতে ইহাই বুঝা যাইতেছে। ভিক্ষুক সম্মুখে হাত পাতিয়া দাঁড়াইলে কেহ যে গহনার বাক্সটি ভিক্ষুকের হাতে তুলিয়া দেয় না, ইহা সামাজিক জীবনে শিশুরও অজানা নয়, কিন্তু কপালকুণ্ডলা তাহা জানে না। নারীর নিকট অলঙ্কার অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু সামাজিক জীবনেই ইহার মূল্য। সমাজ-জীবনের প্রভাবের বাহিরে প্রকৃতির কোলে যে প্রতিপালিত হইয়াছে তাহার কাছে হীরা-মুক্তা-সোনা-দানার মূল্য কি ? ভিক্ষুক এত মূল্যবান্ জিনিষ পাইয়া পাছে কেহ দেখিতে পায়, পাছে কেহ ইহাতে ভাগ বসায় বা কাড়িয়া লয় এই ভয়ে ছুটিয়া পলাইল, কিন্তু সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতা কপালকুণ্ডলার একেবারেই ছিল না বলিয়া ভিক্ষুকের দ্রুত পলায়নটাও তাহার কাছে অস্বাভাবিক মনে হইল।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের মত এত সুন্দর বাহুল্যবর্জিত রচনা সমস্ত সাহিত্যেই বিরল। গল্পাংশের বিকাশের জন্য অথবা চরিত্রচিত্রকে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদটি প্রকৃতিদুহিতার সরলতা ও অনভিজ্ঞতার জীবন্ত চিত্র। সামাজিক জীবনসম্বন্ধে শোচনীয় অজ্ঞতাই কপালকুণ্ডলার জীবনের বিষাদময় পরিণতির প্রধান কারণ, সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র এই অনভিজ্ঞতার স্বরূপটি পূর্ব হইতেই নানাভাবে আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া নবকুমারের মাতা মৃতপ্রায় হইয়াছেন। বাড়ীতে নবকুমারের জন্য আত্মীয়-পরিজনের রোদনধ্বনি তখনও থামে নাই। সুতরাং

নবকুমার যখন সস্ত্রীক বাড়ী আসিয়া উঠিলেন তখন কেহ জিজ্ঞাসা করিল না যে, নববধূ কোন্ জাতীয়া, কাহার কন্যা। নবকুমারের মাতা মহা সমাদরে বধূবরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। নবকুমার একটু চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন—বাড়ীর লোকেরা নববধূকে সাদরে গ্রহণ করিবে কিনা এ বিষয়ে তাঁহার একটা দুর্ভাবনা ছিল। কিন্তু এখন সে আশঙ্কা দুর হওয়াতে কপালকুণ্ডলার প্রতি প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যথার্থ প্রণয় জন্মিলে সংসার মধুর ও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, নবকুমারেরও তাহাই হইল।

মেঘদুত হইতে উদ্ধৃত দুইটি ছত্রে যক্ষপত্নীর প্রতি যক্ষের অনুরাগের তীব্রতা প্রকাশিত হইয়াছে। আননের স্পর্শলাভের আশায় কানের কাছে মুখ লইয়া সে কথা কহিত। কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের ঠিক ঐরূপ অনুরাগ জন্মিয়াছিল বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে মেঘদূতের পংক্তি দুইটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সধবা হইয়াও বিধবা—সেকালে কুলীন ব্রাহ্মণ বহু বিবাহ করিত, বিবাহিতা পত্নীগণ অধিকাংশ সময় পিত্রালয়ে কাটাইত, স্বামীর সহিত বাস করিবার সৌভাগ্য তাহাদের হইত না।

অবস্থান্তর—অবস্থা অন্য প্রকার হইলে অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে চাহিতেছেন যে, নবকুমারের মত কুলীন ব্রাহ্মণ যুবক হঠাৎ অজ্ঞাতকুলশীলা একটি বালিকাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সহজে নববধূকে অভিনন্দন জানাইত না, বরং নূতন বধূকে ঘরে তুলিবার জন্য নবকুমারকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত। নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে ইহা সকলেই মনে করিয়াছিল, সেই নবকুমার যখন বধূ লইয়া ঘরে আসিলেন, 'তখন তাহাকে কে জিজ্ঞাসা করে যে তোমার বধূ কোন্ জাতীয়া বা কাহার কন্যা? সকলেই আহ্লাদে অন্ধ হইল।'

নবকুমার তত সাহসী পুরুষ নহে, পলাইতে পারিল না—সাহসের পরিচয় পলায়নে—শ্লেষটি উপভোগ্য। উপকারীকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়া যাহারা নিজেরা কাপুরুষ ও অমানুষের মত প্রাণ লইয়া পলায়, এ উক্তি তাহাদের মুখেই মানায়। এই আশঙ্কাতেই······অকস্মাৎ সম্মত হয়েন নাই—কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্যও ছিল অসামান্য। কিন্তু অধিকারী যখন বিবাহের প্রস্তাব করেন তখন নবকুমার সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহে সম্মতি দান করেন নাই কেন? সারারাত্রি বিনিদ্র কাটাইয়া তাহাকে কর্তব্য স্থির করিতে হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে চাহেন যে, বাড়ীর লোক কপালকুণ্ডলাকে কি চক্ষে দেখিবে, কপালকুণ্ডলা আত্মীয়-স্বজনের নিকট বধূরূপে সমাদৃত হইবে কিনা, এ সম্বন্ধে নবকুমারের মনে যথেষ্ট আশঙ্কা ও সন্দেহ ছিল

এই আশঙ্কাতেই……প্রণয়সম্ভাষণ করেন নাই—নব-বিবাহিতা পত্নীকে লইয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু প্রণয়সম্ভাষণ করেন নাই। অদৃষ্টে কি আছে, কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে আত্মীয়-স্বজনের মনোভাব কিরূপ হইবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া নবকুমার চিত্তপ্রবৃত্তিকে এতদিন সংযত রাখিয়াছিলেন।

জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধকারী উপলমোচনে যেরূপ দুর্দম স্রোতাবেগ জন্মে—স্রোতের মুখে প্রস্তরস্তূপ থাকিলে জলের প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু সেই প্রস্তরের বাধা যদি দূরীভূত হইয়া যায় তবে স্রোত আর বাধা মানে না, চারিদিক প্লাবিত করিয়া বহিয়া যায়। প্রণয়ের যে আবেগ ও উচ্ছ্বাস নবকুমারের হৃদয় হইতে উৎসারিত হইতে চাহিতেছিল তাহার উপর ছিল আশঙ্কার পাষাণ বাঁধ, কপালকুণ্ডলা পরিবার মধ্যে কিভাবে গৃহীত হইবে সে-সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা। কিন্তু সে অন্তরায় দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবকুমারের স্নেহের উচ্ছ্বাস প্রবল আকার ধারণ করিল। এই পরিচ্ছেদের শেষাংশে নবকুমারের প্রকৃতির পরিবর্তনের মধ্য দিয়া নবকুমারের হৃদয়ে প্রেমাবির্ভাবের অতি সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে প্রণয়সম্ভাষণের একটা দৃশ্য সৃষ্টি করিয়া হৃদয়াবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাসের অনেক সুন্দর সুন্দর কথা দেওয়া যাইত, সাধারণ লোকের পক্ষে এ লোভ সংবরণ করাও কঠিন হইত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সংযম কৃতিত্বের পরিচায়ক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তগ্রামের এক নির্জন প্রান্তে নবকুমারের বাড়ী, বাড়ীর পিছনে এক বিস্তৃত বন। নবকুমারের বাড়ী একেবারে সামান্য নয়, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের উপযুক্ত। এই বাড়ীর ছাদের উপর দাঁড়াইয়া কপালকুণ্ডলা ও শ্যামাসুন্দরী কথা বলিতেছিল। কপাল-কুণ্ডলার নাম মৃন্ময়ী রাখা হইয়াছে। শ্যামাসুন্দরী নবকুমারের ভগ্নী। মৃন্ময়ী কেন চুল বাঁধে না, কেন গৃহস্থ বধূর মত সাজ-সজ্জা করে না, খোঁপায় ফুল ও কানে দুল দেয় না, ইহা লইয়া শ্যামাসুন্দরী মৃন্ময়ীকে অনুযোগ করিতেছে। কিন্তু মৃন্ময়ী সংসারে মন বসাইতে পারিতেছে না,—তাহার মনে হয় যদি পূর্বের মত স্বাধীনভাবে সমুদ্র তীরবর্তী বনে বেড়াইতে পারিত তবে বোধ হয় সুখ হইত। শ্যামাসুন্দরী বিস্মিত হয়—এত যত্ন, এত আদর, এমন স্বামী তবু মৃন্ময়ীর সংসারে মন বসে না কেন? ইহার উত্তরে মৃন্ময়ীর নিকট হইতে শ্যামাসুন্দরী যাহা শুনিল তাহাতে সে রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিল। স্বামীর সহিত যাত্রা করিবার পূর্বে কপালকুণ্ডলা ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিয়াছিল। কিন্তু মা ত্রিপত্র ধারণ করিলেন না—। সুতরাং সংসার কপালকুণ্ডলার পক্ষে সুখের হইবে না।

কুমারসম্ভব হইতে উদ্ধৃত পংক্তি কয়টিতে উমার তপস্বিনীর বেশের বর্ণনা আছে। যৌবনের প্রারম্ভেই সমস্ত আভরণ ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধবয়সের উপযুক্ত বল্কল তিনি পরিধান করিয়াছিলেন। ইহার সহিত কপালকুণ্ডলার যোগিনী বেশধারণের সাদৃশ্য আছে।

কাপালিকের আশ্রম হইতে কপালকুণ্ডলা বধূরূপে সপ্তগ্রামে আসিল। নবকুমারের দিক্ হইতে নববধূর অভ্যর্থনা ও সমাদরের কোন ত্রুটি হয় নাই। নূতন পরিবেশের মধ্যে আসিয়া কপালকুণ্ডলার কতখানি পরিবর্তন হইয়াছে, আরণ্যজীবনের আকর্ষণ সে কতটা ভুলিতে পারিয়াছে এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কপালকুণ্ডলাকে এই আমরা প্রথম দেখিতেছি। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে পরিপূর্ণ সমাজিক পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত করেন নাই। আমাদের মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ ইচ্ছা করিয়াই এরূপ করিয়াছেন। নির্জন বনভূমি হইতে তুলিয়া আনিয়া একেবারে সপ্তগ্রামের দ্বিতল কক্ষে কপালকুণ্ডলাকে বসাইলে কপালকুণ্ডলা হাঁপাইয়া উঠিত। তাই নব-কুমারের বাসস্থান নগরের অভ্যন্তরে স্থাপিত না করিয়া নগরের প্রান্তভাগে নির্ধারিত করিয়াছেন। সেখানে মনুষ্যসমাগম বিশেষ ছিল না, রাজপথও লতাগুল্মাদিতে পূর্ণ থাকিত, আর বাসস্থানের পশ্চাতেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন ছিল। এ যেন অরণ্যেরই সমজাতীয়।

সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির খানিকটা বর্ণনার অবকাশ ছিল, জনাকীর্ণ নগরের সামাজিক জীবনের একটা পরিচয় দিলেও অস্বাভাবিক হইত না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এ পথে যান নাই। একদিকে নিবিড় বন, অন্যদিকে দূরে নগরীর সৌধমালা, আর একদিকে অনেক দূরে ভাগীরথীর বক্ষে সন্ধ্যাতিমির গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে।

বাড়ীর ছাদের উপর শ্যামাসুন্দরীর সহিত আমরা কপালকুণ্ডলাকে সন্ধ্যাকালে দেখিতেছি। স্পষ্ট দিবালোকে কপালকুণ্ডলাকে আমরা একবারও দেখি নাই এবং দেখিব না। অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলিয়াছেন ঃ "এই গ্রন্থের অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে সমুদ্রের উপকূলে, তীরস্থিত স্তূপশিখরে, নদীর তীরে, কাননতলে; সর্ব্বাপেক্ষা তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাপার সাধিত হইয়াছে প্রদোষে অথবা অন্ধকারে। স্থান ও কালের এই সঙ্গতি লোকাতীত শক্তির ইঙ্গিত দেয়।"

মৃন্ময়ী—মৃন্ময়ী নামটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। কপালকুণ্ডলা এই নামটির মধ্যে সংসার ও সমাজের কোনও সংশ্রব নাই, কিন্তু মৃন্ময়ী নামটির মধ্যে সংসারের সমস্ত বন্ধন ও মাটির সম্বন্ধ আছে। অসামাজিক বিকট নামটির পরিবর্তে এই সহজ নামটি রাখা সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু কপালকুণ্ডলা মৃন্ময়ী হইতে পারিল কৈ ?

শৈশবাভ্যস্ত কবিতা—সমাজে যাহারা মানুষ হয়, সামাজিক রীতি-নীতি-হাবভাব তাহারা অতি শৈশব হইতেই শিখিয়া থাকে। নরনারীর মিলনের যে রহস্য তাহা সামাজিক শিশুও বুঝে। শ্যামাসুন্দরী যে ছড়া শুনাইতেছে তাহা সে শৈশবেই শিখিয়াছিল। প্রকৃতির মধ্যে একে অন্যকে চায়, এই চাওয়াই তো জীবনের ধর্ম। কপালকুণ্ডলার তবে এ উদাসীনতা কেন? সংসারের ভোগে এই অনাসক্তি তো তপস্বিনীর আচরণ? সংসারে প্রবেশ করিয়া, সবদিকে মনের মত ঘর-বর পাইয়াও কপালকুণ্ডলা অসুখী কেন, শ্যামাসুন্দরী বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু এজন্য শ্যামাসুন্দরী বিরক্ত হয় নাই, বরং গভীর সমবেদনা লইয়াই যোগিনীকে সংসারিণী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের নাম দিয়াছেন 'অবরোধ'। স্বাধীনভাবে যে বনে বিচরণ করিয়াছে তাহাকে সমাজ-জীবনের বিধি-নিষেধ দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, বন্য বিহঙ্গিনীকে অবরুদ্ধ করা হইয়াছে, তাই কি সমাজ-জীবন তাহার নিকট দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে?

মৃন্ময়ী কেবল ঈষৎ হাসিয়া শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন—কপালকুণ্ডলাকে আমরা হাসিতে দেখি না। প্রকৃতি তাহার চঞ্চল হইলেও তাহাতে তারল্যের লেশমাত্র নাই। কিন্তু মৃন্ময়ী হাসিল কেন? চুল না বাঁধিবার জন্য অনুযোগ ইতিমধ্যেই সে শ্যামাসুন্দরীর নিকট বহুবার শুনিয়াছে, কিন্তু চুল বাঁধিলে যে কি লাভ হয় তাহা নিজেই বুঝিতে পারে না। একই অনুযোগ পুনরায় শুনিয়া মৃন্ময়ী তাই ঈষৎ হাসিল।

কত দিন যোগিনী থাকিবে—বেশভূষা-প্রসাধনসম্বন্ধে তরুণী বিশেষতঃ নব-বিবাহিতারা মনোযোগী হইবে ইহাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কপালকুণ্ডলার এ ঔদাসীন্য কেন? গৃহস্থের বধূ—কিন্তু সাজ-সজ্জা তপস্বিনীর মত কেন?

ব্রাহ্মণ সন্তান—স্বামী নয়, ব্রাহ্মণ সন্তান। নবকুমারের প্রতি প্রেম বা আকর্ষণ বা মোহ কিছুই কপালকুণ্ডলার মনে জন্মে নাই।

মেয়েমানুষেরও পরশপাথর আছে—শ্যামাসুন্দরী ঠিকই বুঝিয়াছিল যে, পুরুষের বাতাসে যোগিনী গৃহিণী হইয়া যায়। কিন্তু কপালকুণ্ডলা যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত বর্ধিত হইয়াছে সমাজের বাহিরে অরণ্যে, সে দেখিয়াছে অসামাজিক তান্ত্রিক সাধক কাপালিককে আর ভৈরবীর পূজারী অধিকারীকে। সুতরাং নারীপ্রকৃতির মধ্যে যে প্রণয়-পিপাসা তাহা বিকশিত হয় নাই। একটা প্রবল ধর্মভাব ও একটা অহেতুক ভয় তাহার জীবনকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। সম্পূর্ণ সামাজিক পরিবেশ পাইলে

সে হয়তো যোগিনী থাকিত না, নিয়তি চারিদিক্ হইতে বিরূপ না হইলে সে হয়তো একদিন পরশপাথর আবিষ্কার করিত। তপস্বিনীর মধ্য হইতেই একদিন শাশ্বত নারীটি জাগিয়া উঠিয়া আপনার অধিকার বুঝিয়া লইবে, আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠ হইবে, শ্যামাসুন্দরী এইরূপই মনে করিয়াছিল।

তুই সেই পাথর ছুঁয়েছিস্—শ্যামাসুন্দরী এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, কপালকুণ্ডলার এ অনাসক্তি কেন? সে মনে করে অনাসক্তি যত প্রবলই হউক, উদারহৃদয় প্রেমিক স্বামীর হাতে যখন পড়িয়াছে, তখন তাহার বৈরাগ্যভাব দূর হইবেই। সংসারে সাধারণ নারীরা যাহা কামনা করে তাহা পাইলে তাহার ভ্রাতৃবধূ অসুখী হইবে কেন?

সোনার পুত্তলি ছেলে—ছেলে কোলে ফেলিয়া দিলে শেষ পর্যন্ত শ্যামাসুন্দরীর কথাই ফলিত সন্দেহ নাই। পত্নীত্ব অপেক্ষা মাতৃত্ব হয়তো সহজেই কপালকুণ্ডলার জীবনে বিকশিত হইয়া উঠিত। সন্তানের জননী করিয়া কপালকুণ্ডলা-চরিত্রকে রহস্যময় রাখা যাইবে না এই আশঙ্কায় বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলাকে জননীরূপে অঙ্কিত করেন নাই। অর্থাৎ পূর্ণসামাজিক প্রতিবেশে তাহাকে স্থাপন করেন নাই।

ভাল বুঝিলাম—তাহা হইলেই বা কি সুখ—কোনও বিবাহিতা নারী, যে স্বামীকে ভালবাসে, দশজনের একজন হইয়া থাকিতে চায় তাহার মুখ দিয়া এই সমস্ত কথা পরিহাসচ্ছলেও বাহির হইতে পারে না।

শ্যামাসুন্দরীর মুখকান্তি গম্ভীর হইল—নারী হইয়া জন্মিয়াছে, বধূরূপে স্বামীর ঘরে আসিয়াছে, অথচ সংসার-জীবনের আসল সুখই যে, যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার সুখের মধ্য দিয়া নিজের আনন্দ উপলব্ধি করা, এই সহজ কথাটা কপালকুণ্ডলা বুঝিতে পারিতেছে না। আত্মকেন্দ্রিক হইয়া কেবল স্বার্থানুসন্ধান করিলে সংসার চলে না, আবার নিঃস্পৃহ উদাসী হইয়াও সংসারে বাস করা যায় না।

যদি তোমার মত কলি হইতাম, তবে ফুটিয়া সুখ হইত—একজন স্বামিপ্রেমে বঞ্চিত হইয়াও প্রেম-পিপাসায় আকুল, অন্যজন স্বামীর অগাধ প্রেমলাভ করিয়াও উদাসীন। শ্যামা পায় নাই বলিয়াই তাহার আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই, সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া সে সুখী হইতে চায়।

বোধ করি সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে—আরণ্যজীবনের স্মৃতি এখনও কপালকুণ্ডলা ভুলিতে পারে না। অতীত জীবন, বনে বনে সেই স্বাধীন বিচরণ তাহাকে এখনও প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে, সামাজিক জীবনের বাধা-নিষেধ তাহার নিকট দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে।

তাহাদের ঘরে আসিয়া মৃন্ময়ী যে সুখী হয় নাই, উপকৃত হয় নাই একথা জানিয়া শ্যামা একটু বিরক্ত হইয়াছিল, একটু দুঃখিত এবং একটু রুষ্টও হইয়াছিল, কিন্তু ভ্রাতৃবধূর মুখে সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। এই হাসিতে দুঃখ ও রাগ নিঃশেষ হইয়া উড়িয়া গেল।

যাহা কপালে আছে, তাহাই ঘটিবে—নিজের কিছু করিবার নাই, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। দুর্জ্ঞেয় অদৃষ্টসম্বন্ধে একটা আশঙ্কা ও অদৃষ্টের বিধানের উপর একটা প্রবল বিশ্বাস কপালকুণ্ডলার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কপালকুণ্ডলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কথাটি বলায় শ্যামাসুন্দরী সান্ত্বনা দিতেছে। শ্যামাসুন্দরী এখনও কপালকুণ্ডলার আসল কথাটি জানিতে পারে নাই। পরিপূর্ণ সুখের সম্ভাবনা যেখানে সেখানে কপালকুণ্ডলা বিমনা উদাসীন হইয়া থাকে; সেজন্য সে মনে করিয়াছে কপালকুণ্ডলা অবুঝ, খাপছাড়া, তাহার ব্যবহার অসঙ্গত, তাহার খেয়ালের কোন অর্থ নাই। কিন্তু দেবীর চরণ হইতে বিল্বপত্রচ্যুতির কথা শ্যামাসুন্দরী জানিত না। এই প্রথম কপালকুণ্ডলার মুখ হইতে সে একথা শুনিল। কপালকুণ্ডলা এই কথাই প্রথমদিন অধিকারীকে বলিয়াছিল, এতদিন পরেও সে একথা ভুলিতে পারে নাই, বরং যতই দিন গিয়াছে, এই ঘটনা তাহার চিত্তে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। এক মুহূর্তের জন্যও সে এই আশঙ্কার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। সংসারে এইজন্যই সে মন দিতে পারিতেছে না, সমস্ত সুখ এইজন্যই তাহার বিস্বাদ বোধ হইতেছে। শ্যামাসুন্দরী এত কথা জানিত না।

শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন—শ্যামাও হিন্দুনারী, ধর্মসংস্কার তাহারও আছে। মৃন্ময়ীর মুখ হইতে বিল্বপত্রচ্যুতির কথা শুনিতে শুনিতে সেও অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিয়াছিল, দৈব প্রতিকূল একথা জানিতে পারিয়া সেও আর ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই, এই দুর্নিমিত্ত যে ভাবী অমঙ্গলের সূচনা করিতেছে তাহা কল্পনা-চক্ষে দেখিয়া তাহার মন ভয়ে ও নিরাশায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মৃন্ময়ীকে একটা সান্ত্বনার কথাও আর বলিতে পারিল না।

দ্বিতীয় খণ্ডে নববিবাহিতা কপালকুণ্ডলা বধূরূপে স্বামীর ঘরে আসিয়াছে। পথে তাহার যে পরিচয় পাওয়া গেল তাহাতে মনে হয় সমাজের অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে সে বাঁচিবে কেমন করিয়া! সমাজসম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই, অনেক বিষয়ে তাহার সংস্কার পর্যন্ত জন্মে নাই। সমাজ তাহাকে আপনার করিয়া লইবার জন্য চেষ্টা ত্রুটি করিতেছে না। নবকুমারের আত্মীয়স্বজন মহাসমাদরে নববধূ বরণ করিয়াছে। নবকুমারের প্রেম বাক্যে ব্যক্ত না হইলেও স্পষ্টভাবে তাহার

ব্যবহারে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু কপালকুণ্ডলার প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হইতেছে না, তাহার মনে কোনও ভাবান্তর হইতেছে না। শ্যামার যত্ন ও চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে, পরশপাথর স্পর্শ করিয়াও যোগিনী গৃহিণী হইতেছে না। এই সময়ে সহৃদয় পাঠক অধিকারীর অভাব অনুভব করিবে। সমাজ ও অরণ্য এই দুই সীমার মাঝখানে দাঁড়াইয়া অধিকারীই এই মিলন ঘটাইয়াছিল। কপালকুণ্ডলার সমাজের কোনও জ্ঞান নাই। অধিকারীর যোগ ছিল সমাজ ও অরণ্য উভয়ের সঙ্গে। কপালকুণ্ডলার জীবনের সঙ্গে যদি অধিকারীর যোগ ছিন্ন হইয়া না যাইত, তবে কপালকুণ্ডলার জীবন স্বাভাবিকভাবেই চলিত। কিন্তু তাহা হইল না। "পতি শ্মশানে গেলে তোমাকেও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে"—এই আশীর্বাদ লইয়া সে স্বামীর গৃহে আসিল। যাত্রার প্রাক্কালে দেবী যে বিল্বপত্র গ্রহণ করেন নাই, সে কথা কপালকুণ্ডলা একদিনের জন্যও ভুলিতে পারে নাই। ধর্মসংস্কার তাহার প্রকৃতিতে অতি প্রবল, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে একটা পরম অমঙ্গল একেবারে আসন্ন উদ্যত হইয়া আছে, সে সংসারে মন বসাইবে কি করিয়া!

কিন্তু ইহাতেও কপালকুণ্ডলার জীবনের পরিণতি হয়তো বিষাদময় হইত না। সংসারের যত্নে ও চেষ্টায় তাহার প্রকৃতির হয়তো পরিবর্তন হইত, অরণ্যের স্বাধীন প্রকৃতি হয়তো স্বেচ্ছায় সংসারের কারাগারে বন্দিনী হইত। কিন্তু ভবিতব্য অন্যরূপ। ইহারই ইঙ্গিত পাইলাম আমরা কপালকুণ্ডলার নবজীবনের প্রবেশপথে উল্কারূপিণী মতিবিবির আবির্ভাবে। মতিবিবি নবকুমারের প্রথমা পত্নী পদ্মাবতী। ঐশ্বর্যবিলাসের সমারোহের মধ্যে বিচরণকারিণী এই নারী প্রদীপের শিখাকে উজ্জ্বলতর করিয়া যখন নিজের স্বামীকে চিনিয়া লইল, তখন তাহার মনে যে ভাব জাগিয়াছিল তাহা কি? তাহা যদি প্রেম হয়, মতিবিবি যদি কপালকুণ্ডলার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হয়, তবে কপালকুণ্ডলাকে রক্ষা করিবে কে?

এই ইঙ্গিতটি আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে পাইলাম; কপালকুণ্ডলা যে ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কায় সর্বক্ষণ শঙ্কান্বিত তাহা যে ভক্তিপরায়ণা বালিকার মনের কুসংস্কারমাত্র নয়, তাহার আভাস পাইলাম।

তৃতীয় খণ্ড

সমগ্র তৃতীয় খণ্ড প্রতিনায়িকা মতিবিবির কাহিনী। আগ্রার ঐশ্বর্যবিলাসের মধ্যে বাস করিয়া, ভারতসাম্রাজ্য পরিচালনার দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যাহার কাল কাটিল, নিয়তির পরিহাসে সেই হইল কপালকুণ্ডলার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। যে ঘটনাবিপর্যয় ও মতিবিবির যে অদৃষ্ট তাহাকে আগ্রা হইতে সপ্তগ্রামে লইয়া আসিল সমগ্র তৃতীয় খণ্ডে তাহারই বর্ণনা।

এই অংশে উপন্যাস অনেকটা ইতিহাসের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কপালকুণ্ডলাকে লইয়া নবকুমার সপ্তগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন, মতিবিবি বর্ধমানের দিকে যাত্রা করিলেন। মতিবিবি বর্ধমানে কেন যাইতেছেন এবং ইহার পূর্বে তিনি কোথায় গিয়াছিলেন সেই সমস্ত বৃত্তান্ত এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

মতিবিবি গোপনে বহুলোককে কৃপা বিতরণ করিত, তাহার প্রণয়ীদিগের মধ্যে যুবরাজ সেলিম একজন। মতিবিবির পিতা কন্যার দুশ্চরিত্রতার জন্য বিরক্ত হইয়া যখন তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, তখন মতি আসিয়া সেলিমের প্রধানা মহিষী মানসিংহের ভগ্নীর সহচরী হইল। সেলিমের উপর মতিবিবির এতখানি আধিপত্য জন্মিল যে, সকলেই মনে করিল মতিবিবি পাটরাণী হইবেন। কিন্তু মেহেরউন্নিসার সহিত সেলিমের অনুরাগের কথা মতিবিবি জানিত। যদিও মেহেরউন্নিসা শের আফ্গানের পত্নী, কিন্তু সেলিম যখন সিংহাসনে বসিবেন তখন শের আফ্গানের কাঁধে মাথা থাকিবে না। মেহেরউন্নিসা যদি সেলিমের অনুরাগিণী হয় তবে সে-ই ভারতের সম্রাজ্ঞী হইবে। মতিবিবির ঈর্ষ্যা হইল।

এদিকে সেলিমকে বঞ্চিত করিয়া খসরুকে সিংহাসনে বসাইবার যে ষড়যন্ত্র হইতেছিল তাহাতে মতিবিবি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়া সে উড়িষ্যা গিয়াছিল। মতিবিবির ভাই উড়িষ্যার মনসবদার। যদি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবার ফলে ষড়যন্ত্রকারীদের কোন বিপদ হয় তবে উড়িষ্যা হইতে যেন সাহায্য পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্য লইয়াই মতিবিবি উড়িষ্যা গিয়াছিল। উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া বর্ধমান যাইবার পথে মতির সহিত নবকুমারের সাক্ষাৎ হয়।

মতিবিবির মনে কোন স্নেহ নাই। সেলিমকেও কোনও দিন সে ভালবাসিতে পারে নাই। সেলিমের হৃদয় জয় করিয়া অর্থ, ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা লাভ করা যাইবে এই

আকাঙ্ক্ষা লইয়াই সে সেলিমের সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করিত। কিন্তু যখন সে বুঝিতে পারিল যে, ভারত-সম্রাজ্ঞী হইবার আশা দুরাশা মাত্র, মেহেরউন্নিসাই এ-পদে অধিষ্ঠিতা হইবে তখন মেহেরউন্নিসার সহচরী হইয়া রংমহালে জীবন যাপন করার চিন্তা তাহার অসহ্য মনে হইল। সে সর্বেসর্বা হইয়া থাকিবে, কাহারও অধীন হইবে না। মতিবিবির এই মনোভাবের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই রত্নাবলী নাটকের "কষ্টোঽয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ" কথাটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

মতির চরিত্র মহাদোষে কলুষিত, মহৎগুণেও শোভিত—মতিবিবি সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যাদিতে সুশিক্ষিতা ; তাহার বুদ্ধিমত্তা, তেজস্বিতা ও সাহস প্রশংসনীয়, তাহার বাগবৈদগ্ধ্য অসাধারণ—এইগুলি তাহার চরিত্রের গুণ। কিন্তু মতিবিবি রূপ-গর্বিতা, শিক্ষা তাহার চরিত্রের সংযম আনিতে পারে নাই, প্রবৃত্তিদমনে তাহার শক্তি বা ইচ্ছা নাই, এইগুলি তাহার চরিত্রে গুরুতর দোষ।

উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পাটরাণী হইবেন—যুবরাজ সম্রাট্ হইয়া যখন সিংহাসনে আরোহণ করিবেন তখন লুৎফউন্নিসা সম্রাজ্ঞী হইবেন।

সেলিমকে ত্যাগ করিয়া খস্রুকে আকবরের সিংহাসনে স্থাপিত করা অসম্ভাবনীয় বোধ হইবার কারণ ছিল না—সম্রাট্ আকবর যখন যুদ্ধব্যপদেশে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গমন করেন, তখন সেলিমকে রাজা মানসিংহ ও শাহ কুলী খাঁর সঙ্গে যোগ দিয়া মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে আদেশ দিয়া যান। কিন্তু সেলিম পিতার আদেশ অমান্য করিয়া আগ্রা ত্যাগ করেন এবং এলাহাবাদে উপনীত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেলিম বীরসিংহ বুন্দেলা নামক একজন দস্যু দলপতির সাহায্যে সম্রাটের প্রিয়পাত্র আবুল ফজলকে নিহত করেন। আকবর অত্যন্ত শোকার্ত হইয়া এই সময় সখেদে বলিয়াছিলেন, 'সেলিম যদি সম্রাট্ হইতে চায় তবে আবুল ফজলকে হত্যা না করিয়া আমাকে হত্যা করিলেই পারিত।' এই সময়ে সেলিমের উপর অনেকেই বিরক্ত হয় ও সেলিমের পুত্র খস্রুকে সিংহাসনে বসাইবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়।

"The imperial court was the scene of the worst intrigues. A plot was formed to deprive Salim of succession to the throne and was joined by such grandees of the empire as Raja Man Singha and Aziz Koka. They were actuated by personal and political reasons to set aside the claims of Salim in favour of Khusru, Salim's eldest son, a young lad of seventeen, who had married Aziz Koka's daughter." (Iswari Prosad—*History of Muslim Rule*).

ভিনসেণ্ট স্মিথও বলেন—খস্রু অত্যন্ত সুদর্শন ও অমায়িক প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায় বহুলোকই তাঁহার সমর্থক ছিলেন

সেলিম এলাহাবাদে গিয়া যখন সম্রাট্ আকবরের বিরুদ্ধে পুনরায় বিদ্রোহ করিবার চেষ্টা করেন তখন "Khan-i-Azam, Raja Man Singha and some other nobles of the court plotted to secure the succession for Salim's son Khusrau. But their scheme failed owing to the opposition of other nobles." (*Advanced History of India*).

শুধু এই লোভে লুৎফাউন্নিসা এই কষ্টে প্রবৃত্ত হইলেন না—মতিবিবি যাহাকে বিবাহ করিবে সে পঞ্চহাজারী মন্‌সবদার হইবে এই লোভে খস্রুকে সিংহাসনে বসাইবার ষড়যন্ত্রে যোগ দেয় নাই। মতিবিবি নিজেকে উপেক্ষিতা মনে করিয়া প্রণয়ীর উপর প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে এই চক্রান্তে যোগ দেয়। কিছু পরে নবকুমারের উপেক্ষা তাহাকে কপালকুণ্ডলার সর্বনাশ সাধনে (নবকুমারের অনিষ্ট নয়) উদ্যোগী করিয়া তুলে।

[রূপগর্বিতা এই নারী (মতিবিবি) আগ্রার ঐশ্বর্য ও বিলাসের মধ্যে বাস করিয়া প্রকাশ্যে ও গোপনে অনেককেই প্রেম বিতরণ করিত, কিন্তু কাহাকেও ভালবাসিতে শিখে নাই। যুবরাজ সেলিমের প্রতিও তাহার ভালবাসা ছিল না, তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সেলিমের পশ্চাতে দেখিয়াছিল রাজসিংহাসন ও বিশাল সাম্রাজ্যের উপর একাধিপত্য। সম্রাটের প্রধানা মহিষী হইবার মোহ তাহাকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই মোহ যখন ভাঙ্গিল, আকাশস্পর্শী উচ্চাশা যখন ধূলায় লুটাইল, তখন একটা প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়া উঠিল, সেলিমের বিরুদ্ধে একটা দুঃসাহসিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে সে দ্বিধা বোধ করিল না। আগ্রা হইতে উড়িষ্যা, উড়িষ্যা হইতে বর্ধমান, বর্ধমান হইতে পুনরায় আগ্রা সে ঘুরিয়া বেড়াইল, দুরাশা ও প্রতিহিংসায় বাষ্পতাড়িত হইয়া। নবকুমারের সঙ্গে যখন তাহার প্রথম সাক্ষাৎ তখন সেলিমের বিরুদ্ধে ঘোরতর ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত। নবকুমারকে দেখিয়া ও তাহার পরিচয় পাইয়া তাহার কলঙ্কমলিন জীবনের অন্তরাল হইতে একটি শুচিশুভ্র গার্হস্থ্যজীবনের ছবি কি মুহূর্তের জন্য জাগিয়া উঠিয়াছিল, প্রেমহীন অতৃপ্ত ভোগাকাঙ্ক্ষাময় জীবনে দাম্পত্য জীবনের একটা অনাড়ম্বর শান্তিময় ভাবের কি ছায়াপাত হইয়াছিল? 'মেরা শোহর' ইহা কি প্রগল্‌ভার রসিকতা, না প্রেমহীন হৃদয়ে, প্রেমের আবির্ভাবের সূচনা?]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পথেই মতিবিবি জরুরী সংবাদ পাইল—সম্রাট্ আকবরের মৃত্যু হইয়াছে—সেলিম জাহাঙ্গীর শাহ নাম লইয়া ভারত-সম্রাট হইয়াছেন—খসরুকে সিংহাসনে বসাইবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে—মতিবিবির সত্বর আগ্রায় ফিরিয়া আসা উচিত।

মতি মনে মনে জানিল জাহাঙ্গীরের সহিত মেহেরউন্নিসার বিবাহ হইবে, কিন্তু মেহেরউন্নিসা যদি সেলিমের প্রতি অনুরাগিণী না হয় তবে শের আফগান নিহত হইলেই কি সে বিবাহ করিবে? সুতরাং মেহেরউন্নিসার মনোভাব জানিবার চেষ্টা অবিলম্বেই করা প্রয়োজন।

ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে কিন্তু তবু মেহেরউন্নিসার নিকট যাওয়ার প্রয়োজন কি? অদূর ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহা তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তবু আর একবার চেষ্টা করিতে বাধা কি? একবার কেন, বারবার বিফল হইয়াও যে স্বকার্যসাধনের জন্য চেষ্টা করা—এই ভাবের সঙ্গে মিল আছে বলিয়াই দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী' হইতে কয়েক পংক্তি পরিচ্ছেদ-পরিচয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই পরিচ্ছেদের নাম দেওয়া হইয়াছে 'পথান্তরে'। 'পথান্তরে' অর্থ 'অন্য পথে'। নূতন একটা পথের সন্ধান অস্পষ্টভাবে মতিবিবির মনে দেখা দিয়াছ। সেই নূতন পথ, নূতন চিন্তা তাহার পূর্বস্বামী নবকুমারকে লইয়া—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পেষ্‌মন, আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে?—নবকুমারকে দেখিবার পর হইতে নিজের অগোচরে মতিবিবির মনে একটা অনুরাগের সৃষ্টি হইয়াছে। নবকুমারকে যে ভুলিতে পারিতেছে না, তাহার কথা আলোচনা করিয়া আনন্দ পাইতেছে।

পেষমন্ কিছু বিস্মিত হইয়া—মতিবিবির নিকট হইতে পেষমন্ এরূপ প্রশ্ন আশা করে নাই। আগ্রায় বহুলোকের সংস্পর্শেই সে আসিয়াছিল, কিন্তু কাহারও উপর সে এতদিন আকর্ষণ অনুভব করে নাই, কাহারও সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে নাই। পেষমন্ সব খবরই রাখিত, কিন্তু মতিবিবির বঞ্চিত জীবন অলক্ষিতে যে সুধাসিক্ত হইয়া উঠিতেছে, পেষমন্ তাহার সন্ধান রাখে নাই।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ আবার সুন্দর কুৎসিত কি?—ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের মধ্যে আবিল জীবনযাপনে যাহারা অভ্যস্ত, ইহা তাহাদের উপযুক্ত কথাই বটে। ঐশ্বর্য ও প্রভুত্বই জীবনে একমাত্র কাম্য। মতিবিবির মত বিলাসিনী প্রভুত্বপ্রয়াসিনী নারী যে দরিদ্রকে ভালবাসিতে পারে ইহা তাহাদের কল্পনাতীত।

পত্র পড়িয়া মতিবিবির আশাভরসা সকল অন্তর্হিত হইল—সেলিমের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিয়া মতিবিবি প্রতিশোধ লইবে স্থির করিয়াছিল, সে চক্রান্ত ব্যর্থ

হইল। মৃত্যুকালে আকবর শাহ্ বিদ্রোহী সেলিমকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সেলিম জাহাঙ্গীর শাহ নাম ধারণ করিয়া ভারত-সম্রাট্ হইয়াছেন।

আকবর শাহ্ যে প্রকারে এ ষড়যন্ত্র নিষ্ফল করেন, তাহা ইতিহাসে বর্ণিত আছে—

"In November, 1604, Salim was persuaded to come to court probably under threats that if he refused, Khusru would be declared heir-apparent. His father received him with seeming cordiality. He then drew him suddenly in an inner apartment, slapped him soundly in the face and confind him in a bathroom under the charge of a physician and two servants, as if he were a lunatic requiring medical treatment. After a short time the length of which is variously stated, Akbar released his son, restored him to favour, made him viceroy of the provinces to which Daniyal had been appointed and allowed him to reside at Agra as the acknowledged heir-apparent. The Prince was cowed by his father's rough handling and gave no further trouble.

In September, 1605, Akbar became ill with severe dierrhœa or dysentry which the physicians failed to cure. While on his deathbed and unable to speak he received Salim and indicated by unmistakable gestures that he desired his succession." (V.A. Smith—*India in Muhamadan Period.*)

তাহা আর হয় না—উচ্চতম বস্তুর জন্য যে একবার লোভ করিয়াছে সে স্বল্পে তুষ্ট হইবে কেমন করিয়া?

ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধিয়তে—মতিবিবির সাংসারিক জ্ঞানের চমৎকার দৃষ্টান্ত। পূর্ব হইতেই সংকল্প করিয়া সব কাজে হাত দেওয়া যায় না। পরিস্থিতি যখন যে আকার ধারণ করে সেই অনুসারে কাজে অগ্রসর হইতে হয়।

কোন নূতন ভাব উদয় হইতেছে—রূপের বোঝা বহিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইবার সার্থকতা কি? তার চেয়ে ভগবান যাহার সঙ্গে একবার মিলাইয়া দিয়াছেন, তাহার দেখা যখন ভাগ্যবশে মিলিয়াছে তখন দিল্লী আগ্রার ঐশ্বর্যের লোভ ছাড়িয়া, সপ্তগ্রামেই নবকুমারকে লইয়া সুখের ঘর বাঁধা যায় কিনা সে চেষ্টা করিতে বাধা কি? অনুরাগের বীজ উপ্ত হইয়াছে, অঙ্কুরিতও হইয়াছে, কিন্তু এখনও সেরূপ আকার ধারণ করে নাই। মতিবিবির মনে এখনও একটা দ্বিধা আছে, দ্বন্দ্ব আছে।

মোগল রাজ-অন্তঃপুরের ঐশ্বর্য ও বিলাসের মোহ কি এত সহজে ভুলিতে পারা যায়, সেলিমের হৃদয় জয় করিয়া ভারতসাম্রাজ্যের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব করিবার দুরাশা হৃদয়ে একবার উদিত হইলে এত অনায়াসে তাহা শূন্যে মিলাইয়া যায়? মেহের-উন্নিসার সঙ্গে সাক্ষাতের পর মতির মনে একটা পরিবর্তন আসিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মতিবিবি বর্ধমানে শের আফগানের গৃহে মেহেরউন্নিসার মন জানিতে আসিয়াছে। শের আফগান ও মেহেরউন্নিসা উভয়েই মতিবিবির যথেষ্ট সংবর্ধনা করিলেন। মেহেরউন্নিসাও মতিবিবির নিকট হইতে জানিতে চাহেন সেলিমের অন্তরের অভিপ্রায় কি? কথায় কথায় প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, সম্রাট আকবর পরলোকগত হইয়াছেন এবং সেলিম জাহাঙ্গীর নাম লইয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া মেহেরউন্নিসা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?' মতির মনস্কাম সিদ্ধ হইল, যাহা জানিবার তাহা জানা হইল। মেহেরউন্নিসার সহিত অন্যান্য কথায় প্রকাশ পাইল যে, মেহের-উন্নিসা সেলিমের প্রতি অনুরাগ পোষণ করেন। মুখে মেহেরউন্নিসা যাহাই বলুন না কেন, শের আফগান যদি নিহত হন তবে মেহেরউন্নিসা ভারত-সাম্রাজ্ঞী হইবেন।

এই আবিষ্কারে মতিবিবির সমস্ত আশা নির্মূল হইল। কিন্তু আশাভঙ্গে যে-পরিমাণ দুঃখ হওয়া উচিত ছিল, তাহা তো হইলই না, বরং মনে একপ্রকার আনন্দ অনুভূত হইল।

উদ্ধবদূত হইতে "শ্যামাদন্যো নহি নহি নহি প্রাণনাথ মমাস্তি" এই চরণটি মেহের-উন্নিসার মনের অবস্থা বুঝাইতেছে। মেহেরউন্নিসা সেলিমকে ভুলিতে পারেন নাই, জীবনে ভুলিতে পারিবেন না। মেহেরউন্নিসার নিজের উক্তি স্মরণীয়—"কাহাকে বিস্মৃত হইব? আত্মজীবন বিস্মৃত হইব তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হইব না। মেহের-উন্নিসা হৃদয় মধ্যে তাঁহার ধ্যান করিবে। প্রয়োজন হইলে তাঁহার জন্য প্রাণ পর্যন্ত সমর্পণ করিবে।"

ভারতবর্ষের কর্তৃত্ব কাহার অদৃষ্টে বিধাতা লিখিয়াছেন?—কেবল মতিবিবির নয়, ভারতবর্ষের কর্তৃত্বের উপর লোভ মেহেরউন্নিসারও পূর্ণমাত্রায় ছিল। মতিবিবি গিয়াছে মেহেরউন্নিসার মন জানিতে, আর মেহেরউন্নিসা মতির নিকট হইতে আগ্রার সংবাদ জানিতে চাহেন। মেহেরউন্নিসা শাহ্‌জাদা সেলিমের মুগ্ধদৃষ্টি এখনও ভুলিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি এখন শের আফগানের পত্নী,—তাঁহার একটা

মর্যাদাবোধ আছে, মনের কোণে যাহাই থাকুক বাহিরে এই বাল্যসখীর নিকটও যাহাতে মনের দুর্বলতা প্রকাশ না পায় সেদিকে মেহেরউন্নিসার সতর্কতার অন্ত নাই।

কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে—এই একটি কথার ভিতর দিয়া মেহেরউন্নিসার হৃদয়ের অনেকটা আভাস পাওয়া গেল। যে একটা চাপা বেদনা তিনি এতদিন বহন করিতেছিলেন, যে নৈরাশ্যের মধ্যে তিনি জীবনযাপন করিতেছিলেন, তাহা এই একটি কথায়ই প্রকাশ পাইল। যে রূপের এত প্রশংসা সেই রূপ বাংলাদেশের এক কোণে রহিয়া গেল, ঝরা ফুলের মত একদিন মাটিতে তাহা মিলাইয়া যাইবে। ভারতেশ্বরের হৃদয়েশ্বরী হইয়া যিনি বিশাল সাম্রাজ্য চালাইয়াছিলেন, বাদশাহী মোহরে যিনি নিজের নাম মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে এই অভিমানের কথা বড়ই সুন্দর হইয়াছে। সেলিমের হৃদয়ে যদি এই মুখের ছাপ থাকে তবেই না সৌন্দর্যের সার্থকতা!

কিন্তু আমি পরের অধীন—মতিবিবি সেলিমের রাজপুতপত্নীর সখী পরিচয়ে আগ্রার অন্তঃপুরে বাস করে। সুতরাং সে বেগমের অধীন। সেইজন্যই বর্ধমানে দুই একদিনও বিলম্ব করিবার তাহার উপায় নাই। চতুরতায় মতিবিবির জুড়ি নাই, মেহেরউন্নিসার মনে ধীরে ধীরে ঈর্ষ্যা ও বেদনা জাগাইয়া তুলিয়া মনের যথার্থ অবস্থা জানিবার চেষ্টা করিতেছে।

বেগমের নিকট কোন্ দিন পৌছিবার কথা স্বীকার করিয়া আসিয়াছে?—মতিবিবি দুইদিনও থাকিতে পারে না কেন? সে কি বেগমের নিকট নির্দিষ্ট দিনে ফিরিয়া যাইবে বলিয়া আসিয়াছে? সে নির্দিষ্ট দিন কি পার হইয়া গিয়াছে? (এ শ্লেষ মার্জিত হইলেও মর্মভেদী)।

কাহার অসন্তোষের আশঙ্কা করিতেছ, যুবরাজের না তাঁহার মহিষীর?—কথাবার্তা ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।

মতি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া—অপ্রতিভ হইবার পাত্রী মতিবিবি নহেন। তবে মুখে সপ্রতিভ ভাব তিনি দেখাইলেন।

তুমি স্বয়ং বেগম নাম ধারণ করিতেছ না কেন?—এবার আর কোন আড়াল নাই, সুস্পষ্টভাবে আসল কথাটি মেহেরউন্নিসা জানিতে চাহিয়াছেন। মতিবিবিরই জয় হইতেছে, এক-একটি করিয়া সে মেহেরউন্নিসার মনের কথা বাহির করিতেছে।

মেহেরউন্নিসা মুখ নত করিলেন—মতিবিবির কথা যে মেহেরউন্নিসার প্রাণের গোপন আকাঙ্ক্ষার কথা। অন্যের মুখে শুনিয়া মনে আনন্দ হইবারই কথা, কিন্তু

প্রখর আত্মসম্ভ্রম বোধ ছিল বলিয়াই তিনি সংযত রহিলেন, মুখে কোনও আহ্লাদের চিহ্ন দেখা গেল না।

তাহা তুমি বিস্মৃত হইয়া কথা কহিও না—ইহা পত্নীত্বগর্বের কথা, মনের কথা নয়। ইহা যে মনের কথা নয় তাহা মতিবিবি বুঝিতে পারিয়াছে।

তুমি যে পতিগতপ্রাণা—এ ব্যঙ্গ কি মতিবিবির মুখ দিয়া লেখকের ?

মেহেরউন্নিসার মুখপানে তীক্ষ্নদৃষ্টি করিয়া রহিলেন—মুখের ভাবের কোন রূপান্তর ঘটে কিনা, মুখের শিরা-উপশিরার আকুঞ্চন-প্রসারণের মধ্যে মনোভাব কিছু ধরা পড়ে কিনা দেখিবার জন্য মেহেরউন্নিসার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ভয় বা আহ্লাদের কোন চিহ্ন তথায় দেখিলেন না—মেহেরউন্নিসা মনোভাবকে সংযত করিয়াছিলেন, মুখে তাহার কোন চিহ্ন প্রকাশ হয় নাই।

সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়—এতক্ষণ মেহেরউন্নিসা নিজে মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন, আকবর শাহের প্রতিকূলতার ভয়েই সেলিম মেহের-উন্নিসার দিকে মনোযোগ দিতে পারেন নাই। কিন্তু সেলিম সিংহাসনে বসিয়াও মেহেরউন্নিসাকে স্মরণ করেন নাই, এই কথা চিন্তা করিয়া মেহেরউন্নিসা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। একটি কথায় অন্তরের কপাট একেবারে খুলিয়া গেল। এতক্ষণ মুখে যে পত্নীত্বের গর্ব প্রকাশ করিয়াছে তাহা একেবারে মিথ্যা আস্ফালন বলিয়া প্রমাণিত হইল। মতিবিবির নিকট মেহেরউন্নিসার হৃদয়ের সমস্ত গোপন রহস্যই প্রকাশ পাইল।

একথা যেন কর্ণান্তরে না যায়—আত্মবিস্মৃত হইয়া এভাবে মনোভাব প্রকাশ করা উচিত নয়, সেজন্য মেহেরউন্নিসা একথা গোপন রাখিতে অনুরোধ করিতেছে।

ইহার কারণ মেহেরউন্নিসা প্রণয়শালিনী, মতিবিবি এস্থলে কেবল স্বার্থপরায়ণা—শের আফগানের বনিতা হইয়াও মেহেরউন্নিসা সেলিমকে ভুলিতে পারে নাই, সেলিমের প্রতি অনুরাগ একটুও ম্লান হয় নাই। সুতরাং মতিবিবি যখন দুর্বল স্থানে আঘাত করিল তখন মেহেরউন্নিসার প্রাণ-মন মথিত হইয়া উঠিল, প্রবল হৃদয়াবেগ অন্তরের সত্য অনুভূতিকে গোপন রাখিতে পারিল না। কিন্তু মতিবিবির সেলিমের প্রতি কোন অনুরাগ ছিল না। স্নেহহীনা নারী কেবল বাক্‌চাতুরী দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিনীর মনের কথা জানিতে আসিয়াছিল। তাই তাহারই জয় হইল।

পথ মুক্ত হইলে—বাধা অপসারিত হইলে।

এ সিদ্ধান্তে—যথাসময়ে মেহেরউন্নিসাই জাহাঙ্গীরের সর্বপ্রধানা মহিষী হইবে ইহা ভাবিয়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মেহেরউন্নিসার সঙ্গে সেলিমের পূর্ব অনুরাগ, শের আফগানের সহিত মেহেরউন্নিসার বিবাহ, শের আফগানের নিধন, মেহেরউন্নিসার রংমহালে উপস্থিতি ও শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীরের সহিত বিবাহ—এই বিষয়গুলি বিভিন্ন লেখকগণ কাব্য-নাটকের বিষয় করিয়া বিভিন্নভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্য কি জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক। ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন :

"In May, 1611, Jahangir married Nur Jahan, originally known as Meherunnisa who considerably influenced his career and reign. Modern researches have discarded the many romantic legends about Meherunnisa's birth and early life and have proved the reliability of the brief account of Mutamid Khan, the author of Iqbāl-Nama-i-Jahangīr. According to it Meherunnisa was the daughter of a Persian immigrant Mirza Ghiyas Beg who came to India with his children and wife in the reign of Akbar. She was born on the way to India at Qandahar. Her father rose to high positions during the reigns of Akbar and his son. She was married at the age of seventeen to Ali Quli Beg Istajhi, another Persian adventurer, who in the beginning of Jehangir's reign received the jagīr of Burdwan in Bengal and the title of Sher Afgan. When Jehangir heard that Sher Afghan had grown "insubordinate and disposed to rebellions," he sent in A.D. 1607 his foster-brother Qutubuddin, the new governor of Bengal, to chastise him. An affray took place between Sher Afghan and Qutubuddin at Burdwan in course of which the latter was killed. Sher Afghan was in his turn, hacked to pieces by the followers of Qutubuddin, and Meherunnisa was taken to the court with her young daughter. After four years Meherunnisa's charming appearance caught the king's far-seeing eye and so captivated him that he married her and made her his chief queen** It is sometimes said that Jehangīr was in love with Meherunnisa when she was still a maiden during the lifetime of Akbar and that his infatuation for her cost Sher Afghan his life. The truth of this opinion has recently been questioned on the ground that the contemporaty Indian historians and some European travellers are silent about it and it was invented by later writers. But the cause of Meherunnisa being brought to the court, and not to her father, who held an important post in the Empire has not

been explained. That Jehangīr was not above the habit of having secret love affairs with the ladies of the court is proved by the case of Anarkali, for whom he raised in 1615 a beautiful marble tomb at Lahore."

তাহাতে কি মতি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন? তাহা নহে—মেহেরউন্নিসার মনোভাব জানিবার পূর্ব পর্যন্ত মতিবিবির মনে একটা দ্বন্দ্ব ছিল, দুইটি বিভিন্ন শক্তি তাহাকে দুই দিক্ হইতে আকর্ষণ করিয়াছিল। একদিকে সেলিম ও আগ্রার সিংহাসন, ভারতবর্ষের উপর সর্বময়-কর্তৃত্ব, ঐশ্বর্য-বিলাস-ভোগ-আড়ম্বর অন্যদিকে নবকুমার, সপ্তগ্রামের একখানি সুখ ও শান্তির গৃহ। আজ তাহার মন হইতে সেলিম সরিয়া গেল, মতিবিবি মনে মনে একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করিল।

কেন যে এমন অসম্ভব চিত্তপ্রসাদ জন্মিল তাহা মতি প্রথমে বুঝিতে পারে নাই—মানুষের আকাজ্ক্ষা অনেক সময়ে অতি গুপ্তভাবে মনের অবচেতন লোকে রহিয়া যায়, অনেক সময়ে নিজেই তাহার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। কোন্ সময় কোন্ ছিদ্র দিয়া সেলিমের শূন্যস্থানে অলক্ষিতে নবকুমার আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা কয়েকদিন পর্যন্ত মতিবিবি নিজেও বুঝিতে পারে নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বর্ধমান হইতে মতিবিবি মেহেরউন্নিসার মনোভাব জানিয়া আগ্রা আসিয়াছে। জাহাঙ্গীরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। মতি জাহাঙ্গীরকে মেহেরউন্নিসার সমস্ত কথা অকপটে খুলিয়া বলিল। মেহেরউন্নিসার কথা শুনিয়া জাহাঙ্গীরের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল। তারপর লুৎফউন্নিসা (মতিবিবি) বাদশাহের নিকট এক অদ্ভুত প্রার্থনা জানাইল। সে পূর্বস্বামী নবকুমারকে বিবাহ করিবার জন্য বাদশাহের অনুমতি প্রার্থনা করিল। জাহাঙ্গীর প্রথমে ভাবিলেন লুৎফউন্নিসা রহস্য করিতেছে। তিনি লুৎফ-উন্নিসাকে পূর্ববৎ রংমহালে বাস করিতে অনুরোধ করিয়া সৌজন্যের পরিচয় দিলেন। কিন্তু বাদশাহের রত্ন-সিংহাসনতলে কণ্টক হইয়া থাকিবার সাধ তাহার নাই।

মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের শান্তনুর প্রতি গঙ্গার উক্তি হইতে এই পরিচ্ছেদের গোড়ায় উদ্ধৃত হইয়ছে—'পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।' বসুদিগের শাপ মোচনের জন্য গঙ্গা মর্ত্যে আসিয়া শান্তনুর পত্নিরূপে বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন। যাইবার সময় শান্তনুর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি আত্মপরিচয় দিয়া গেলেন। এই ভাবের সঙ্গে মতিবিবির আগ্রা ও জাহাঙ্গীরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যাইবার মূলীভূত মনোভাবের একটা সাদৃশ্য আছে।

কয়দিনে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সকল একেবারে পরিবর্তিত হইয়াছিল—নারী যখন তাহার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব অনুভব করে, তখন তাহার মনোভাব ও প্রকৃতির পরিবর্তন হয়।

অকপট হৃদয়ে—সেলিমের অনুরাগ বা সিংহাসন তখন সে আকাঙ্ক্ষা করে না, মেহেরউন্নিসাকে আর সে প্রতিদ্বন্দ্বিনী মনে করে না, সুতরাং মেহেরউন্নিসার অনুরাগের কথা সে সরলভাবেই বলিল। তাঁহার বিস্ফারিত লোচনে দুই এক বিন্দু অশ্রু বহিল—সেলিমের অনুরাগের নিদর্শন।

একবৃন্তে কি দুইটি ফুল ফোটে না—মেহেরউন্নিসা ও লুৎফউন্নিসা কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে সেলিমের ইচ্ছা নাই। বহুবল্লভ নৃপতির উপযুক্ত কথা।

এক মৃণালে দুইটি কমল ফুটে না—যেভাবে মতিবিবি এই কথাগুলি বলিতেছে তাহাতে সৌজন্যের পরিচয় আছে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে সেলিমের প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তিও সে অর্জন করিয়াছে। অভিমান ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অভিমান এখানে বড় কথা নয়। মাত্র অভিমানের কথা হইলে বাদশাহের মুখের দিকে বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া মতিবিবি একথাটি বলিতে পারিত না। এ শক্তি মতিবিবি পাইল কোথায়? 'কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরী'র চপল প্রকৃতির পরিবর্তন হইল কিসে? বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের শেষ কয়টি ছত্রে তাহার উত্তর দিয়াছেন—"লুৎফউন্নিসার হৃদয় পাষাণ। সেলিমের রমণী-হৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখনও তাহার মন মুগ্ধ করে নাই। কিন্তু এইবার পাষাণমধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল।" হৃদয় বলিয়া কোন জিনিষের অস্তিত্ব যে কোন দিন অনুভব করে নাই, ভোগসর্বস্ব জীবনে প্রেম বলিয়া কিছু আছে একথা যে স্বীকার করে নাই, তাহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইল। মতিবিবির হৃদয়ে প্রেমের এই অতর্কিত আবির্ভাব যে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে, এই প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী নারীর হৃদয়ে যে অপরাজেয় মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতেই কপালকুণ্ডলার জীবনের বিষাদময় পরিণতি ত্বরান্বিত হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লুৎফউন্নিসা পেশমন্‌কে একটি বহুমূল্য নূতন পোষাক পুরস্কার দিল। পেশমন্ মনে করিল, তবে নিশ্চয়ই মেহেরউন্নিসার বাদশাহের বেগম হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার মনিবই বেগম হইবে। কিন্তু লুৎফউন্নিসা জানাইল যে, সে আগ্রার সহিত সকল সম্বন্ধ শেষ করিয়া বাংলাদেশে যাইবে ও যদি সম্ভব হয় কোন ভদ্রলোকের স্ত্রী হইয়া জীবন যাপন করিবে। পেশমন্ তো শুনিয়া অবাক! সে লুৎফউন্নিসাকে এ

কুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে বলিল। কিন্তু লুৎফউন্নিসার সংকল্প টলিল না। ঐশ্বর্য ও সম্পদের মধ্যে বহুকাল সে আগ্রা বাস করিল, কিন্তু একজনকেও সে ভালবাসিল না, একদিনের জন্যও সে অন্তরে সুখী হয় নাই। রাজপ্রাসাদে তিন বৎসর বাস করিয়া যে সুখ সে পায় নাই, একরাত্রে পান্থশালায় সে সুখ পাইয়াছে। পাষাণে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছে—পাষাণ দ্রব হইতেছে।

পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার উক্তি। প্রেমের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও তিনি প্রেমের রহস্য বুঝিতে পারেন নাই, প্রেমাস্পদের সঙ্গে সর্বদা বাস করিয়াও তিনি তৃপ্তি পান নাই। কিন্তু রাধিকার এই মনোভাবের সহিত মতিবিবির প্রেমহীন হৃদয়ভাবের সাদৃশ্য কৈ? হৃদয় জুড়াইতে প্রকৃত প্রেমিক লক্ষের মধ্যে একজনও পাওয়া যায় না—এই কথার মধ্যে যে অতৃপ্তি আছে তাহার সঙ্গে মতিবিবির মনোভাবের আংশিক সাদৃশ্য আছে মাত্র।

সমস্ত হৃদয়-মন, অন্তর-বাহির যাঁহার প্রেমে পরিপূর্ণ, সেই রাধিকা এক জগতের লোক আর ঐশ্বর্যবিলাসে ডুবিয়া থাকিয়া যে ভালবাসার সময় পাই নাই যে অন্য রাজ্যের লোক। তবে মতির হৃদয়ে প্রেমের প্রথম আবির্ভাব তাহার মনে একটা আকুলতা আনিয়াছে সন্দেহ নাই।

এই পরিচ্ছেদে মতিবিবির চরিত্রের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে। নারীর জীবনে যখন যথার্থ প্রেমের সঞ্চার হয় তখন এই আকস্মিক পরিবর্তন ঘটা খুবই স্বাভাবিক। বিগত জীবনের প্রতি, আগ্রার ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের মধ্যে শূন্যহৃদয়ে নিত্য-নূতন ভোগের জন্য উন্মুখতার বিড়ম্বনার প্রতি তাহার ধিক্কার জন্মিয়াছে। গত জীবনের অপরিসীম ব্যর্থতার বোঝা আর সে বহিতে পারিতেছে না। এই কথাই সে পেষমন্‌কে জানাইয়া দিয়া তাহার হৃদয়বেদনা লঘু করিল।

এমন কুপ্রবৃত্তি আপনার কেন জন্মিল—পেষমন্ জানে না কেন মতিবিবি আগ্রার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ঘুচাইতে চায়। তাহার নিকট মতিবিবির এই খেয়াল একেবারে নির্বুদ্ধিতা।

ইহার উত্তরে মতিবিবি পেষ্‌মনকে তাহার সুখতৃষ্ণা, ভোগাকাঙ্ক্ষার পরিণতি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে। সুখ যে বস্তুতে নয়, ঐশ্বর্যে নয়, গৌরব ও প্রতিষ্ঠাতে নয়, যথার্থ সুখ যে মনে, একথা সে ঐশ্বর্য-নরকের মধ্যে বাস করিয়া এতদিন ভুলিয়া ছিল। ভোগতৃষ্ণা ক্রমে ক্রমে প্রবল আকার ধারণ করিয়া তাহার জীবনের সকল গুণ বিনষ্ট করিয়া তাহাকে অধঃপতনের শেষ সীমায় টানিয়া লইয়া চলিয়াছে তাহা এখন মতিবিবি উপলব্ধি করিয়াছে।

উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে এক রাত্রিতে যে সুখ হইয়াছে—পান্থশালায় নবকুমারকে যখন মতিবিবি প্রথম দেখিল তখন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ তাহার মনপ্রাণ পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে এ আনন্দ সে কোনদিন অনুভব করে নাই। বিবাহিত জীবনের স্মৃতি, হিন্দুনারীর সহজাত সংস্কার হয়তো মতিবিবির মনে প্রচ্ছন্ন হইয়াই ছিল, পদ্মাবতী একেবারে মরিয়া যায় নাই।

আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছে, কখনও আগুন স্পর্শ করে নাই—প্রণয়ের অভিনয় করিয়াছে, ভালবাসার খেলা খেলিয়াছে, কিন্তু হৃদয়ে কোনদিন প্রেম অনুভব করে নাই।

আকাশে চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে, জল অধোগামী কেন?—রূপে বল, বলে বল, ঐশ্বর্য্যে বল, দিল্লীর বাদশাহের বড় পৃথিবীতে কে আছে?—পেষ্‌মনের এই প্রশ্নের উত্তর মতিবিবি এই একটি কথায় দিতেছে। লুব্ধচিত্তে এতকাল মতিবিবি সেলিমের ঐশ্বর্যের পিছনে ঘুরিয়াছে, আজ সেই সেলিম যখন দিল্লীশ্বর তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহিণী হইবার এ খেয়াল কেন? নারীর হৃদয়াবেগ, তাহার প্রবৃত্তি কখন কেন অকস্মাৎ দুর্ব্বার হইয়া অন্ধবেগে কাহার উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়, এ রহস্য দুর্জ্ঞেয়; বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া এ রহস্যের কোন সীমা পাওয়া যায় না। নবকুমারের আকর্ষণ মতিবিবিকে কেন প্রচণ্ড বেগে আগ্রার সিংহাসনের পার্শ্ব হইতে বাংলার দিকে টানিতেছে, তাহার উত্তর—ইহাই তাহার আপন নিয়তি, ইহাই অদৃষ্টের লিপি।

মতিবিবির এই কথা কেবল পেষমনের কৌতূহলকে দমন করিবার জন্য নয়, একটা কিছু বলিয়া পেষমন্‌কে নিরুত্তর করিয়া দিবার জন্য। মতিবিবিও মনে মনে এই অলঙ্ঘ্য নিয়তির দুর্বার শক্তি অনুভব করিতেছিল। যাহার সহিত সকল সম্পর্ক শেষ হইয়া গিয়াছিল তাহার সহিত পান্থশালায় আবার দেখাই বা হইবে কেন? প্রথম সাক্ষাতে বিবাহিত জীবনের দূর স্মৃতি এইরূপ বিলাসিনীর হৃদয়-মনে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করিবে কেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই মেহেরউন্নিসার হৃদয়ের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়ার ফলে আগ্রার আশা একেবারে নির্মূল হইবেই বা কেন? আগ্রার আকর্ষণ ক্রমেই শিথিল হইতেছে, নবকুমারের আকর্ষণ ক্রমেই প্রবল হইতেছে। নবকুমারের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার যখন তাহার শূন্যহৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া দিল তখন রাজ্য-সিংহাসন-ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তি সবই তুচ্ছ হইয়া গেল। বাদশাহের উপর বাদশাহ হইতে পারিলে মতিবিবি নবকুমারকে চাহিত কিনা সে কথার বিচার করিয়া লাভ নাই। নিশ্চয় চাহিত না। কিন্তু সেলিমের ঐশ্বর্যের প্রতি লোভ মতিবিবির জীবনে যেমন

সত্য, আগ্রার আশা-ভরসা ফুরাইলে নবকুমারের প্রতি অনুরাগ-সঞ্চারও তেমনি সত্য। আখ্যায়িকার ঘটনাপরম্পরার প্রভাব হইতে চরিত্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, পৃথক্ করিয়া বিচার করা যায় না।

পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল—মতিবিবি এতদিন বহুলোকের সান্নিধ্যে আসিয়াছে, বহুলোকের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও ভালবাসে নাই। পাষাণের মতই কঠিন হৃদয় লইয়া সে এতদিন বিচরণ করিয়াছে, পাষাণে কোনও রেখাপাত হয় নাই। কিন্তু এখন তাহার মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে—আর তাহারই ফলে পাষাণ-হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লুৎফউন্নিসা বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া আগ্রার পাট তুলিয়া দিয়া সপ্তগ্রামে আসিয়াছে। নগরীর মধ্যে একটি সুন্দর অট্টালিকায় বহু দাসদাসী লইয়া বাস করিতেছে। একটি সুসজ্জিত কক্ষে লুৎফউন্নিসা মুখ নীচু করিয়া বসিয়া আছে। নবকুমার পৃথক আসনে উপবিষ্ট। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নবকুমার বলিলেন যে, লুৎফ-উন্নিসা যেন তাঁহাকে আর না ডাকে। লুৎফউন্নিসা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, পৃথিবীতে নবকুমারের কি কিছু আকাঙ্ক্ষা নাই, ধনসম্পদ যেগুলি সুখের হেতু সেই সমস্তই নবকুমার পাইতে পারে ? লুৎফউন্নিসা কেবল তাঁহার দাসী হইতে চায়, তাঁহার পত্নী হইবার দুরাশা তাহার নাই। কিন্তু নবকুমার অটল, দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিয়াছেন ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিবেন। লুৎফউন্নিসা ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার ধনের গর্ব ও রূপের গর্ব চলিয়া গিয়াছে, আত্মনিবেদনের সরলতা তাহার চরিত্রকে কোমল করিয়াছে। সে আর কিছু চায় না, কেবল নবকুমার যেন এই পথে এক একবার যান, সে দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবে। কিন্তু নবকুমারের নিকট লুৎফউন্নিসা যবনী, পরস্ত্রী। নবকুমার কক্ষ ত্যাগ করিবার উপক্রম করিলে লুৎফউন্নিসা নবকুমারের পায়ের উপর পড়িল। তাঁহার জন্য যে লুৎফউন্নিসা আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। নবকুমার কহিলেন, তুমি আবার আগ্রায় ফিরিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ কর। এজন্মে নহে—বলিয়া পা ছাড়িয়া যবনী উঠিয়া দাঁড়াইল। মাথা উঁচু করিয়া, ঘাড় একটু বাঁকাইয়া নবকুমারের মুখের দিকে চোখ মেলিয়া উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়াইল। চকিতে নবকুমারের মনে একটা সাদৃশ্যের কথা খেলিয়া গেল। এই ক্রোধ-কম্পিত মূর্তি, এই উজ্জ্বল চক্ষু, ক্রোধে ললাটে এমনি রেখার বিকাশ তাঁহার ত অপরিচিত নয়। নবকুমার ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? যবনী উত্তর করিল—আমি পদ্মাবতী। এই কথা বলিয়াই লুৎফউন্নিসা চলিয়া গেল।

বীরাঙ্গনা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এখানেও দেখা যায় মতিবিবি নবকুমারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে ঐশ্বর্য-সম্পদ ও বিবিধ ভোগসুখের জন্য আহ্বান জানাইতেছে। রুক্মিণীর প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ করিয়াছিলেন কিন্তু নবকুমার মতিবিবিকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুরিত হয়—মতিবিবির চিত্তে অলক্ষিতে প্রেমের সঞ্চার কেমন করিয়া হইল এবং নবকুমারের প্রতি অনুরাগ কি করিয়া ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত হৃদয়মন অধিকার করিয়া এই গর্বিতা বিলাসিনীকে প্রণয়ভিক্ষু করিয়া তুলিল এই পরিচ্ছেদের প্রথম দুইটি অনুচ্ছেদে তাহার বর্ণনা।

লুৎফউন্নিসা অধোবদনে বসিয়া আছেন—লুৎফউন্নিসার আগ্রার জীবনসম্বন্ধে আমরা যাহা জানি তাহাতে গুরুতর মানসিক পরিবর্তন না হইলে, তাহার চঞ্চল প্রকৃতির একেবারে রূপান্তর না ঘটিলে তাহার পক্ষে এরূপভাবে বসিয়া থাকা অস্বাভাবিক।

তিনি নীরবে রোদন করিতেছিলেন—যে রূপগর্বে সকলকেই কৃপা বিতরণ করিত সে আজ প্রণয়ভিক্ষা করিতে গিয়া কাঁদিতেছে। আত্মগরিমা তাহার ধূলায় লুটাইতেছে। 'অধোবদনে বসিয়া থাকা' ও 'নীরবে রোদন করা' এই দুইটি মাত্র কথা দিয়া মতিবিবির প্রকৃতি ও মনের অদ্ভুত পরিবর্তনের চিত্র উপন্যাসকার অঙ্কিত করিয়াছেন। আগ্রার ঐশ্বর্যের গর্বে, আত্মহৃদয়ের অনমনীয় তেজস্বিতায় সে মনে করিয়াছিল, নবকুমারকে ঐশ্বর্য-আড়ম্বর দেখাইয়া ধাঁধা লাগাইয়া, বিলাস ও ভোগে প্রলুব্ধ করিয়া অনায়াসেই সে আপনার করিয়া লইতে পারিবে। মতিবিবির প্রেমহীন হৃদয় আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যকেই স্বকার্যসাধনের প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাহা যখন ব্যর্থ হইল, তখন অনুতাপ ও লজ্জায় তাহার অন্তরের প্রেমিকা আত্মনিবেদনের ভাবটি লইয়াই দেখা দিল।

কেবল তোমার দাসী হইতে চাই—মতিবিবির এই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের উক্তিটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

দাসী ভাবিয়া এক একবার দেখা দিও, কেবল চক্ষু পরিতৃপ্ত করিব—আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষার চরম অভিব্যক্তি। নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া, ভোগাকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া কেবল দর্শন পাইবার জন্যই মতি লালায়িত।

উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন—দলিতফণা ফণিনীর মত মতিবিবি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল—যে আত্মগর্ব ও তেজস্বিতা প্রেমের স্পর্শে গলিয়া গিয়াছিল, প্রত্যাখ্যানের অপমানে তাহাই আবার দ্বিগুণিত হইয়া দেখা দিল। আবার আমরা আগ্রার লুৎফউন্নিসার দেখা পাইলাম, যে লুৎফউন্নিসা সেলিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

করিতে ভয় পায় নাই, সেই লুৎফউন্নিসা আবার দেখা দিল। এবার প্রত্যাখ্যান পাইল নবকুমারের নিকট হইতে, কিন্তু আঘাত করিবে কপালকুণ্ডলাকে, বেদনা দিল নবকুমার, কিন্তু আক্রোশ পড়িল কপালকুণ্ডলার প্রতি।

আমি পদ্মাবতী—আত্মপরিচয় দিয়া সংশয়াপন্ন নবকুমারকে একেবারে বিহ্বল ও সচকিত করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া কক্ষত্যাগ দৃশ্যটিকে নাটকীয় চমৎকারিত্ব দান করিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লুৎফউন্নিসা অন্যকক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দুইদিন ধরিয়া চিন্তা করিল। এখন তাহার করণীয় কি—ইহাই ছিল তাহার চিন্তার বিষয়। লুৎফউন্নিসা পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিল। এমন নিখুঁত বেশভূষা করিল যে দেখিয়া আর চেনা যায় না। লুৎফ-উন্নিসার উদ্দেশ্য কপালকুণ্ডলার সহিত স্বামীর বিচ্ছেদসাধন। নবকুমারের বাড়ীর সন্নিকটে যে বন ছিল, সেই বনে রাত্রিতে প্রবেশ করিয়া সে তাহার ভবিষ্যৎ কার্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিল। ঘটনাক্রমে এই সময় সে কাপালিককে দেখিতে পাইল। কাপালিক কপালকুণ্ডলার নাম উচ্চারণ করিয়া হোম করিতেছিল। এই নাম শুনিয়াই যুবকবেশধারী লুৎফউন্নিসা কাপালিকের নিকট গিয়া বসিল।

ম্যাকৃবেথ নাটক হইতে এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে যে উদ্ধৃতিটি দেওয়া হইয়াছে তাহার তাৎপর্য এই যে, রাজা ডান্‌কান্‌কে হত্যা করিবার জন্য যেমন ষড়যন্ত্র হইয়া-ছিল, কপালকুণ্ডলার সর্বনাশ সাধন করিবার জন্য অনুরূপ ষড়যন্ত্রের সূচনা হইল। অনতিবিলম্বেই কাপালিক ও লুৎফউন্নিসা মিলিত হইবে তাহা বুঝা গেল।

মতিবিবি যেমন ত্বরিতে কক্ষত্যাগ করিল আমরা বুঝিতে পারিলাম মতিবিবি নীরবে এই পরাজয় ও প্রত্যাখ্যান মানিয়া লইবে না। সেলিমকে পাইবার জন্য সে সেলিমের বিরুদ্ধেই গভীর ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, এবারেও সে ষড়যন্ত্র করিবে।

দুইদিন পর্যন্ত কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন না—দুইদিন রুদ্ধদ্বার কক্ষে নিরন্তর অবস্থান করিয়া মতিবিবি কি কর্তব্য স্থির করিয়াছিল তাহা উপন্যাসকার আমাদিগকে জানান নাই। মতিবিবি যে দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার প্রয়োজন হইল না। অরণ্যে যদি ঘটনাক্রমে আকস্মিকভাবে কাপালিকের সন্ধান না পাওয়া যাইত তবে মতিবিবির দুঃসাহসিক কর্মের পরিচয় হয়তো পাওয়া যাইত।

কাপালিকের সহিত ব্রাহ্মণবেশী লুৎফউন্নিসার সাক্ষাৎ একটা দৈবসংঘটন অথচ এই সাক্ষাতের ফল কপালকুণ্ডলার জীবনে কী শোচনীয় পরিণতি আনিয়া দিয়াছে!

এককভাবে কাপালিক বা লুৎফউন্নিসা কপালকুণ্ডলার সর্বনাশ করিতে পারিত, কিন্তু উভয়ের মিলনে উপন্যাসের এই বিশেষ পরিণতিটি সম্ভব হইয়াছে।

পরে তিনি আমার হইবেন—কপালকুণ্ডলার রূপরাশি নবকুমারকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কপালকুণ্ডলাকে পথ হইতে সরাইয়া দিলে মতিবিবির সহিত মিলনে নবকুমারের বাধা নাই। মতিবিবি একথা সুদৃঢ় প্রত্যয় লইয়া বেশ জোরের সঙ্গেই বলিল, কিন্তু মনে হয় এখানেও তাহার বিচারে ভুল।

নাম শুনিবামাত্র—কাপালিক কপালকুণ্ডলার নামোচ্চারণ করিয়া হোম করিতেছিল। বোধ হয় ইহা কাপালিকের অভিচার। এই বিজন অরণ্যে কপালকুণ্ডলার নাম উচ্চারণ করিয়া কে যজ্ঞ করিতেছে, কি উদ্দেশ্যে, তাহা জানিবার জন্য মতিবিবির কৌতূহল স্বাভাবিক।

কাপালিক পূর্ব হইতেই কপালকুণ্ডলার প্রতি রুষ্ট হইয়া আছে তাহা আমরা জানি। তৃতীয় খণ্ডে মতিবিবির সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া গেল। কপালকুণ্ডলার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে মতিবিবি তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে দেখা দিয়াছে। প্রত্যাখ্যানের অপমান মতিবিবিকে 'মরিয়া' করিয়া তুলিয়াছে। কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমারের চিরবিচ্ছেদ-সাধন এখন তাহার লক্ষ্য। তৃতীয় খণ্ডের শেষে আমরা দেখিতে পাইলাম কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে দুইটি প্রবল শক্তি, কাপালিক ও মতিবিবি, দুইটি স্বতন্ত্র প্রতিকূল ধারা কপালকুণ্ডলার জীবনের বিষাদময় পরিণতিকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য একত্র মিলিত হইয়াছে। ভবিষ্যৎসম্বন্ধে পাঠকের মনে কোন সংশয় ও অনিশ্চয়তা নাই। কপালকুণ্ডলার জীবনের পরিণাম আর শুভ হইতে পারে না; কীভাবে, কোন্ আকারে মহা সর্বনাশ আসিবে, কোন্ মুহূর্তে দুর্ভাগ্যের চরম আঘাত শিরে পড়িবে, এখন হইতে পাঠক রুদ্ধশ্বাসে কেবল তাহারই প্রতীক্ষা করিবে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে বশ করার জন্য কপালকুণ্ডলা রাত্রিতে বনে ঔষধ আনিতে যাইতেছে; শ্যামাসুন্দরী ভয় পাইল, রাত্রিতে একা বাড়ীর বাহির হইলে কপাল-কুণ্ডলাকে কে কি বলিবে। কিন্তু কপালকুণ্ডলার অভিপ্রায় যখন মন্দ নহে, তখন তাহার ভয় কি? কপালকুণ্ডলা বাহিরে যাইবার সময় নবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নবকুমার বাধা দিলেন, দিনে ঔষধ তুলিলেই হইবে বলিলেন। কপাল-কুণ্ডলা নবকুমার বার বার পরের উপকারের বিঘ্ন করিতেছেন বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। নবকুমার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। কপালকুণ্ডলা বলিলেন,—'আমি অবিশ্বাসিনী কিনা স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।' নবকুমার আর কিছু বলিলেন না। ব্যথিত-চিত্তে তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

এক বৎসর কপালকুণ্ডলা সপ্তগ্রামে গৃহস্থবধূরূপে বাস করিয়াছে। দাম্পত্য-জীবনের অভিজ্ঞতা সে লাভ করিয়াছে। তাহার বেশভূষার ও কথাবার্তার অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাহার উদাসীন প্রকৃতির কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সমাজ-জীবনের বন্ধন, এই অরণ্যপালিতা এখনও মানিয়া লইয়া সুখী বোধ করিতে পারে নাই।

ব্রজাঙ্গনা হইতে উদ্ধৃত ছত্রটিতে যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সহিত কপাল-কুণ্ডলাকে স্বাভাবিক গৃহস্থবধূ হইবার জন্য সকলে যে চেষ্টা করিতেছে তাহা আভাসিত হইয়াছে।

আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?—সমাজবাসের অবশ্যম্ভাবী ফল; 'বিবাহ' কাহাকে বলে যে জানিত না, সে এখন 'কুচরিত্রা' অর্থ বুঝে।

দাদাকে কেন অসুখী করিবে?—অন্য লোকে যদি কিছু বলে তবে তাহা উপেক্ষা করা চলে। কিন্তু কপালকুণ্ডলা যদি রাত্রিতে একা বাড়ীর বাহির হয় তবে নবকুমার অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। তিনি মুখে হয়তো কিছু বলিবেন না কিন্তু মনে ব্যথা পাইবেন।

যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না—সাগরতীরে অরণ্যে অবাধ ভ্রমণের স্বাধীনতা হারাইয়া কপালকুণ্ডলা সামাজিক জীবনের বন্ধনকে খুশীমনে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। সমুদ্রের ও অরণ্যের আহ্বান এখনও তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলে, সমুদ্র ও অরণ্যের আকর্ষণে যেন তাহার

প্রতি রক্তবিন্দু সাড়া দেয়। সমাজে বাস করিয়াও যে কপালকুণ্ডলা ঠিক সামাজিক জীব হয় নাই—এই একটি কথাই তাহার প্রমাণ।

আমি অবিশ্বাসিনী কিনা, স্বচক্ষে দেখিয়া যাও—বারবার বাধা পাইয়া কপালকুণ্ডলা বিরক্ত হইয়াছে। নবকুমারের মনে যে ঈষৎ সন্দেহের ভাব দেখা দিয়াছে সেজন্যও বটে, আবার নবকুমার অনর্থক পরোপকারে প্রতিবন্ধকতা করিতেছে সেজন্যও কপালকুণ্ডলা অপ্রিয়ভাষিণী হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, কপালকুণ্ডলার অপ্রসন্নতা নবকুমারের বিরুদ্ধে নয়, সমাজ-জীবনের বন্ধনের বিরুদ্ধে। নবকুমার কিন্তু একটু ভুল বুঝিয়াছে, তাহার মনে একটা তীব্র অভিমান জাগিয়াছে এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যাইবে যে, আঘাত পাইয়া সে দুঃখে-অভিমানে শয়ন করিতে অন্তঃপুরে যায় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কপালকুণ্ডলা একাকিনী বনপথে ঔষধির সন্ধানে চলিল। চৈত্র মাসের জ্যোৎস্না, মৃদু বসন্তবায়ু বহিতেছে। নিবিড় বনের সঙ্কীর্ণ পথে একাকিনী ভ্রমণ করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার মনে পড়িল, সমুদ্রতীরের সেই অরণ্য জীবন, বনপথে পূর্ব্বেকার সেই স্বাধীন বিচরণ। সমুদ্রের কথা মনে পড়িল, বালিয়াড়ির কথা মনে পড়িল। উপন্যাসকার সুকৌশলে গৃহিণীকে আবার যোগিনী করিতেছেন, ইহা তাহারই পূর্বাভাস। কাপালিকের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই মৃন্ময়ী পুনরায় সম্পূর্ণভাবে সন্ন্যাসিনী হইয়া উঠিবে।

কপালকুণ্ডলা পূর্বস্মৃতি আলোচনা করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। সে কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে সব কথা ভুলিয়া গেল। নিবিড় বনের মধ্যে একটি আলো দেখিতে পাইয়া কপালকুণ্ডলা অগ্রসর হইল। নিকটবর্তী হইয়া কপালকুণ্ডলা দেখিল আলোর নিকটে কেহ নাই কিন্তু একটি ভগ্নগৃহের মধ্যে নিম্নস্বরে যেন দুইজন কি কথাবার্তা বলিতেছে। কপালকুণ্ডলা নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া কান পাতিয়া শুনিল উভয়ে কোন একজনের অনিষ্টের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। ব্রাহ্মণবেশী ঘর হইতে বাহির হইয়াই কপালকুণ্ডলাকে দেখিল। সে প্রশ্ন করিল, 'তুমি এত রাত্রে এখানে কেন আসিয়াছ?' অপরিচিত লোকের মুখে নিজের নাম শুনিয়া কপালকুণ্ডলা ভয় পাইল কিন্তু সেও পাল্‌টা প্রশ্ন করিল—'তোমরা কি কুপরামর্শ করিতেছিলে?' 'তুমি এইখানে অপেক্ষা কর, আমি আসিয়া বলিতেছি' এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণবেশী অদৃশ্য হইল। ব্রাহ্মণবেশী যে পুরুষ নহে, তাহাও কপালকুণ্ডলা শুনিল।

তখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বনভূমি অন্ধকার হইয়া আসিল। কপালকুণ্ডলা

আর অপেক্ষা করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া ছুটিতে লাগিল। তাহার মনে হইল পিছনে কে যেন তাহার অনুসরণ করিতেছে। আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল, বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা কোনক্রমে নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিবার সময় বিদ্যুতের আলোকে দেখিল যে, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কাপালিক।

Keatsএর 'But here there is no light' এই কথাটি কপালকুণ্ডলার জীবনের নিরাশাময় ও বিভীষিকাপূর্ণ পরিণতির আভাস দিতেছে।

কপালকুণ্ডলা পূর্বস্মৃতি আলোচনায় অন্যমনা হইয়া চলিল—বিগত জীবনের স্মৃতি তাহাকে উদাস ও অন্যমনস্ক করিয়া তুলিল। সে যে শ্যামাসুন্দরীর জন্য ঔষধি সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল সে কথা ভুলিয়া গেল, ভুলিয়া গেল যে, হয়তো বেদনাহত নবকুমার এখনও পথে দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

পথের অলক্ষ্যতায় প্রথমে কপালকুণ্ডলা চিন্তামগ্নতা হইতে উত্থিত হইলেন—যখন নিবিড় বনে কপালকুণ্ডলা পথ খুঁজিয়া পাইল না, তখন তাহার অন্যমনস্কভাব কাটিয়া গেল। পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই একটা আলো দেখা গেল। আবার নূতন কৌতূহল উপস্থিত হইল।

এই আলো কপালকুণ্ডলার ভাগ্যকে অপ্রতিরোধনীয় বেগে আকর্ষণ করিল। পতঙ্গ যেমন বহ্নির দিকে ছুটিয়া যায়, কপালকুণ্ডলাও ধীরে ধীরে সেই দীপজ্যোতির অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইঙ্গিত অতি স্পষ্ট।

যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অতি উৎকট ভয় জন্মিয়াছিল—রাত্রিতে বনে ভ্রমণ করা কপালকুণ্ডলার অভ্যাস ছিল, সাধারণ নারীর মত ভয় বা আড়ষ্টভাবও তাহার ছিল না। কিন্তু মানুষের নির্ভীকতারও একটা সীমা আছে। নির্জন বনমধ্যে তাহারই সম্বন্ধে দুইজন অপরিচিত লোক সুপরামর্শ করিতেছে এবং তাহাদেরই একজন তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অদৃশ্য হইয়াছে আর ফিরিয়া আসিতেছে না, একথা বুঝিতে পারার সঙ্গে সঙ্গে কপালকুণ্ডলার মনে অত্যন্ত ভয় জন্মিল। ভয়ের মাত্রা এত বৃদ্ধি পাইল যে, আর অপেক্ষা করা বিপজ্জনক মনে করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গৃহের দিকে ছুটিল। শ্যামাসুন্দরীর ঔষধি সংগ্রহ করার কথা তো কপালকুণ্ডলা পূর্বেই ভুলিয়াছিল, মনের এই বিহ্বল অবস্থায় যে সেকথা আবার স্মরণ হইবে না, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

তখন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইতে লাগিল—চৈত্রের রাত্রির আকাশে

এই ভাব দেখা দেয়। জ্যোৎস্না অন্তর্হিত হয়, হঠাৎ কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়, বজ্রবিদ্যুৎ-বর্ষণের সঙ্গে ঝড় আসিয়া পড়ে। কপালকুণ্ডলার ভাগ্যাকাশও ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল। নায়িকার জীবনের উপর দুর্যোগের ঘনঘটা প্রকৃতিতে প্রতিফলিত করিয়া গ্রন্থকার উচ্চস্তরের শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন।

অশনিসম্পাৎ—বজ্রপতন।

স্পষ্ট মনুষ্য গতিশব্দ—কাপালিক দ্রুতপদে অনুসরণ করিতেছে। প্রতিকূল দৈব বা নিয়তি যেন কাপালিকের রূপ ধরিয়া কপালকুণ্ডলার পিছনে।

পরিচ্ছেদের শেষাংশটি অপূর্ব। ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া কপালকুণ্ডলা ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার মনে হইতেছে কে যেন তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। মুক্ত-দ্বারের মধ্য দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গনের দিকে ফিরিয়া দেখিল, প্রাঙ্গনের মধ্যে দাঁড়াইয়া এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। এই নিশ্চয় তাহার অনুসরণকারী। কিন্তু অন্ধকারে তাহাকে চেনা গেল না। বিদ্যুৎ চমকিল। বিদ্যুতের আলোকে তাহাকে কপাল-কুণ্ডলা চিনিতে পারিল। কাপালিককে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই কপালকুণ্ডলার যেটুকু সংসারবন্ধন ছিল তাহা শিথিল হইয়া গেল। সে আবার সমুদ্রতীরের সন্ন্যাসিনীতে রূপান্তরিত হইল। অত্যন্ত ভয় পাইয়াই সে ছুটিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু কাপালিককে দেখিয়া গৃহের দ্বার বন্ধ করিল 'ধীরে ধীরে'।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবকুমারের নিষেধ অমান্য করিয়া ঔষধি আনিবার জন্য গভীর বনে প্রবেশ হইতে নিজ গৃহপ্রাঙ্গনে ঝড়ঝঞ্ঝাবজ্রবিদ্যুতের মাঝখানে সাগরতীরপ্রবাসী কাপালিককে দেখা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা কপালকুণ্ডলার মনে ও মস্তিষ্কে একটা উত্তেজনা ও আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে—সে সারারাত্রি বিনিদ্র হইয়া এই সমস্ত কথা মনে মনে আলোচনা করিয়াছে। রাত্রিশেষে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি ও উত্তেজনায় স্বপ্ন দেখা বিচিত্র নয়। কিন্তু কপালকুণ্ডলার স্বপ্নকে অলীক ও উষ্ণমস্তিষ্কের ক্রিয়া বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।

কপালকুণ্ডলা যে স্বপ্ন দেখিল তাহা গভীর অর্থসূচক। অলৌকিক বা অনৈ-সর্গিক ঘটনার সঙ্গে মানুষের ভাগ্য জড়িত থাকে, বিশেষতঃ কপালকুণ্ডলার মত ধর্মভাবাপন্না নারীর। এই স্বপ্ন সঙ্কেতময় ও কপালকুণ্ডলার জীবনে ইহার প্রভাব অপরিসীম।

কপালকুণ্ডলা একাকিনী শয়ন করিল কিন্তু ঘুম আসিল না। নবকুমার ক্ষুব্ধ

হইয়াছিলেন, তিনি অন্তঃপুরে শয়ন করিতে আসিলেন না। কপালকুণ্ডলা জীবনের নানা কথা চিন্তা করিতেছিল। চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রা আসিল। কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিতেছে—নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রের উপর দিয়া কপালকুণ্ডলা যাইতেছে। অপরাহ্নের সূর্যরশ্মি সমুদ্রের জলে পড়িয়াছে। হঠাৎ অন্ধকার হইল। বাতাস উঠিল, সমুদ্র গর্জন করিতে লাগিল। জটাজূটধারী এক প্রকাণ্ড পুরুষ নৌকা ধরিয়া ডুবাইতে চাহিতেছে—ব্রাহ্মণবেশধারী বাধা দিতেছে। ব্রাহ্মণবেশধারী যেন কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল, নৌকা রাখি, কি নিমগ্ন করি। কপালকুণ্ডলা যেন উত্তর করিল—নিমগ্ন কর। এই সময় নৌকাও যেন কথা কহিয়া উঠিল—আমি আর এ ভার বহিতে পারি না। নৌকা তাহাকে ফেলিয়া পাতালে প্রবেশ করিল।

ঘুম হইতে জাগিয়াই কপালকুণ্ডলা জানালার ধারে ঝুলানো কতকগুলি লতার মধ্যে ব্রাহ্মণবেশীর আমন্ত্রণ-পত্র পাইল।

Byronএর a dream which was not at all a dream উদ্ধৃত করিবার তাৎপর্য এই যে, কপালকুণ্ডলার এ স্বপ্নও মাত্র স্বপ্ন নয়—ইহা তাহার জীবনের পরিণতির অভ্রান্ত ইঙ্গিত।

অদূর ভবিষ্যতে অর্থাৎ আগামী কয়েক দিনের মধ্যে কপালকুণ্ডলার জীবনের যে পরিণতি ঘটিবে তাহারই পূর্বাভাস এই স্বপ্নের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবি, জটাজূটধারী প্রকাণ্ডাকার পুরুষ কাপালিক, আর নৌকা নবকুমার।

তোমায় রাখি কি নিমগ্ন করি—ব্রাহ্মণবেশীর অর্থাৎ মতিবিবির কপালকুণ্ডলার প্রাণসংহারে ইচ্ছা নাই। নিমগ্ন কর—কপালকুণ্ডলা নিজে জীবনের প্রতি মমতাশূন্য। বাঁচিবার ইচ্ছা সে করে না। আমি আর এ ভার গ্রহণ করিতে পারি না—নবকুমারের নিকট এ অশান্তি ও অনিশ্চয়তা দুঃসহ।

নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল—কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার উভয়েরই নিমজ্জন আভাসিত হইতেছে।

কল্যরাত্রের ব্রাহ্মণ কুমারের সহিত—পূর্ব্বরাত্রে স্ত্রীলোক বলিয়া পরিচয় দিয়া পরে আবার 'ব্রাহ্মণ কুমার' লিখিবার মধ্যে মতিবিবির কোনও অভিসন্ধি ছিল না কি ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মণবেশী পুনরায় রাত্রিতে দেখা করিতে অনুরোধ করিয়াছে, দেখা করা উচিত কিনা কপালকুণ্ডলা চিন্তা করিয়াছে এবং অনেক চিন্তার পরও সাক্ষাৎ করিবার জন্যই

সে যাত্রা করিয়াছে। এই পরিচ্ছেদে নায়িকার আশঙ্কাসংশয় ও কৌতূহলে দোলায়মান চিত্তের চিত্র গ্রন্থকার আঁকিয়াছেন।

যাত্রার পূর্বে কপালকুণ্ডলার মনের বিতর্ক সংক্ষেপে এইরূপ: কুলবধূর পক্ষে নির্জনে অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ সঙ্গত কিনা? সাক্ষাতের উদ্দেশ্য যদি মন্দ না হয় তবে দোষ নাই, স্ত্রী-পুরুষেও সাক্ষাতের অধিকার থাকা প্রয়োজন।

এ সাক্ষাতে মঙ্গল হইবে না অমঙ্গল হইবে?

অমঙ্গলের সম্ভাবনাই অধিক। কাপালিকের দর্শন, স্বপ্ন এই সমস্ত মিলিয়া কপালকুণ্ডলার মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়াছে। ব্রাহ্মণবেশী হয়তো কাপালিকের সহচর, দুইজনে তাহারই সম্বন্ধে কুপরামর্শ করিতেছিল। হয়তো তাহারই মৃত্যু বা নির্বাসনের কল্পনা তাহারা করিতেছিল। এ অবস্থায় ব্রাহ্মণবেশীর নিকট যাওয়া উচিত নয়।

কিন্তু তবে স্বপ্নের তাৎপর্য কি? স্বপ্নে তো ব্রাহ্মণবেশী তাহাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল; এখনও তো ব্রাহ্মণবেশী সাহায্য করিবে বলিয়াই মনে হইতেছে। স্বয়ং দেবী স্বপ্নের মধ্য দিয়াই প্রত্যাদেশ পাঠাইয়াছেন, এই ব্রাহ্মণবেশী রক্ষাকর্তা, সুতরাং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাই উচিত।

কপালকুণ্ডলা সন্ধ্যার পর গৃহকর্ম শেষ করিয়াই বনের দিকে যাত্রা করিল। ব্রাহ্মণবেশীর সহিত ঠিক কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ করিতে হইবে? চিঠি পড়িলেই জানা যাইবে। ঘরে ফিরিয়া নানা স্থানে চিঠি খুঁজিয়া না পাইয়া কপালকুণ্ডলার মনে হইল কবরী বাঁধিবার সময় চিঠি চুলের মধ্যে রাখিয়াছিল। তখন বাঁধা চুল খুলিয়া চিঠিখানার অনুসন্ধান করা হইল কিন্তু সে চিঠি পাওয়া গেল না। চুল খুলিয়াই কপালকুণ্ডলা পুনরায় বনের দিকে চলিল।

বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন কিনা তাহাতে সন্দেহ—সাংসারিক বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা যাহাদের আছে তাহারা মাত্র একটি স্বপ্নের উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করিত না। স্বপ্ন সাধারণ লোকের নিকট অলীক, অর্থহীন।

কৌতূহলপরবশ রমণীর ন্যায়—নারীমাত্রেরই কৌতূহল অসীম। কোন্ অজানা রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে, কি উদ্দেশ্যে নির্জন ঘরে কাহারা তাহার সর্বনাশের কল্পনা করিতেছিল এইগুলি জানিবার জন্য কপালকুণ্ডলার কৌতূহলও হইয়াছিল।

ভীমকান্তরূপরাশিদর্শনলোলুপ যুবতীর ন্যায়—ব্রাহ্মণবেশীর অসামান্য রূপ অথচ তাহার মধ্যে একটা মহাভয় যেন স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। কপালকুণ্ডলার ভয়ঙ্করের ভয় নাই, পুনরায় তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা মনে জাগিল।

নৈশবন-ভ্রমণ-বিলাসিনী সন্ন্যাসি-পালিতার ন্যায়—আবাল্য সে বনে প্রতিপালিত হইয়াছে। রাত্রিতে বনপথে একাকিনী ভ্রমণের আনন্দ সে বহুবার পূর্বে উপভোগ করিয়াছে। সুতরাং পুনরায় যখন সুযোগ পাওয়া গিয়াছে তবে বনভ্রমণে আপত্তি কি?

ভবানীভক্তিভাব-বিমোহিতার ন্যায়—স্বপ্নে কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণবেশীকে দেখিয়াছিল। ব্রাহ্মণবেশী তাহাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। সেই ব্রাহ্মণবেশীই তাহাকে ডাকিতেছে। স্বয়ং ভবানী এই স্বপ্নের মধ্য দিয়া স্পষ্ট প্রত্যাদেশ পাঠাইয়াছেন, ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিলে আদেশ অমান্য করা হয়। ধর্মভাব কপালকুণ্ডলার প্রধান সংস্কার, আজীবনের সংস্কারকে তাহার পক্ষে ত্যাগ করা অসম্ভব।

জ্বলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায়—বিনাশের দিকে অনিবার্যবেগে মানুষ অগ্রসর হয়, নানা যুক্তি সে নিজের মনে গড়িয়া লয়, তাহার কার্যের সমর্থনের পিছনে যুক্তির অভাব হয় না। দৈবপ্রেরিত হইয়াই নিজের জীবনের অবসান ঘটাইবার জন্য কপালকুণ্ডলা যাত্রা করিল।

অমনি গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেল—আর এক দুর্লক্ষণ।

কবরী আলুলায়িত করিলেন—নিয়তির কি অদ্ভুত প্রতিকূলতা।

"চিঠি খুঁজিতে গিয়া কপালকুণ্ডলা কবরী খুলিয়া সমস্ত চুল আলুলায়িত করিলেন এবং বাহিরে যাইবার সময় অনূঢ়াকালের মত কেশমণ্ডলমধ্যবর্তিনী হইয়া চলিলেন। ইহার ফল হইল যে, যখন তিনি ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন তখন তাঁহার অবিন্যস্ত কেশের রাশি ব্রাহ্মণবেশীকে স্পর্শ করিয়াছে। দূর হইতে নবকুমার ইঁহাদের কথা শুনিতে পান নাই, কিন্তু একজনের চুল অপরের দেহে প্রসারিত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহমাত্র রহিল না যে, কপালকুণ্ডলা অসতী। এমন করিয়া একটি অতি তুচ্ছ ব্যাপার ইহাদের জীবনে চরম অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এইখানে সেক্সপীয়রের রীতির (বিশেষ করিয়া ডেস্‌ডিমোনার রুমাল হারানো ব্যাপারের) প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে এই ক্ষুদ্র ঘটনাকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং ইহার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছেন তাহার তুলনা সেক্সপীয়রের নাটকেও বিরল।" (সুবোধ-চন্দ্র সেনগুপ্ত)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কপালকুণ্ডলা সন্ধ্যার পূর্বে যখন গৃহকার্যে নিযুক্ত ছিল তখন চিঠিখানি তাহার কবরীবন্ধন হইতে মাটিতে পড়িল। কপালকুণ্ডলা কিছু জানিতে পারে নাই কিন্তু

নবকুমার পত্রখানি পড়িয়া বিস্মিত হইলেন। গত রাত্রির 'ব্যাপার তিনি কিছুই জানিতেন না, সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন ব্রাহ্মণবেশী মৃন্ময়ীর প্রণয়ী। ইহাতে সন্দেহের আর কোনও অবকাশ নাই, হাতে হাতে সব ধরা পড়িয়া গিয়াছে। নবকুমার নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি কপাল-কুণ্ডলাকে অনুসরণ করিবেন, তাহাকে কিছু বলিবেন না কিন্তু নিজের প্রাণ বিসর্জন করিবেন। সন্ধ্যার পর কপালকুণ্ডলাকে অনুসরণ করিবার জন্য নবকুমার বাহির হইতেছেন এমন সময় দেখিলেন কাপালিক দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি কাপালিককে দেখিয়া ভয় পাইলেন না কিন্তু তাহাকে দ্বার ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু কাপালিক অভয় দিল, কাপালিকের কথা নবকুমারকে শুনিতে হইবে। কপালকুণ্ডলা কোথায় গিয়াছে তাহা কাপালিক নবকুমারকে দেখাইবে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় নবকুমার কাপালিককে গৃহে লইয়া আসিলেন।

প্রথম বুঝিতে পারিলেন না, পরে সংশয়, পরে নিশ্চয়তা, শেষে জ্বালা—নবকুমার আগের ঘটনা কিছুই জানিতেন না, হঠাৎ কপালকুণ্ডলার করবীচ্যুত লিপি পাইয়া যখন তাহা পাঠ করিলেন তখন কপালকুণ্ডলা ভ্রষ্টচরিত্রা—এই সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য কোনও সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। এত বড় বেদনার আঘাত নবকুমারকে হঠাৎ এতটা অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, তিনি প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তারপর চিন্তা করিতে করিতে সন্দেহ জন্মিল, কিছুক্ষণ চিন্তার পর সংশয় বা অনিশ্চয়-তার ভাব কাটিয়া গেল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ যখন পাওয়া গেল, গত রাত্রে যাহার সহিত দেখা হইয়াছে তাহারই আহ্বানে আবার তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য কপাল-কুণ্ডলা যখন যাইবে তখন আর অনিশ্চয়তা কেন?

অন্য সন্দেহ নহে, প্রতীতি—কপালকুণ্ডলার অবাধ্যতায়, তাহার নিশীথ ভ্রমণে ও যথেচ্ছ আচরণে সন্দেহ হইত, কিন্তু এখন সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ নাই, স্বচক্ষে লিপি দেখিয়া স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

রোদন করিলেন—চরিত্রের দৃঢ়তা যতই থাকুক, এই অবস্থায় প্রেমপরায়ণ স্বামীর পক্ষে রোদনই স্বাভাবিক; ক্রোধপ্রকাশ চরিত্রের লঘুতাই প্রকাশ করিত।

এ জীবন বিসর্জন দিবেন—নবকুমার উদারহৃদয় ও প্রেমপরায়ণ। এ চরম দুর্ভাগ্যের জন্য কাহারও সহিত তিনি কলহ করিবেন না; কাহারও উপর প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবেন না, নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়া জীবনের দুর্বহ ভার হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

[এই সংকল্প গ্রহণ করিবার সময়ও নবকুমারের মনের কোণে একটু আশা ছিল হয়তো যাহা তিনি ভাবিতেছেন কপালকুণ্ডলা তাহা নাও হইতে পারে। সেইজন্য তিনি গোপনে কপালকুণ্ডলার অনুসরণ করিবেন স্থির করিলেন।]

কে সে ব্যক্তি, কেন দাঁড়াইল—নবকুমারের অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য নাই, মন ও চোখ উভয়ই কপালকুণ্ডলার দিকে। সহসা তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল—হয়তো কাপালিকের আহ্বানে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্যই কপালকুণ্ডলা যাইতেছে।

তাহা হইলে কপালকুণ্ডলা অসতী নয়, বিদ্যুৎ ঝলকের মত এই ধারণা নবকুমারের মনে আসা মাত্র তাঁহার চোখমুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কাপালিকের উত্তর শুনিয়াই সঙ্গে সঙ্গে নবকুমারের মুখ কালো হইয়া গেল।

কেন আমি দেবতুষ্টির জন্য শরীর না দিলাম—সেদিন যদি দেবীর নিকট তাঁহাকে বলি দেওয়া হইত, তবে আজ এ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না।

তুমি সেই পাপিষ্ঠার অনুসরণ করিবে—কাপালিক জানে না যে, ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবি। সুতরাং সে যতটুকু জানিয়াছে এবং নবকুমারের ভাব দেখিয়া যাহা বুঝিতেছে তাহাতে কপালকুণ্ডলাকে সরল বিশ্বাসেই সে পাপিষ্ঠা মনে করিতেছে। কাপালিকের চরিত্রে নিষ্ঠুরতা থাকিলেও ছলনা বা নীচতা নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাপালিক প্রথমে নবকুমারকে তাহার ভগ্ন বাহু দুইটি দেখাইয়া তাহার কথা আনুপূর্বিক বলিতে লাগিল। স্বয়ং ভবানী তাহাকে স্বপ্ন দেখাইয়াছেন। ভবানী আর তাহার নিকট পূজা গ্রহণ করিবেন না, কারণ কাপালিক ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হইয়া কুমারীর শোণিতে তাঁহার পূজা করে নাই। যদি কপালকুণ্ডলাকে বলি দেওয়া যায় তবে তিনি প্রীত হইবেন।

কপালকুণ্ডলা বিশ্বাসঘাতিনী। গত রাত্রিতে ব্রাহ্মণকুমারের সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল। আজও সে তাহার সহিত দেখা করিতে যাইতেছে। কপালকুণ্ডলার বধে সাহায্য করিয়া নবকুমার যেন পুণ্য সঞ্চয় করেন, এই উপদেশ দিয়া কাপালিক নবকুমারকে লইয়া যেখানে ব্রাহ্মণকুমার ও কপালকুণ্ডলা গিয়াছে সেইখানে চলিল।

তদ্‌গচ্ছ সিদ্ধৈ কুরু দেবকার্য্যম্—মহাদেবের ধ্যানভঙ্গে গমনরত মদনদেবের প্রতি এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলার বধ সম্পাদন করিয়া দেবতার তুষ্টি সাধনের জন্য নবকুমারকে কাপালিক উপদেশ দিতেছে।

বলিতে বলিতে কাপালিকের শরীর রোমাঞ্চিত হইল—কাপালিক সত্য সত্যই স্বপ্ন দেখিয়াছিল এবং স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াই কপালকুণ্ডলাকে বলি দিবার জন্য এতকাল তাহার অনুসন্ধান করিতেছিল।

স্বচক্ষে দেখিলাম কপালকুণ্ডলার সহিত এক ব্রাহ্মণকুমারের মিলন—অদৃষ্টের পরিহাসে কাপালিকেরও ধারণা কপালকুণ্ডলা ভ্রষ্টচরিত্রা। ভবানীর আদেশে কপালকুণ্ডলা কাপালিকের বধযোগ্যা, নবকুমারের নিকট অবিশ্বাসিনী হইয়া নবকুমারেরও বধযোগ্যা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কপালকুণ্ডলা গৃহ হইতে বাহির হইয়া বনমধ্যস্থ ভগ্নগৃহের নিকট যাইয়া দেখিল যে, ব্রাহ্মণবেশী তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। কপালকুণ্ডলাকে লইয়া সেখান হইতে অল্প দূরে চতুর্দিকে বৃক্ষরাজি-পরিবেষ্টিত একটি পরিচ্ছন্ন স্থানে উভয়ে উপবেশন করিল। ব্রাহ্মণবেশী পরিচয় দিয়া কহিল, যে যবনকন্যার সহিত কপালকুণ্ডলার পান্থশালায় দেখা হইয়াছিল, ব্রাহ্মণবেশী সেই যবনকন্যা। কপালকুণ্ডলা চিনিল—ইহারই নিকট হইতে সে অলঙ্কার পাইয়াছিল। কপালকুণ্ডলাকে অতিমাত্রায় বিস্ময়ান্বিত করিয়া যবনী বলিল যে, সে তাহার সপত্নী। তাহার নাম পদ্মাবতী। তখন ব্রাহ্মণবেশধারিণী একে একে সমস্ত কথা কপালকুণ্ডলাকে জানাইল। নবকুমারকে প্রেম নিবেদন করিয়াও সে যে কোন প্রতিদান পায় নাই তাহাও জানাইল। কপালকুণ্ডলা বিস্মিত হইয়া শুনিতে লাগিল যে, ব্রাহ্মণবেশীর আসল অভিপ্রায় কপালকুণ্ডলার সতীত্বের প্রতি নবকুমারের সংশয় সৃষ্টি করিয়া নবকুমারের সহিত তাহার চিরবিচ্ছেদ সাধন। কাপালিক যে কপালকুণ্ডলার অনিষ্ট সাধন করিতে চায় তাহা কাপালিকের হোম করিবার সময় ব্রাহ্মণবেশী বুঝিতে পারিয়াছিল। কাপালিকের অভিপ্রায় কপালকুণ্ডলার মৃত্যু কিন্তু ব্রাহ্মণবেশী একটি নিরপরাধ বালিকার মৃত্যুসাধন করাইয়া আর পাপ বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে না। কাপালিকের বাহু বলহীন, এইজন্য কপালকুণ্ডলার বধসাধনে কাপালিক ব্রাহ্মণবেশীর সাহায্য চাহিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণবেশী এই দুষ্কার্য কখনই করিবে না। তখন ব্রাহ্মণবেশ-ধারিণী লুৎফউন্নিসা কপালকুণ্ডলাকে দাসদাসী অট্টালিকা ধনসম্পত্তি দিতে চাহিল, সে রাণীর ন্যায় থাকিতে পারিবে, কেবল তাহাকে স্বামী ত্যাগ করিতে হইবে।

কপালকুণ্ডলা সমস্ত শুনিল। বাস্তবিকই তাহার কোন বন্ধন নাই। কাপালিকের স্বপ্নবৃত্তান্ত লুৎফউন্নিসার মুখে শুনিয়া তাহার সকল বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল।

সে দাসদাসী ধনসম্পত্তি চায় না। অন্যের সুখের বিঘ্ন হইয়া সে আর থাকিবে না। পূর্বে যেমন বনচর ছিল, আবার বনচর হইবে।

কাপালিক ও নবকুমার অলক্ষিতে থাকিয়া সমস্ত দেখিতেছিল। কথা কিছু শুনা যাইতেছিল না কিন্তু নবকুমার দেখিল ব্রাহ্মণবেশী ও কপালকুণ্ডলা পাশাপাশি বসিয়া আছে। কপালকুণ্ডলার খোলা চুল ব্রাহ্মণবেশীর পিঠ ছাইয়া ফেলিয়াছে। নবকুমার আর কি দেখিবেন? তাঁহার অসহ্য হইল। কাপালিক বিহ্বল উদ্‌ভ্রান্ত নবকুমারকে সুরা পান করাইলেন। এদিকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ লুৎফউন্নিসা একটি অঙ্গুরী কপালকুণ্ডলাকে দিল। নবকুমার ইহাও দেখিল। লুৎফউন্নিসার নিকট বিদায় লইয়া কপালকুণ্ডলা চলিতে লাগিল। কাপালিক ও নবকুমার অদৃশ্যভাবে তাহার পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল।

যদি দিনমান হইত তবে দেখিতে পাইতেন তাঁহার মুখকান্তি অত্যন্ত মলিন হইয়াছে—মতিবিবি যে একেবারে হৃদয়হীনা নয়, ইহাই তাহার প্রমাণ।

স্বপ্ন শুনিয়া কপালকুণ্ডলা চমকিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন—ধর্মসংস্কার কপালকুণ্ডলার এত প্রবল যে, কাপালিক তাহাকে বধ করিবার জন্য স্বপ্নে দেবীর প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার জীবন বিসর্জন কি তবে ভবানীরও অভিপ্রেত? জীবনে যাহার মায়া নাই, সংসারে যে এখনও মন বসাইতে পারে নাই, অলৌকিক ও অনৈসর্গিকের আহ্বান তাহার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে।

স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে?—কপালকুণ্ডলা ভালবাসিয়া নবকুমারের গৃহিণী হয় নাই, বিবাহ তাহার নিকট ধর্মের অঙ্গ, কর্তব্য। কপালকুণ্ডলা নীরবে অনেকক্ষণ চিন্তা করিল, কর্তব্যপরায়ণা গৃহিণীর গৃহত্যাগ করা উচিত কিনা এই সম্বন্ধে। স্বামীত্যাগ করিয়া যাইতে হৃদয়ে তেমন বেদনাবোধ হইতেছে না, কিন্তু স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নিরাশ্রয় হইয়া কোথায় যাইবে? যে কর্তব্যবুদ্ধিতে বিবাহিত জীবনে সে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই কর্তব্যবোধই তাহার চিত্তকে দ্বিধাগ্রস্ত করিতেছিল।

কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না—সংসারে মানুষ যাহাদের আপনার বলিয়া মনে করে তাহাদের মায়ায় সংসারে বাস করে। এত বড় পৃথিবীতে কপাল-কুণ্ডলার আপনার জন কেহ নাই।

কোথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না—স্বামীর ঘর ছাড়িয়া যাইবার পূর্বে শেষবারের মতন কপালকুণ্ডলা নিজের হৃদয়কে যাচাই করিয়া লইবে; এই বন্ধনহীনা কোনও সংসারবন্ধনেই বাঁধা পড়ে নাই, মনের গোপন কোণে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল,

নবকুমার সেখানে কোনও রেখাপাত করে নাই। কপালকুণ্ডলার কোন বন্ধন, কোন মায়া, কোন আকর্ষণ নাই; অন্যের সুখের পথে কাঁটা হইয়া তবে সংসারে বাস করা কেন?

আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব—তাহার জীবনে একমাত্র আকর্ষণ সমুদ্র ও অরণ্যের। সমাজ ও স্বামী তাহার জীবনে খানিকটা পরিবর্তন আনিয়াছিল, কিন্তু কাহাকেও সে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করে নাই। শেষ পর্য্যন্ত এইজন্যই সমাজ ও স্বামী তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। [কপালকুণ্ডলা এখন পর্য্যন্তও ভৈরবী-চরণে আত্মদানের সঙ্কল্প করে নাই।]

বর্দ্ধমানে কোন অতি-প্রধানা স্ত্রীলোক—মেহের-উন্নিসা।

ভূতলে বসিয়া পড়িলেন—গভীর দুঃখে ও নৈরাশ্যে সকল শক্তি লোপ পাইল।

পান করিয়া বল পাইবে—নবকুমারকে অভিভূত দেখিয়া কাপালিক উগ্র সুরা পান করাইয়া সবল করাইলেন। উত্তেজক সুরা নবকুমারের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, কপালকুণ্ডলার প্রতি স্নেহের অঙ্কুর পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেও আমরা দেখিয়াছি কপালকুণ্ডলা বলিতেছে—বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব। আত্মবিসর্জ্জনের জন্য সে এখনও মন স্থির করে নাই। এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার কপালকুণ্ডলা আত্মবিসর্জ্জনের প্রেরণা কি করিয়া পাইল তাহার সন্ধান দিয়াছেন।

কপালকুণ্ডলা গভীরভাবে চিন্তা করিতে করিতে গৃহের দিকে চলিতেছিল। লুৎফ-উন্নিসার কথা শুনিয়া তাহার মনোভাব একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে স্থির করিল আত্ম-বিসর্জ্জন করিবে। তান্ত্রিকের সাধনা কপালকুণ্ডলাকে শিখাইয়াছিল যে, জীবনের কোন মূল্য নাই, কালিকার অনুরাগিণী হইয়া দেবীর প্রসাদ লাভের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কাতরতা প্রকাশ করা সঙ্গত নয়। সমস্ত জীবকুলের সুখদুঃখ-বিধায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাহাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে আদেশ করিয়াছেন। তবে কপালকুণ্ডলা কেন সে আদেশ পালন করিবে না। সংসারে লোকে বাঁচিতে চায় সুখের প্রত্যাশায়। ভালবাসা মানুষকে বাঁধিয়া রাখে। প্রেমের বন্ধন যেখানে নাই, সেখানে বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষাও হয় না। পঞ্চভূতের এই শরীর রাখিয়া কি করিব? জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করার আর বাধা কি? মৃত্যুর কথা চিন্তা করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। হঠাৎ যেন

তাহার কানে আসিল "আমি পথ দেখাইতেছি"। কপালকুণ্ডলা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, নরকপালমালিনী ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া যেন কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন। কপালকুণ্ডলা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া চলিতে লাগিল, তাহার বাহ্যচেতনা প্রায় লোপ পাইয়াছে।

নবকুমার কাপালিকের নিকট হইতে সুরা চাহিয়া পান করিলেন। যে কার্য্য সাধনের জন্য কাপালিকের সঙ্গে তিনি আসিয়াছেন সেই কার্য্যসাধনে আর কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি? নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে ডাকিলেন, কপালকুণ্ডলা তীব্রকণ্ঠ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। প্রথমে কাহাকেও চিনিতে না পারিয়া কপালকুণ্ডলা ভাবিল ইহারা বুঝি যমদূত। পরক্ষণেই চিনিতে পারিয়া কাপালিককে সে বলিল, পিতা তুমি কি আমাকে বলি দিতে আসিয়াছ? নবকুমার কপালকুণ্ডলার হাত ধরিলেন। কাপালিক উভয়কেই শ্মশানের দিকে লইয়া চলিল। কপালকুণ্ডলা ঊর্দ্ধ আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী রণরঙ্গিনী খল খল হাসিতেছে আর এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে লইয়া শ্মশানের পথে যাইবার জন্য সঙ্কেত করিতেছে।

এই অলৌকিক দর্শন যে কেবল মিথ্যা মায়া নয় তাহা Wordsworthএর ছত্রটি উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণসম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান—কাপালিকের নিকট কপাল-কুণ্ডলা প্রতিপালিত হইয়াছে। তান্ত্রিকের পূজায় নরশোণিত, নরমাংস প্রয়োজন হয়, ইহা সে জানে। মানুষের জীবনের যে খুব বেশী মূল্য নাই তাহা তান্ত্রিকের সাধনা দেখিয়াই সে উপলব্ধি করিয়াছে। দেবীর প্রীতির জন্য নিজের জীবনবিসর্জ্জন সে অনায়াসেই দিতে পারে। কাপালিকের নিষ্ঠুরতা তাহার মনঃপূত ছিল না সত্য, কিন্তু কাপালিক যে-কালিকার সন্তুষ্টির জন্য পূজা করিত সেই দেবীর প্রতি প্রবল অনুরাগ ও ভক্তি তাহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল।

তবে কপালকুণ্ডলাকে কে রাখে?—সংসারের শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে চায় কেন? সুখের আশায়। সংসারে আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখে প্রণয়। যে কাহাকেও ভালবাসে না, নিজ হৃদয় দিয়া অন্য হৃদয়কে কামনা করে না, অন্যের সুখদুঃখে যে নিজের সুখদুঃখ বোধ করে না, সে বাঁচিবে কোন্ আশায়, কিসের আকর্ষণে? কপালকুণ্ডলার কোনও আশা নাই, কোনও আকর্ষণ নাই, কোনও বন্ধন নাই। তাই এত সহজে সে প্রাণবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইতে পারিয়াছিল।

পঞ্চভূতের এক বন্ধন আছে—কোনখানে কোনও আকর্ষণ না থাকিলেও

দেহের একটা মায়া আছে। দেহের উপর একটা স্বাভাবিক মমতা আছে বলিয়াই কেবল বাঁচিয়া থাকাটাই সুখের বলিয়া মনে হয়, ইচ্ছা করিয়া সহজে নিজদেহকে বিনষ্ট করা যায় না।

অনৈসর্গিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়—জীবনবিসর্জ্জনের সঙ্কল্প লইয়া কপালকুণ্ডলা চলিতেছে, সমস্ত মন জুড়িয়া একই ভাব, একই চিন্তা। কপালকুণ্ডলা ভৈরবীর আহ্বান শুনিল, ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া ভৈরবীমূর্ত্তি দেখিল। কাপালিক ও নবকুমার এসব কিছুই দেখিতে পান নাই। কপালকুণ্ডলার নিকটই নিয়তি ভৈরবীমূর্ত্তিতে দেখা দিয়া তাহাকে শেষবারের মত মৃত্যুর দিকে আহ্বান জানাইল, আত্মবিসর্জ্জনের প্রেরণা দিয়া গেল। ইহা স্বপ্ন নয়, ইহা অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

পানীয়ং দেহি মে—নবকুমারের মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে উগ্র সুরার প্রভাব।

তোমরা কে? যমদূত?—কপালকুণ্ডলা মৃত্যুর কথাই চিন্তা করিতেছিল, ইহলোকের চিন্তা ও চেতনা লোপ পাইতেছিল, আহ্বান শুনিয়া ও সম্মুখে লোক দেখিয়া তাহার যমদূতের কথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

তুমি কি আমায় বলি দিতে আসিয়াছ?—এই স্বরে কাতরতা নাই, ভৈরবীর প্রীতির জন্য আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা, দেবীর চরণে আত্মনিবেদনের সঙ্কল্প কপালকুণ্ডলার চরিত্র মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে।

কাপালিক করুণার্দ্র মধুময় স্বরে—কাপালিকের চরিত্রে নিষ্ঠুরতা নির্ম্মমতা আছে, কিন্তু উহা তাহার ধর্ম্মসাধনারই অঙ্গ। এইজন্যই কাপালিকের উপর পাঠকের অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা হয় না।

অদৃষ্টবিমূঢ়ার ন্যায়—নিয়তি বা অদৃষ্ট কপালকুণ্ডলার সমস্ত বুদ্ধি ও চেতনাকে একেবারে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

চাঁদ ডুবিয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। গঙ্গাতীরে শ্মশানভূমি। গঙ্গার তীর সেখানে উঁচু। বায়ুতাড়িত তরঙ্গ তীরমূলে আঘাত করে, মাঝে মাঝে বড় চাপ ভাঙ্গিয়া পড়ে। চারিদিক অন্ধকার, কেবল গঙ্গার তরঙ্গের গর্জ্জন ও শবহারী শৃগাল-কুক্কুরের চীৎকার শুনা যাইতেছিল। কাপালিক নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে আসনে বসাইয়া পূজা আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে নবকুমারকে আদেশ দিলেন, কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আন। নবকুমার

কপালকুণ্ডলার হাত ধরিয়া গঙ্গার দিকে চলিলেন। পায়ে শ্মশানের অস্থি ফুটিতেছিল, নবকুমারের হাত কাঁপিতেছে দেখিয়া কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন—ভয় পাইতেছ ? উত্তেজক সুরার প্রভাব নবকুমারের মস্তিষ্কে যে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল তাহা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে। নবকুমার উত্তর করিলেন—না ভয়ে নয়। কপালকুণ্ডলা আবার প্রশ্ন করিলেন—তবে কাঁপিতেছ কেন ? নবকুমার বিস্মিত হইলেন, এত সেই পরিচিত মমতা-মাখান কণ্ঠ। জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া কপালকুণ্ডলার কণ্ঠ হইতে এই স্বর নির্গত হইবে নবকুমার চিন্তা করেন নাই। তিনি কহিলেন—কাঁদিতে পারিতেছিনা এই ক্রোধে কাঁপিতেছি। কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন—কাঁদিবে কেন ? এইবার নবকুমার একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। অব্যক্ত যন্ত্রণায় কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল--আপনার হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া যে শ্মশানে ফেলিতে আসিয়াছে, তাহার এই অপরিসীম যন্ত্রণা হইবে না ত কাহার হইবে ? নবকুমার কপালকুণ্ডলার পায়ে পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, একবার বল—তুমি অবিশ্বাসিনী নও, আমি তোমায় ঘরে লইয়া যাই। কপালকুণ্ডলা হাত ধরিয়া নবকুমারকে তুলিয়া বলিলেন—তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই। এই সময় উভয়ে একেবারে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। নবকুমার পাগলের মত কহিলেন—জ্ঞান হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব! কপালকুণ্ডলা বলিল—আজ যাহাকে দেখিয়াছ সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নই। কিন্তু আমি আর গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি। তুমি ঘরে যাও আমার জন্য কাঁদিও না। "না, না" বলিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে ধরিতে গেলেন, সেই সময় এক প্রকাণ্ড তরঙ্গের আঘাতে কপালকুণ্ডলার সহিত পাড় ভাঙ্গিয়া ভীষণ শব্দ করিয়া নদীর মধ্যে পড়িয়া গেল। নবকুমার লাফাইয়া জলে পড়িলেন। কপালকুণ্ডলাকে পাইলেন না। তিনিও আর উঠিলেন না।

কপালকুণ্ডলা তাহাকে বেড়িয়া গেলেন—আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়াও কপালকুণ্ডলার চিত্ত ধীর, অচঞ্চল। নবকুমার তাহাকে চরণে দলিত করিয়া গেলেন—উগ্র সুরা নবকুমারের হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিকল করিয়া দিয়াছে। মনে তাঁহার প্রবল ঝড় বহিতেছে, আত্মবিসর্জ্জন-পরায়ণার অচঞ্চল বৈরাগ্য তাঁহার হইবে কি করিয়া ? একটি মাত্র বর্ণনায় উভয়ের মানসিক অবস্থার সুন্দর চিত্র গ্রন্থকার আঁকিয়াছেন।

নবকুমারের হস্ত কাঁপিতেছে—আশঙ্কায় উত্তেজনায় নবকুমার অস্থির।

ভয় পাইতেছ ?—নবকুমারের এই উত্তেজনাপ্রসূত চাঞ্চল্য কপালকুণ্ডলা লক্ষ্য করিয়াছে।

মদিরার মোহ ক্রমে শক্তিহীন হইয়া আসিতেছে—উগ্র সুরা নবকুমারের দেহে ও মনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে।

এই প্রশ্ন কপালকুণ্ডলা যে স্বরে করিলেন তাহা কেবল রমণীকণ্ঠেই সম্ভবে—প্রেতভূমিতে দাঁড়াইয়া নবকুমারকে সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে কপালকুণ্ডলা যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, তখন নবকুমারের মনে পড়িল সেই প্রথম দিনের কথা—পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ! প্রথম দিনের মধুর কণ্ঠস্বর আজও যেন অনুরণিত হইতেছে। সেই করুণা, সেই সহানুভূতি, সেই পরদুঃখকাতরতা!

আবার সেই কণ্ঠ—এই রহস্যময়ীর কণ্ঠস্বরের মোহ নবকুমারের অজানা নয়। সেই পরিচিত মধুর করুণাপূর্ণ কণ্ঠস্বর। নবকুমারের মদিরার মোহ কাটিয়া যাইতেছে। অবিশ্বাসিনী ভ্রষ্টচরিত্রার কণ্ঠ এত স্নেহে, করুণায় আর্দ্র হইতে পারে না।

তুমি ত কখনও রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই—আকর্ষণ যত অধিক, বিচ্ছেদ তত বেদনাদায়ক। নবকুমারের এই আকর্ষণ রূপের। কপালকুণ্ডলাকে গৃহে রাখিয়াও নবকুমার তাহাকে সম্পূর্ণভাবে পান নাই, তাহার মনের সন্ধান লাভ করিতে পারেন নাই। একটা মানসিক অপরিতৃপ্তি কপালকুণ্ডলার দৈহিক রূপের প্রতি নবকুমারকে আরও বেশী আকৃষ্ট করিতেছিল, ভালবাসা একটা প্রবল রূপজ মোহে পরিণত হইতেছিল। নবকুমারের এই অপরিতৃপ্ত মোহগ্রস্ত মন ছিল বলিয়াই কপালকুণ্ডলার চরিত্রের প্রতি এত সহজে সন্দেহ জন্মিতে পারিয়াছিল। কেবল সুরার উত্তেজক প্রভাব নয়, এই রূপমোহ নবকুমারের মনে জ্বালার সৃষ্টি করিয়াছিল।

তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই—যে সন্দেহ নবকুমারের মনকে বেদনায় পীড়িত করিতেছিল তার কথা কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিলেই তো মিটিয়া যাইত। পাঠকেরও একই প্রশ্ন—কপালকুণ্ডলাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিলেই সন্দেহ দূর হইত। কপালকুণ্ডলা যদিও সংসারসম্বন্ধে অনভিজ্ঞা, নবকুমারের তো বুদ্ধি ছিল, দায়িত্ব ছিল, স্বামীর কর্ত্তব্য ছিল কপালকুণ্ডলাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলা। বঙ্কিমচন্দ্র কৌশলে যেভাবে ঘটনাসংস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে ব্রাহ্মণবেশীর লিপিপ্রাপ্তির কাল হইতে এ পর্য্যন্ত ঘটনার গতি এত দ্রুত করিয়াছেন যে, নবকুমার কোন সময় ও সুযোগ পান নাই।

চৈতন্য হারাইয়াছি—বিচারবুদ্ধি যে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, নিজের ভুলে যে এতবড় সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়া নবকুমার ('ক্ষিপ্তের ন্যায়') পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছেন।

ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—ভৈরবীর প্রীতির জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প কপালকুণ্ডলার অটুট। কাপালিকের স্বপ্ন, শ্মশানভূমিতে তাহার অলৌকিক প্রত্যক্ষদর্শন এবং সংসারে গভীর অনাসক্তি তাহাকে আত্মবিসর্জ্জনের প্রেরণা দিয়াছে।

সমাপ্ত